নজরুল-রচনাবলী

নজরুল-রচনাবলী

জন্মশতবর্ষ সংস্করণ

দশম খণ্ড

বাংলা একাডেমী ঢাকা

বাএ ৪৭৩৯

প্রথম প্রকাশ : কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড (আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় তিন খণ্ডে যথাক্রমে ১৯৬৬, ১৯৬৭, ১৯৭০ সালে) বাংলা একাডেমী সংস্করণ (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড যথাক্রমে ১৯৭৭ এবং প্রথমার্ধ ও দ্বিতীয়ার্ধ ১৯৮৪)। পুনর্মুদ্রণ : ১৯৭৫, ১৯৭৬ ও ১৯৮৪ সালে। নতুন সম্পাদকমণ্ডলীর সম্পাদনায় সংশোধিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ (চার খণ্ডে) ১৯৯৩ সালে। নতুন সম্পাদনা পরিষদ–সম্পাদিত নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ দশম খণ্ড, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬, মে ২০০৯। পাণ্ডুলিপি : সংকলন উপবিভাগ। প্রকাশক : জাহিদুর রহমান, পরিচালক, গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমী, ৩ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা ১০০০। মুদ্রক : মোবারক হোসেন, ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমী প্রেস, বাংলা একাডেমী। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। মুদ্রণসংখ্যা : ২২৫০। মূল্য : ২০০.০০ টাকা।

Abdul Quadir (ed.), Nazrul-Rachanabali, Central Board for the Development of Bengali edition (Three Volumes in 1966, 1967 & 1970 respectively), Bangla Academy edition (Fourth & Fifth Volumes) in 1977 & 1984. New edition (Four Volumes in 1993). Nazrul Birth Centenary edition : Vol. X, May, 2009. Manuscript : Compilation Department. Published by : Zahidur Rahman, Director, Research, Compilation & Folklore Division, Bangla Academy, 3 Kazi Nazrul Islam Avenue, Dhaka 1000, Bangladesh. Printed by : Mobarak Hossain, Manager, Bangla Academy Press, Dhaka 1000. Cover design : Dhruba Esh. Print-run : 2250. Price : Taka 200.00 only.

ISBN 984-07-4748-7

নজরুল-রচনাবলী

জন্মশতবর্ষ সংস্করণ

দশম খণ্ড

সম্পাদনা-পরিষদ

রফিকুল ইসলাম
সভাপতি

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌
সদস্য

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ
সদস্য

আবদুল মান্নান সৈয়দ
সদস্য

আবুল কাসেম ফজলুল হক
সদস্য

নজরুল-রচনাবলী

প্রথম সংস্করণের সম্পাদক

আবদুল কাদির

নতুন সংস্করণের (১৯৯৩) সম্পাদনা-পরিষদ

আনিসুজ্জামান
সভাপতি

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম
সদস্য

রফিকুল ইসলাম
সদস্য

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্
সদস্য

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
সদস্য

মনিরুজ্জামান
সদস্য

আবদুল মান্নান সৈয়দ
সদস্য

করুণাময় গোস্বামী
সদস্য

সেলিনা হোসেন
সদস্য-সচিব

নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণের প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমী নজরুল জন্মশতবার্ষিক উৎসবের পরপরই কবির ইতোপূর্বে বাংলা উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলা একাডেমী-প্রকাশিত রচনাবলীর একটি কালক্রমিক, পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত ও অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ বিন্যাস ও নবসংযোজনযুক্ত নতুন সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। কারণ, নজরুল এমন এক বিস্ময়কর প্রতিভা ও বিপুলপ্রজ কবি যে, স্বল্পসময়ের সাহিত্য জীবনেও তাঁর রচনাসংখ্যা বেশুমার ; এবং সেই অবিরল ধারায় সৃষ্ট রচনা কবি কখন, কোথায়, কীভাবে লিখেছেন তার হদিস্ পাওয়া যেমন সহজ নয়, তেমনি তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেছেন কি-না সে সম্পর্কেও নিশ্চিত সংশয় আছে। ধারণা করা হয়, তাঁর সে-সব বিপুল রচনার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বিভিন্ন জনের সংগ্রহে অগ্রন্থিত অবস্থায় থেকে গিয়েছিল ; এবং কিছু রচনা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও তা সংগৃহীত না হওয়ায় কোনো গ্রন্থভুক্ত হয়নি। জন্মশতবার্ষিক অনুষ্ঠানের পর এদিকে লক্ষ্য রেখে কবির রচনাবলীর একটি পরিপূর্ণ ও বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশের জন্যে বাংলা একাডেমী ২০০৫ সালে 'নজরুল রচনাবলী জন্মশতবর্ষ সংস্করণ' প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ-কাজে কবি আবদুল কাদিরের সুদক্ষ সম্পাদনায় প্রকাশিত আদি নজরুল রচনাবলীর ভিত্তিমূলক সংস্করণ, অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে গঠিত সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে চারখণ্ডে বাংলা একাডেমী-প্রকাশিত নজরুল রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির 'নজরুল ইসলামের রচনাসমগ্র' এবং নজরুলের বিভিন্ন গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ও তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের বিভিন্ন সংস্করণের পাঠপর্যালোচনার পর সম্পাদকমণ্ডলী বর্তমান সংস্করণের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। এ সংস্করণের সম্পাদকমণ্ডলী নজরুলের কোনো কোনো গানের বাণীর ভিন্ন ভিন্ন পাঠ এতে প্রথমবারের মতো অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। বিশেষ করে নজরুলের গানের রেকর্ডে তাঁর গানের বাণীর যে-পাঠ পাওয়া যায় কবিকর্তৃক পরে তার সংশোধনকৃত পাঠও বর্তমান সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করায় বর্তমান সংস্করণটি এক ভিন্নমাত্রিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য লাভ করেছে। এই জটিল ও পরিশ্রমসাধ্য কাজটি অসীম ধৈর্য ও যত্নের সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন বিশিষ্ট নজরুল অনুরাগী গবেষক মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ।

'সুর ও শ্রুতি' এবং 'অগ্রন্থিত গান' এ সংস্করণে সংকলিত হলো। 'সুর ও শ্রুতি'র বিষয়বস্তুতে সংগীতের স্বরলিপি ও ব্যাকরণ এবং রাগ, তাল ও সুরের যে পারিভাষিক বিবরণ নজরুল প্রস্তুত করেছেন তাতে সঙ্গীতশাস্ত্রে তাঁর গভীর অনুসন্ধিৎসা ও বুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। নজরুল রচনাবলীর বর্তমান সংস্করণ প্রস্তুত করার ব্যাপারে নজরুল-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম যে-নিষ্ঠায় সামগ্রিক কাজের তত্ত্বাবধান করেছেন এবং দিকনির্দেশনা দিয়েছেন তা অতীব প্রশংসনীয়। কবি-সমালোচক-প্রবন্ধকার আবদুল মান্নান সৈয়দ, অধ্যাপক আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ও অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক তাঁদের স্ব স্ব কাজে যে আন্তরিক নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন সেজন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ও প্রকাশনার কাজে সম্পাদকমণ্ডলীকে সার্বক্ষণিকভাবে সহযোগিতা করেছেন সংকলন উপবিভাগের উপপরিচালক মাহবুব-উল-আজাদ চৌধুরী, কর্মকর্তা ফারহানা খানম ও আসাদ আহমেদ। বাংলা একাডেমী প্রেসের ব্যবস্থাপক মোবারক হোসেন, সহপরিচালক শেখ সারোয়ার হোসেন ও শুভ্রা বড়ুয়াকে তাঁদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।

বাংলা একাডেমী, ঢাকা
জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬।। মে ২০০৯

শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক

নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রসঙ্গে

'নজরুল-রচনাবলী'র তিনটি খণ্ড প্রখ্যাত কবি, সমালোচক ও নজরুল-বিশেষজ্ঞ আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় 'কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড' থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৬৬, ১৯৬৭ এবং ১৯৭০ সালে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭২ সালে 'কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড' একীভূত হয় 'বাংলা একাডেমী'র সঙ্গে। সরকার কর্তৃক এই পরিবর্তন ও ব্যবস্থা গ্রহণের পর বাংলা একাডেমী থেকে 'নজরুল-রচনাবলী'র চতুর্থ খণ্ড ১৯৭৭ সালে এবং পঞ্চম খণ্ড দুই ভাগে ১৯৮৪ সালে (প্রথমার্ধ জুনে ও দ্বিতীয়ার্ধ ডিসেম্বরে) কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায়ই প্রকাশিত হয়। 'নজরুল-রচনাবলী'র প্রথম খণ্ডের পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে এবং তা পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৮৩ সালে। দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৭৬ এবং ১৯৮৪ সালে। ১৯৮৪ সালেই প্রকাশিত হয় তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ। আগেই বলেছি, চতুর্থ খণ্ড প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে এবং পঞ্চম খণ্ড ১৯৮৪ সালে দুই ভাগে। চতুর্থ খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৮৪ সালে। কবি আবদুল কাদিরের জীবদ্দশায়, তাঁর সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র সব খণ্ডেরই নতুন সংস্করণ এবং পুনর্মুদ্রণ হয়েছে সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে ও তাঁর লেখা 'সম্পাদকের নিবেদন'সহ।

'নজরুল-রচনাবলী'র ব্যাপক চাহিদা থাকায় অল্পকালের মধ্যেই রচনাবলী-র সব খণ্ড বিক্রি ও নিঃশেষ হয়ে যায়। এই পটভূমিতেই 'নজরুল-রচনাবলী' পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।'এ উদ্দেশ্যে এবং মরহুম কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র সুলভ ও পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশের জন্য ১৯৯২ সালে 'বাংলা একাডেমী' নয় সদস্য বিশিষ্ট সম্পাদনা-পরিষদ গঠন করে। এই পরিষদের সম্পাদনায় ১৯৯৩ সালে চার খণ্ডে 'নজরুল-রচনাবলী'র পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ব্যাপক চাহিদার ফলে 'নজরুল-রচনাবলী'র এই নতুন সংস্করণও যথারীতি নিঃশেষ হয়ে যায়। এই নতুন সংস্করণের প্রতিটি খণ্ড একাধিকবার পুনর্মুদ্রণের পরও 'নজরুল-রচনাবলী'র চাহিদা শেষ হয়নি। ২০০১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'-র নতুন সংস্করণ (১৯৯৩) একাধিকবার পুনর্মুদ্রিত হওয়া সত্ত্বেও, নজরুল-জন্মশতবার্ষিকীর সময় থেকে 'নজরুল-রচনাবলী'র অধিকতর সংশোধিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। বাংলা একাডেমী 'নজরুল-রচনাবলী'র জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং একটি নতুন সম্পাদনা পরিষদের ওপর এই

কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে। এই নতুন সম্পাদনা পরিষদ অদ্যাবধি ঢাকা ও কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'নজরুল–রচনাবলী'–র বিভিন্ন সংস্করণ এবং নজরুলের বিভিন্ন গ্রন্থের আদি বা পরবর্তী সংস্করণসমূহে সন্নিবেশিত প্রতিটি রচনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মিলিয়ে বর্তমান সংস্করণের পাণ্ডুলিপি চূড়ান্ত করেন।

'নজরুল–রচনাবলী' : নজরুল–জন্মশতবর্ষ সংস্করণ দশম খণ্ডে 'সুর ও শ্রুতি' এবং 'অগ্রন্থিত গান' সংকলিত হলো। 'নজরুল–রচনাবলী'র নজরুল–জন্মশতবর্ষ সংস্করণের প্রতিটি খণ্ডের শেষে নজরুলের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি এবং তাঁর গ্রন্থাবলীর কালানুক্রমিক সূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দশম খণ্ডের পরিশিষ্টে নজরুলের অগ্রন্থিত গানের বাণীর পাঠান্তর যথাসম্ভব নির্দেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। 'নজরুল–রচনাবলী'র বিভিন্ন সংস্করণে মুদ্রণজনিত ত্রুটির দরুন এবং অন্যান্য কারণে যেসব বিচ্যুতি ঘটেছে, বর্তমান সংস্করণে সেগুলো সংশোধনের যথাসাধ্য চেষ্টা সম্পাদনা পরিষদ করেছেন।

'নজরুল–রচনাবলী'র এই সংস্করণে নজরুলের সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের কালানুক্রম বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে, তবে কবির অসুস্থতার পর সংকলিত এবং প্রকাশিত রচনাবলী তথ্যসূত্রের অভাবে কালানুক্রমিকভাবে প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব। এই বাস্তবতায় 'নজরুল–রচনাবলী' : নজরুল–জন্মশতবর্ষ সংস্করণকে যথাসম্ভব প্রামাণিক করার চেষ্টা ও শ্রম সম্পাদনা–পরিষদ আন্তরিকভাবেই করেছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও নজরুলের সমস্ত রচনা এ সংস্করণে সংকলিত—এমন দাবি করা যাবে না। কারণ, আমাদের বিশ্বাস, এই রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ডের অন্তর্গত রচনাসমূহের বাইরেও নজরুলের কিছু রচনা থাকা সম্ভব—যা এখনও জানা বা সংগ্রহ করা যায়নি। বস্তুত, 'নজরুল–রচনাবলী' সম্পাদনা ও প্রকাশনা একটি চলমান প্রক্রিয়া ; ভবিষ্যতে নজরুলের দুষ্প্রাপ্য কোনো রচনা সংগৃহীত হলে সেগুলোকে 'নজরুল–রচনাবলী'র পরবর্তী সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। আমরা এ–পর্যন্ত সংগৃহীত নজরুলের রচনাসমূহ সংকলন করার যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি। তবু হয়তো কিছু রচনা বাদ পড়ে যেতে পারে। শত সতর্কতা সত্ত্বেও কিছু মুদ্রণপ্রমাদ এবং ত্রুটি–বিচ্যুতিও ঘটে থাকতে পারে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

উল্লেখযোগ্য যে, 'নজরুল–রচনাবলী' সম্পাদনার পথিকৃৎ কবি আবদুল কাদির। 'নজরুল–রচনাবলী'র শুধু প্রথম সংস্করণই নয়, পরে প্রকাশিত সব সংস্করণ আবদুল কাদির–সম্পাদিত 'নজরুল–রচনাবলী'র ভিত্তিতেই করা হয়েছে। সব সংস্করণেই সম্পাদক হিসাবে মুদ্রিত রয়েছে তাঁর নাম, অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাঁর লেখা প্রতিটি সংস্করণের 'সম্পাদকের নিবেদন' এবং গ্রন্থপরিচয়। সুতরাং কবি আবদুল কাদিরের প্রয়াণের পর প্রকাশিত বিভিন্ন সংস্করণ নতুন সম্পাদনা–পরিষদ কর্তৃক পরিমার্জন এবং কিছু রচনা সংযোজন করা হলেও 'নজরুল–রচনাবলী'র আদি ও মূল সম্পাদক আবদুল

কাদির। বাংলা একাডেমী 'নজরুল-রচনাবলী' : নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে একটি জাতীয় কর্তব্য সম্পাদন করলেন। এই সংস্করণের 'সম্পাদনা পরিষদ'-এর পক্ষ থেকে আমরা বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ঢাকা
জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬॥ মে ২০০৯

রফিকুল ইসলাম
সম্পাদনা-পরিষদের সভাপতি

প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের সম্পাদকের নিবেদন

১৯৬৪ সালের শেষের দিকে কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড বিদ্রোহী-কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমগ্র রচনাবলী কয়েক খণ্ডে প্রকাশের এক সময়োচিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তদনুসারে রচনাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলো। এই খণ্ডে নজরুল ইসলামের সাহিত্য-জীবনের প্রথম যুগের—যেই যুগে তাঁর অন্তরে দেশাত্মবোধ ছিল প্রধানতম প্রেরণা—সকল রচনা সংগ্রথিত হয়েছে। অবশ্য 'সংযোজন'-বিভাগে কবির কিশোর বয়সের রচনার নিদর্শনস্বরূপ তাঁর কয়েকটি কবিতা ও গান সন্নিবেশিত হয়েছে। এই যুগে তিনি যে-সকল শিশুপাঠ্য কবিতা লিখেছিলেন সেগুলি রচনাবলী-র তৃতীয় খণ্ডে স্থান পাবে।

নজরুলের দেশাত্মবোধের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা নানাজনে নানাভাবে করেছেন। রাজনীতিক পরাধীনতা ও আর্থনীতিক পরবশতা থেকে তিনি দেশ ও জাতির সর্বাঙ্গীণ মুক্তি চেয়েছিলেন। তার পথও তিনি নির্দেশ করেছিলেন। সেদিনের তাঁর সেই পথকে কেউ ভেবেছেন সন্ত্রাসবাদ—কারণ তিনি ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগের উদাহরণ দিয়ে তরুণদের অগ্নিমন্ত্রে আহ্বান করেছিলেন ; কেউ ভেবেছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নিয়মতান্ত্রিকতা—কারণ তিনি 'চিত্তনামা' লিখেছিলেন ; কেউ ভেবেছেন প্যান-ইসলামিজম—কারণ তিনি আনোয়ার পাশার প্রশস্তি গেয়েছিলেন ; আবার কেউ ভেবেছেন মহাত্মা গান্ধীর চরকা-তত্ত্ব—কারণ তিনি গান্ধীজীকে তাঁর রচিত 'চরকার গান' শুনিয়ে আনন্দ দিয়েছিলেন। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, এসব ভাবনার কোনোটাই সত্যের সম্পূর্ণ স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের সহায় নয়। প্রকৃতপক্ষে নজরুল তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রথম যুগে ছিলেন কামাল-পন্থী,—কামাল আতাতুর্কের সুশৃঙ্খল সংগ্রামের পথই তিনি ভেবেছিলেন স্বদেশের স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য সর্বাপেক্ষা সমীচীন পথ। ১৩২৯ সালের ৩০শে আশ্বিন তারিখের ১ম বর্ষের ১৪শ সংখ্যক 'ধূমকেতু'তে তিনি 'কামাল' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন : 'সত্য মুসলমান কামাল বুঝেছিল' যে, 'খিলাফত উদ্ধার' ও 'দেশ উদ্ধার' করতে হলে 'হায়দারী হাঁক হাঁকা চাই ; .... ও-সব ভণ্ডামি দিয়ে ইসলাম উদ্ধার হবে না। ... ইসলামের বিশেষত্ব তলোয়ার।' কামাল আতাতুর্কের প্রবল দেশপ্রেম, মুক্ত বিচারবুদ্ধি ও উদার মানবিকতা নজরুলের এই যুগের রচনায় যে প্রভূত প্রেরণা যুগিয়েছিল তা বর্তমান খণ্ডের লেখাগুলো একত্রে পড়ে সম্যক উপলব্ধ হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

'নজরুল-রচনাবলী' প্রকাশের কাজে হাত দিয়ে আমরা দেখেছি যে, কবির অনেক কাব্যগ্রন্থেরই প্রথম সংস্করণ সংগ্রহ করা ইতোমধ্যেই দুষ্কর হয়ে উঠেছে। তাঁর কোনো

কোনো কাব্যগ্রন্থ পরের সংস্করণে অনেকখানি পরিবর্তিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'দোলন-চাঁপা'র উল্লেখ করা যেতে পারে। তার তৃতীয় সংস্করণে প্রথম সংস্করণের বহু বিখ্যাত কবিতা বাদ পড়েছে ; সে-স্থলে 'ছায়ানট' ও 'পূবের হাওয়া'র কিছু কবিতা সংযুক্ত হয়েছে। 'দোলন-চাঁপা'র গোড়ার দিকে 'সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে' স্থান পেয়েছিল ; তৃতীয় সংস্করণে সেটি বর্জিত হয়েছে। এই খণ্ডের গ্রন্থ-পরিচয়ে তা সঙ্কলিত হলো। বলা বাহুল্য যে, আমরা রচনাবলীতে কবির কবিতাগ্রন্থগুলির প্রথম সংস্করণই অনুসরণ করেছি।

আমাদের ধারণা যে, 'সংযোজন'-বিভাগে আমরা যেসব লেখা দিয়েছি, তাছাড়াও সে-সময়কার পত্র-পত্রিকাগুলি খুঁজলে কবির আরো কিছু লেখা পাওয়া যাবে—যা অদ্যাবধি গ্রন্থবদ্ধ হয়নি। কেউ যদি তেমন কোনো লেখার সন্ধান দিতে পারেন, তবে তা আমরা আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করবো এবং পরবর্তী সংস্করণে বা খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করবো।

কবির কোনো কোনো কবিতার রচনা-কাল ও উপলক্ষ নিয়ে ইতোমধ্যেই বহু বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। আমরা গ্রন্থ-পরিচয়ে যেসব তথ্য দিয়েছি, তাতে সে-বিতর্কের নিরসনে কিছু সহায়তা হবে। কিন্তু আমাদের হাতে প্রয়োজনীয় মাল-মশলা সর্ব নেই ; সেজন্যই কবির অনেক রচনার প্রথম প্রকাশ-কাল নির্দেশ করা সম্ভবপর হলো না। আমাদের তরুণ গবেষকরা এ-বিষয়ে সন্ধান করে সকল জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করবেন, এ আশাই আমরা করছি।

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩ — আবদুল কাদির

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণের সম্পাদকের নিবেদন

কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ডের সুনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী 'নজরুল-রচনাবলী'র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো। এই খণ্ডে নজরুল ইসলামের সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় যুগের রচনাসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অবশ্য 'সংযোজন'-বিভাগের প্রথম তিনটি কবিতা তার সাহিত্য-জীবনের প্রথম যুগে রচিত ; এগুলি রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে সংযোজিত হলেই কালানুক্রম রক্ষিত হতো। প্রথম খণ্ডের 'নিবেদন'-এ বলা হয়েছিল যে, সে খণ্ডের 'সংযোজন'-বিভাগে যে সকল লেখা সংকলিত হয়েছে তাছাড়াও সে সময়কার পত্র-পত্রিকাগুলি খুঁজলে কবির আরো কিছু লেখা পাওয়া যাবে—যা গ্রন্থবদ্ধ হয়নি, এবং সেরূপ কোনো লেখা পাওয়া গেলে তা পরবর্তী খণ্ডে পরিবেশন করা হবে। বলা বাহুল্য যে, উক্ত তিনটি কবিতা রচনাবলী প্রথম খণ্ড প্রকাশের অব্যবহিত পরে আমাদের লক্ষ্যগোচর হয়েছে। 'প্রবন্ধ' বিভাগের শেষ দুটি নিবন্ধ কবির সাহিত্য-জীবনের চতুর্থ অর্থাৎ শেষ যুগে রচিত। সে যুগে কবির সম্পাদিত দৈনিক 'নবযুগ'-পত্রে তাঁর স্বাক্ষরিত এরূপ বহু সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। সে-সকল দুর্লভ লেখা সংগ্রহ করা সম্ভবপর হলে চতুর্থ খণ্ডে সন্নিবেশিত হবে।

নজরুল তাঁর সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় যুগের সূচনায় যে মতবাদের প্রবক্তা হন, তা প্রত্যক্ষত গণতান্ত্রিক সমাজবাদ (ডেমোক্রেটিক সোস্যালিজম্)। তাঁর পরিচালিত 'লাঙলে' হয়েছিল তারই কালোপযোগী কর্ষণা। 'লাঙল' ছিল 'শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-সম্প্রদায়ের সাপ্তাহিক মুখপত্র' ; ১লা পৌষ ১৩৩২ মুতাবিক ১৬ই ডিসেম্বর ১৯২৫ তারিখে তার প্রথম (বিশেষ) সংখ্যাতেই সে-সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য ও 'চরম দাবি' বিবৃত করে নজরুল এক ইশতেহারে বলেন :

'নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের পূর্ণ-স্বাধীনতা-সূচক স্বরাজ লাভই এই দলের উদ্দেশ্য। ...।

আধুনিক কলকারখানা, খনি, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ট্রামওয়ে, স্টীমার প্রভৃতি সাধারণের হিতকরী জিনিস, লাভের জন্য ব্যবহৃত না হইয়া, দেশের উপকারের জন্য ব্যবহৃত হইবে এবং এতৎসংক্রান্ত কর্মিগণের তত্ত্বাবধানে জাতীয় সম্পত্তিরূপে পরিচালিত হইবে।

ভূমির চরম স্বত্ব আত্ম-অভাব-পূরণ-ক্ষম স্বায়ত্তশাসন-বিশিষ্ট পল্লী-তন্ত্রের উপর বর্তিবে—এই পল্লী-তন্ত্র ভদ্র শূদ্র সকল শ্রেণীর শ্রমজীবীর হাতে থাকিবে।'

ডেমোক্রেটিক সোস্যালিজমের প্রতি নজরুলের মনের প্রগাঢ় অনুরাগ তাঁর 'সাম্যবাদী', 'সর্বহারা' ও 'ফণি-মনসা'র বহু কবিতা ও গানে সুপরিস্ফুট। তাঁর 'মৃত্যু-ক্ষুধা' উপন্যাসের 'আনসার'-চরিত্র এই আদর্শবাদের আলোকে বিকশিত।

কিন্তু সেদিন কবি প্রবল আবেগ নিয়ে দেশের গণ-আন্দোলনের পুরোযায়ী চারণ হয়েছিলেন, তাতে ভাটা পড়লো দুটি কারণে। প্রথম কারণ : ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২রা এপ্রিল শুক্রবার থেকে কলকাতায় রাজরাজেশ্বরী মিছিল উপলক্ষে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সূত্রপাত। দ্বিতীয় কারণ : ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২২শে মে কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে কংগ্রেস-কর্মী-সংঘের সদস্যদের উদ্যোগে 'হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট' নাকচ করে প্রস্তাব গ্রহণ। নজরুল কৃষ্ণনগর সম্মেলনের উদ্বোধন করেছিলেন 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' গেয়ে, কিন্তু কাণ্ডারিদের কানে তাঁর আবেদন পৌঁছলো না। অগত্যা নজরুল আত্মরতির সন্ধান করলেন 'মাধবী-প্রলাপ' ও 'অনামিকা'র রোমান্টিক রূপ-জালে ক্রমে আত্মমগ্ন হলেন 'বুলবুল' ও 'চোখের চাতক'-এর সুর-লোকে। কিন্তু সেই রূপ ও সুরের মোহন মায়াজাল ভেদ করেও বারবার তাঁর কানে বেজেছে নিপীড়িত মানবতার কাতর আর্তনাদ ; তিনি নিরাসক্ত শিল্পীর আনন্দময় আসন ছেড়ে এসে রুদ্র কণ্ঠে গেয়েছেন 'সন্ধ্যা', 'প্রলয়-শিখা', 'চন্দ্রবিন্দু'র বেদনার্ত গাথা-গান।

'মৃত্যু-ক্ষুধা' উপন্যাসের 'আনসার' একস্থানে বলেছেন, 'নীড়হারাদের সাথী আমি। ওদের বেদনায়, ওদের চোখের জলে, পরিপূর্ণরূপে দেখতে পাই। ... আমার রাজনৈতিক মত বদলে গেছে।' এই আনসারের কণ্ঠে সেদিন পরোক্ষে ফুটেছে নজরুলেরই অন্তরের বাণী। বস্তুত তাঁর সাহিত্যের দ্বিতীয় স্তরে যে তাঁর রাজনৈতিক মতামত পরিবর্তিত হয় এবং তাঁর সাহিত্যধারা নূতন খাতে প্রবাহিত হয়, তা বর্তমান খণ্ডের লেখাগুলো একত্রে পড়ে নিঃসন্দেহে হৃদয়ঙ্গম হবে বলেই আমাদের নিশ্চিত ধারণা।

এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত 'সিন্ধু-হিন্দোল' ও 'জিঞ্জীর' বহুদিন বাজারে নাই। এ দুটি কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণও হয় নাই। ইতিমধ্যেই 'বুলবুল' হয়েছে দুর্লভ। 'সর্বহারা', 'ফণি-মনসা' ও 'চক্রবাক' নূতন সংস্করণে অনেক অদল-বদল হয়েছে। এই খণ্ডের জন্য 'বুলবুল'-এর গানগুলি আমাকে নকল করে পাঠিয়েছেন হুগলি থেকে শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়। 'সিন্ধু-হিন্দোল' দেখতে দিয়েছেন অধ্যাপক আবদুল কাইউম। 'চক্রবাক' প্রথম সংস্করণ সংগ্রহ করেছি 'আল ইসলাহ্' সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ নূরুল হকের সৌজন্যে সিলহেট কেন্দ্রীয় সাহিত্য-সংসদের পাঠাগার থেকে। 'গ্রন্থ-পরিচয়' লিখতে কিছু তথ্য সরবরাহ করেছেন অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। এঁরাও নজরুল-সাহিত্যের প্রচারকামী ; অতএব আমার কাছে কৃতজ্ঞতা দাবি করেন না।

এ-খণ্ডেরও 'গ্রন্থ-পরিচয়' অসম্পূর্ণ ; তারও কারণ আমাদের হাতে মালমশলার অভাব। তবে নজরুল-সাহিত্যের আলোচনা ক্রমশ যেরূপ বিস্তারিত হচ্ছে তাতে খুবই আশা করা যায় যে, নবীন গবেষকদের কল্যাণে কবির সকল লেখারই প্রথম প্রকাশকাল ও উপলক্ষ সম্পর্কে আবশ্যক তথ্যাদি পাঠকদের পরিজ্ঞাত হতে বেশি বিলম্ব ঘটবে না।

ঢাকা
২৫শে ডিসেম্বর ১৯৬৭

আবদুল কাদির

তৃতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণের সম্পাদকের নিবেদন

কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ডের সুবিবেচিত পরিকল্পনা অনুসারে নজরুল-রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো। এই খণ্ডে নজরুল ইসলামের সাহিত্য-জীবনের তৃতীয় যুগের প্রায় সমুদয় রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অবশ্য 'প্রবন্ধ' বিভাগে পরিবেশিত 'সত্যবাণী' তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রথম যুগে বিরচিত, অতএব রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে স্থান পেলেই কালানুক্রম রক্ষিত হতো। কিন্তু ১৩২৮ ভাদ্রের 'সাধনা'য় প্রকাশিত এ-লেখাটি সম্প্রতি আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে। এ-লেখাটিতে যে-সুর ধ্বনিত, নজরুলের সমগ্র গদ্য-রচনায় তার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত আর নেই। তাই রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের 'পরবর্তী সংস্করণে'র অপেক্ষা না করে এই মহামূল্য লেখাটি এই খণ্ডেই অন্তর্ভুক্ত হলো।

দ্বিতীয় খণ্ডের 'প্রবন্ধ'-বিভাগের শেষ দুটি লেখা দৈনিক 'নবযুগ'-এ সম্পাদকীয় নিবন্ধ-রূপে পত্রস্থ হয়েছিল। এই খণ্ডের 'ধর্ম ও কর্ম' শীর্ষক লেখাটিও 'নবযুগ'-এ প্রকাশিত কবির স্বাক্ষরিত এরূপ একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ। এ লেখাটি সংগ্রহ করে দিয়েছেন আমার পুত্রপ্রতিম স্নেহভাজন অধ্যাপক আবদুল কাইউম। দ্বিতীয় খণ্ডের 'সম্পাদকের নিবেদন'-এ আমরা বলেছিলাম যে, কবির সম্পাদিত দৈনিক 'নবযুগ'-পত্রে প্রকাশিত তাঁর স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলি 'সংগ্রহ করা সম্ভবপর হলে চতুর্থ খণ্ডে সন্নিবেশিত হবে।' কিন্তু 'সে-সকল দুর্লভ লেখা' সংগৃহীত হওয়ার আশা খুব উজ্জ্বল প্রতিভাত হচ্ছে না বলেই 'ধর্ম ও কর্ম' লেখাটি এই খণ্ডেই পরিবেশিত হলো।

[প্রথম খণ্ডের 'সম্পাদকের নিবেদন'-এ আমরা বলেছিলাম যে, নজরুল ইসলাম তাঁর 'সাহিত্য-জীবনের প্রথম যুগে যে-সকল শিশুপাঠ্য কবিতা লিখেছিলেন সেগুলি রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডে স্থান পাবে।' কিন্তু এই খণ্ডেরও কলেবর সীমিত ও সুমিত রাখা আবশ্যক বিধায় অবশেষে স্থির হয়েছে যে, নজরুলের 'ঝিঙে ফুল', 'পুতুলের বিয়ে', 'মক্তব-সাহিত্য', 'পিলে-পট্‌কা পুতুলের বিয়ে' (১৩৭০), 'ঘুম-জাগানো পাখি' (১৩৭১) প্রভৃতি শিশু-পাঠ্য।]*

নজরুল তাঁর সাহিত্য-জীবনের তৃতীয় যুগে প্রধানত গীতিকার ও সুরস্রষ্টা রূপেই প্রথিতকীর্তি ও প্রতিষ্ঠাপন্ন। রোমান্টিক কবি-কৃতির সকল লক্ষণ তাঁর এ-যুগের সাহিত্য সৃষ্টিতে সুস্পষ্ট। বঞ্চনাহত অরণ্যের আন্দোলক ও উন্মত্ত সমুদ্রের ঊর্মিলতা নজরুলের কাব্যে যেমন বাঙ্ময়, মিলনের উদ্দাম ও বিরহের ব্যাকুল বেদনা তাঁর প্রেমের

* সম্পাদনা-পরিষদ বর্তমান সংস্করণে নজরুলের রচনা কালানুক্রমভাবে সংকলিত হওয়ার দরুন গ্রন্থসমূহ বন্ধনীর অংশটুকু বর্তমান খণ্ডের গ্রন্থানুক্রমের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

গানে তেমনি ব্যঞ্জনাময়। তাঁর দেশাত্মবোধ ও ভক্তিভাবমূলক গানগুলিতেও প্রকৃতিপ্রেম ও প্রতীকপ্রীতি অভূতপূর্ব চিত্রকল্পে সমৃদ্ধ ও সৌন্দর্যময়। তাই অনবদ্য সৃষ্টির দিক দিয়ে নজরুলের শিল্পী-জীবনের দ্বিতীয় যুগকে যদি বলা হয় তাঁর কাব্য-সাধনার শ্রেষ্ঠ যুগ, তাহলে এই তৃতীয় যুগকে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে তাঁর সংগীত-সাধনার শ্রেষ্ঠ যুগ।

'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ'-এর ১০টি রুবাইর নজরুলের স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি এই খণ্ডে পরিবেশিত হয়েছে। তাতে দেখা যাবে যে, এগুলি গ্রন্থিত করার সময় কবি কোথাও কোথাও কিঞ্চিৎ পরিশোধিত করেছেন। কিন্তু 'কাব্যে আমপারা'-র মূল পাণ্ডুলিপি তিনি মুদ্রণ-কালে পরিবর্তন করেন বিস্তর। মূল পাণ্ডুলিপিখানি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল ; তা ছন্দের বিচারে ছিল সম্পূর্ণ নিখুঁত। কিন্তু পরে 'কোরআন-পাকের একটি শব্দও এধার-ওধার না করে তার ভাব অক্ষুণ্ণ' রাখতে গিয়েই তিনি অগত্যা অনুবাদে বাংলা ছন্দের প্রচলিত বিধান বহু স্থানে লঙ্ঘন করতে বাধ্য হন। ফলে এই পদ্যানুবাদের অনেক চরণেই ছন্দসাম্যের ব্যতিক্রম কানে বাজে। মরহুম আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন এই গ্রন্থখানির 'প্রুফ দেখা, তাকিদ দিয়ে লেখানো ইত্যাদি সমস্ত কাজ' শুধু সম্পন্ন করেননি, কবি-কর্তৃক পরিমার্জিত মূল পাণ্ডুলিপিখানিও সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। প্রায় ২৭ বৎসর পূর্বে সুহৃদ্বয় আবদুল মজিদ অকালে ইন্তেকাল করেছেন, অতঃপর তাঁর সংরক্ষিত সেই অমূল্য সম্পদ কোথায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কে জানে।

নজরুলের অনেক গান সাময়িকপত্রে যেভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, গ্রন্থে তার কোনো কোনো চরণ সামান্য পরিবর্তিত হয়েছে,—এরূপ কিছু দৃষ্টান্ত আমি 'গ্রন্থ-পরিচয়ে' দিয়েছি। আমার ধারণা যে, ভাবের প্রেরণায় নজরুল সে-সকল গান প্রথমে যেরূপ লিপিবদ্ধ করেন সেরূপেই সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়, কিন্তু পরে সেগুলি রেকর্ড করার সময় সুরের প্ররোচনায় যেভাবে পরিবর্তন করেন সেভাবেই গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে। অবশ্য এই জটিল বিষয়ে একমাত্র গীতি-বিশেষজ্ঞরাই সঠিক অভিমত ব্যক্ত করতে পারেন।

আবদুল কাদির

চতুর্থ খণ্ডের প্রথম সংস্করণের সম্পাদকের নিবেদন

'নজরুল-রচনাবলী'র প্রথম খণ্ড ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৭৪ বঙ্গাব্দের ৯ই পৌষ এবং তৃতীয় খণ্ড ১৩৭৬ বঙ্গাব্দের ৯ই ফাল্গুন তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের মধ্যে চতুর্থ খণ্ড প্রকাশের পরিকল্পনা ছিল ; কিন্তু দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বারংবার পরিবর্তনের দরুন তা প্রকাশিত হতে পাঁচ বছর সময় বেশি লেগে গেল। এই অস্বাভাবিক বিলম্বের জন্য আমাদেরও দুঃখের অন্ত নেই।

নজরুল ইসলামের সাহিত্য-জীবনের চতুর্থ যুগের প্রায় সমুদয় রচনা এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'কুহেলিকা' উপন্যাসখানি তাঁর সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় যুগে বিরচিত,—যে যুগে তাঁর সচেতন মনে দেশের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা ও সমাজতান্ত্রিক মানবিকতা (Socialistic Humanism) রাজনৈতিক চিন্তাদর্শরূপে প্রবলতম প্রেরণার সঞ্চার করেছে। এই 'কুহেলিকা' ছাড়া এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত আর কোনো গ্রন্থই কবির সম্বিতহারা হওয়ার আগে প্রকাশিত হয়নি। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ১০ই জুলাই তারিখে কবির মস্তিষ্কের অবশীর্ণতা-রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রথম লক্ষণ আকস্মিকরূপে দেখা দেয় ; তারপর তাঁর যে-সকল রচনা গ্রথিত হয়েছে, তাদের সজ্জা ও বিন্যাস তিনি সুস্থ থাকলে নিজে কিভাবে করতেন তা অনুমান করা কঠিন। এই খণ্ডে 'কবিতা ও গান' অংশের শেষে ১১১টি গান 'সঙ্গীতাঞ্জলি' নামে সন্নিবেশিত হয়েছে ; এই নামকরণও তিনি অনুমোদন করতেন কি না তা কে বলতে পারেন?

নজরুলের কবি-জীবনের চতুর্থ স্তরে ধর্মতত্ত্বাশ্রয়ী কবিতা (metaphysical poetry) ও মরমীয়া গান (mystical songs) এক বিশেষ স্থান ও মহিমা লাভ করেছে। এই যুগের একটি কবিতায় তিনি বলেছেন :

> আল্লা পরম প্রিয়তম মোর, আল্লা তো দূরে নয় ;
> নিত্য আমাকে জড়াইয়া থাকে পরম সে প্রেমময়। ...
> দিনে ভয় লাগে, গভীর নিশীথে চলে যায় সব ভয় ;
> কোন্ সে রসের বাসরে লইয়া কত কী যে কথা কয় !
> কিছু বুঝি তার, কিছু বুঝি নাকো, শুধু কাঁদি আর কাঁদি ;
> কথা ভুলে যাই, শুধু সাধ যায় বুকে লয়ে তারে বাঁধি !
> সে প্রেম কোথায় পাওয়া যায় তাহা আমি কি বলিতে পারি ?
> চাতকী কি জানে কোথা হতে আসে তৃষ্ণার মেঘ-বারি ?

কোনো প্রেমিক ও প্রেয়সীর প্রেমে নাই সে প্রেমের স্বাদ ;
সে–প্রেমের স্বাদ জানে একা মোর আল্লার আহ্লাদ।

আধ্যাত্মিকতার যে স্তরে উত্তীর্ণ হয়ে নজরুল এ–সকল কথা বলেছেন, তার অন্তর্গূঢ় রস–রহস্য পৃথিবীর একমাত্র মর্মবাদী সূফি সাধকেরাই উপলব্ধি করতে পারেন,—সাধারণ মানুষেরা সেই বাণীর রসে আপ্লুত হলেও তার রহস্য অনুধাবন করতে অক্ষম। নজরুল–সাহিত্যের চতুর্থ স্তরে এই অন্তর্জ্যোতিদীপ্ত আধ্যাত্মিকতাই পেয়েছে প্রাধান্য অথবা বৈশিষ্ট্য। প্রচলিত ধর্মের ও ধর্মসংস্কারের নানা রূপ ও রীতির আশ্রয়ে এই আধ্যাত্মিকতার অভিব্যক্তি হয়েছে জনমন–রঞ্জনের পরম উপযোগী,—অথচ ধর্মীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে আহরিত উপমা, রূপক ও চিত্রকল্পের সুমিত ব্যবহারে সম্পূর্ণ শিল্পসম্মত ও রসোত্তীর্ণ।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে আগস্ট তারিখে তাঁর বন্ধু ও সতীর্থ রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে লিখেছিলেন : 'Poor Man! When you sit down to read poetry, leave aside all religious bias'. কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর প্রায় এক শতাব্দীকাল পরেও দেখা যাচ্ছে নজরুলেরও শ্রেষ্ঠ অনুরাগীদেরই কেউ কেউ তাঁর সাহিত্য–বিচারেও হয়েছেন ধর্মীয় পক্ষপাতিত্ব–দোষে দিশাহারা। নজরুলের 'দেবীস্তুতি' নামক রচনাটির রূপকাশ্রিত ভাবতত্ত্ব ব্যাখ্যাচ্ছলে তার 'ভূমিকা'য় অধ্যাপক ডক্টর শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় বলেছেন : 'নজরুলের আসল পরিচয় : কাজী নজরুল ইসলাম স্বভাবে ও স্বরূপে মাতৃসাধক বা পরম শাক্ত।'—এ–প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করব। ১৩৩৮ সালের শ্রাবণ–আশ্বিন সংখ্যক 'জয়তী' পত্রিকায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে আমি লিখেছিলাম : 'নজরুল ইসলাম বাংলার মুসলিম রিনেসাঁসের প্রথম হুংকারই শুধু নহেন, কাব্যচর্চায় ইসলামের নিয়ম–কঠোরতা উপেক্ষা করিয়া neopaganism–এর সাহায্য–গ্রহণ ব্যাপারেও তিনি অগ্রণী।'—আমার সেই লেখাটি পড়ে নজরুল ইসলাম দৃঢ়স্বরে মন্তব্য করেন যে, তাঁর কবিতায় ও গানে বাহ্যত neo-paganism বলে যা আমাদের কাছে প্রতিভাত হচ্ছে, তা প্রকৃতপক্ষে pseudo-paganism। নজরুলের কোনো কোনো রচনায় বৈষ্ণবীয় লীলাবাদ ও শৈবসুলভ শক্তি–আরাধনা দেখে যাঁরা তাঁকে স্থূল কথায় প্রতীক–পূজারী বলতে চান, তাঁদের কাছে কবির বক্তব্য যে, তিনি কখনই প্যাগান বা নিউ–প্যাগান নন, তিনি কখনো কখনো কাব্য বিষয়ের অনুসরণে ও অন্তরের অনুপ্রাণিত ভাব–প্রকাশের প্রয়োজনে পরেছেন pseudo-pagan–এর (নকল প্যাগানের) সাময়িক কবি–বেশ।

আধুনিককালে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার অসামান্য জীবনবৃত্ত নিয়ে কাব্য বিরচনের চেষ্টা করেছিলেন মীর মশাররফ হোসেন ও মোজাম্মেল হক ; কিন্তু সেই প্রয়াস সম্পূর্ণাঙ্গ হতে পারেনি। নজরুল ইসলাম পরিণত বয়সে এই বিষয় নিয়ে 'মরু–ভাস্কর' রচনা শুরু করেন ; কিন্তু ৪২ বছর বয়সে দুরন্ত ব্যাধির কালগ্রাসে পড়ে এই প্রদীপ্ত প্রতিভা–সূর্য অকালে সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ হয়ে যাওয়ায় এই কাব্যখানিও অসমাপ্ত রয়ে

গেছে। নজরুল তাঁর 'মরু-ভাস্কর' কাব্যে বাংলা ভাষার প্রথাবদ্ধ ছন্দগুলি ব্যবহারে যে বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন, তা নূতন সম্ভাবনার ইঙ্গিতবহ।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে যাঁরা পরমাত্মার সহিত সাযুজ্য লাভের আনন্দ-সংবাদ দিয়েছেন, সামাজিক ঐক্য ও আর্ত-মানবতার প্রতি সুগভীর সহানুভূতি তাঁদের অমূল্য শিক্ষার এক বড় অঙ্গ। নজরুল-সাহিত্যের চতুর্থ স্তরে স্বভাবতই তাঁর সৌন্দর্য-প্রিয়তা ও প্রেম-বিহ্বলতা পেয়েছে প্রগাঢ়তম রূপ ; কিন্তু উদাসীন শিল্পীর সেই প্রসন্ন ধ্যানের আসনে বসেই নিপীড়িত মানবতার জন্য তাঁর বেদনা বোধের প্রকাশ হয়েছে পূর্বের চেয়ে আরও তীক্ষ্ণ ও প্রত্যক্ষ। 'নজরুল-রচনাবলী'র চতুর্থ খণ্ড এই বৈশিষ্ট্যেরই দাবিদার।

এই খণ্ডে সংকলিত 'অপরূপ রাস' এবং 'আবিরাবির্মএধি' শীর্ষক কবিতা দুটির প্রতিলিপি পাঠিয়েছেন হুগলি থেকে কবির পরম ভক্ত শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়। 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' কাব্যানুবাদের কবি-লিখিত 'ভূমিকা' সংগ্রহ করে দিয়েছেন কল্যাণীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম।

দৈনিক 'নবযুগ'-এ প্রকাশিত নজরুলের একটি মাত্র নিবন্ধ : 'বাঙালির বাঙলা' এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উক্ত পত্রিকায় কবির স্বাক্ষরযুক্ত আরও অনেক সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল ; কিন্তু সেগুলি সংগ্রহের উদ্যোগ নিবেন কে ?

এই খণ্ডের বর্ণানুক্রমিক সূচি প্রস্তুত করেছেন স্নেহভাজন খোন্দকার গোলাম কিবরিয়া।

ঢাকা
১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪

আবদুল কাদির

পঞ্চম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের প্রথমার্ধের সম্পাদকের নিবেদন

সাবেক কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড 'নজরুল-রচনাবলী' কয়েক খণ্ডে প্রকাশের যে বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, তদনুসারে ১৩৭৯ সনের ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের মধ্যে 'নজরুল-রচনাবলী' চতুর্থ খণ্ডের প্রকাশ আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু দেশের রাষ্ট্রনীতিক পরিস্থিতিতে পুনঃ পুনঃ পরিবর্তনের দরুন তা পাঁচ বৎসর বিলম্বিত হয়ে ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে ১১ই জ্যৈষ্ঠ মুতাবিক ১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে মে তারিখে প্রকাশিত হয়। তার কয়েক মাস আগে, ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে, আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন উপদেষ্টা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মরহুম আবুল ফজল সাহেবের সমীপে পঞ্চম খণ্ডের একটি সংক্ষিপ্ত পরিকল্প উপস্থাপন করেছিলাম এবং তিনি তা তখনই অনুমোদন করেন। তার প্রায় দুবছর পরে ১২-২-১৯৭৯ তারিখে আমি বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালকের কাছে উক্ত পরিকল্পের প্রতিলিপি-সহ একখানি পত্র প্রেরণ করি। সেই পত্রের উত্তরে একাডেমীর 'মহাপরিচালক সাহেবের আদেশক্রমে' ৬-৩-১৯৭৯ তারিখে আমাকে জানানো হয় যে, ১৫-২-১৯৭৯ তারিখে অনুষ্ঠিত 'বাংলা একাডেমীর কার্যনির্বাহী পরিষদের ৪৭-তম সংখ্যক মুলতবি অধিবেশনে' 'নজরুল-রচনাবলী' পঞ্চম খণ্ড প্রকাশের প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে এবং ২৪-৫-১৯৭৯ ইং তারিখের ৭৭১৪-সংখ্যক পত্রে আমাকে পঞ্চম খণ্ডের 'সমগ্র পাণ্ডুলিপি' ১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দের 'জুন মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে' দাখিল করতে বলা হয়। তদনুসারে ১১ই জুন তারিখে আমি 'পঞ্চম খণ্ডের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি' একাডেমীর মহাপরিচালক সাহেবের হাতে অর্পণ করি।

এরূপ স্বল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ও সম্পাদনা করতে হয়েছিল বলে আমাকে নজরুলের কিছু সংখ্যক রচনা সংকলন করার ব্যাপারে স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক শাহাবুদ্দীন আহমদ সাহেবের সহায়তা চাইতে হয়। তিনি সে-সময়ে আমার সহায়তা করতে সম্মত না হলে আমার ক্লেশ খুবই বৃদ্ধি পেতো। বলা বাহুল্য যে, তাঁকে তাঁর সেই অতি দ্রুততা-সহকারে সম্পন্ন কাজের জন্যে যথোপযুক্ত 'সম্মানী', পাণ্ডুলিপি একাডেমীতে দাখিল করার পূর্বেই, পরিশোধ করা হয়েছিল।

কিন্তু এই প্রায় পাঁচ বৎসরের ব্যবধানে পঞ্চম খণ্ডের মাত্র পাঁচ শত পৃষ্ঠা পর্যন্ত মুদ্রণ সম্ভবপর হয়েছে। পুস্তক প্রকাশের ব্যয় বর্তমানে যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তদনুপাতে পুস্তকের দাম বাড়াতে হয়েছে, তা বিবেচনা করে গ্রন্থমূল্য সহৃদয় পাঠকদের ক্রয়-ক্ষমতার মধ্যে রাখবার উদ্দেশ্যে উক্ত পাঁচ শত পৃষ্ঠার মূল পাঠ দিয়েই পঞ্চম খণ্ডের 'প্রথমার্ধ' প্রকাশ করা হলো। দ্বিতীয়ার্ধে থাকবে : (ক) হাসির গান,

(খ) নাট্যগীতি, (গ) নাটিকা ও প্রহসন, যথা—'ঈদ', 'গুল–বাগিচা', 'অতনুর দেশ', 'বিদ্যাপতি', 'বিষ্ণুপ্রিয়া', 'বিজয়া', 'পণ্ডিত মশায়ের ব্যাঘ্র শিকার' প্রভৃতি, (ঘ) প্রবন্ধ ও রস–রচনা, (ঙ) অভিভাষণ, (চ) চিঠিপত্র ও (ছ) গ্রন্থ–পরিচয়।

নজরুলের শিশুপাঠ্য গ্রন্থ 'ঝিঙে ফুল' ১৩৩৩ সালের আশ্বিন মাসে এবং 'পুতুলের বিয়ে' ১৩৪০ সালের শেষ দিকে প্রকাশিত হয়। এই দু'টি গ্রন্থ ছাড়া 'নজরুল–রচনাবলী' পঞ্চম খণ্ডের প্রথমার্ধে অন্তর্ভুক্ত আর কোনো গ্রন্থই কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি।

এই খণ্ডে কবির জাগরণধর্মী কবিতা ও কাব্যগীতিগুলি 'অগ্রনায়ক' অভিধায় পরিবেশিত হলো। এই জাগরণ হচ্ছে আত্মার জাগরণ, জনগণের, রাজনৈতিক, অর্থনীতিক ও সামাজিক ন্যায়সঙ্গত অধিকারসমূহ আদায়ের জন্যে চিত্তের জাগরণ। কবিতাগুলিতে পরমাত্মার সহিত কবি–প্রাণের সাযুজ্য, কবির উদার মানবিকতার আদর্শ ও গভীর স্বদেশপ্রীতি পরম হৃদয়স্পর্শী রসমূর্তি লাভ করেছে।

'মৃত তারা' বিভাগের কবিতা ও কাব্যগীতিগুলোতে কবির ব্যক্তি–স্বরূপের পরিচয় দেদীপ্যমান। কবির উপচেতন মনের নিগূঢ় স্বাক্ষর, মানুষের প্রতি অপরিমেয় প্রেম ও কল্যাণ–কামনা, এর রচনাগুলোকে করেছে তাৎপর্যপূর্ণ।

'ঝিঙে ফুল' ও 'পুতুলের বিয়ে' গ্রন্থদ্বয়ে অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলো ছাড়া, কবি যে–সকল কিশোর–পাঠ্য কবিতা, ব্যঙ্গকবিতা ও নাটিকা লিখেছেন, সেগুলো এই খণ্ডে 'কিশোর' নামে সন্নিবেশিত হলো।

নজরুল ইসলাম কলিকাতা বেতারে 'হারামণি', 'গীতি–বিচিত্রা' ও 'নবরাগ–মালিকা' নামে তিনটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের মারফতে ক্লাসিক্যাল রাগ ও নবতর রাগের বহু সঙ্গীত প্রচার করে তাঁর অলোকসামান্য সৃষ্টিধর্মী শিল্পপ্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন। এই তিনটি অনুষ্ঠানে কবি বিভিন্ন রাগ–রাগিণীর অনুমিশ্রণ ঘটিয়ে এবং নানা নতুন সুরের সৃষ্টি করে বহুসংখ্যক সঙ্গীত প্রচার করেন। তাদের কোন বিভাগে তিনি কোন কোন সঙ্গীত ও কতগুলি সঙ্গীত প্রচার করেছিলেন, তা বাংলা সঙ্গীত–সাহিত্যের গবেষকদের এক বড় গবেষণার বিষয়। আমি কবির দেওয়া উক্ত নামগুলির অনুসরণে এই খণ্ডের গানগুলিকে 'সন্ধ্যামণি', 'গীতি–বিচিত্রা' ও 'নবরাগমালিকা', এই তিন নামের অধীনে বিন্যস্ত করেছি। 'সন্ধ্যামণি' আখ্যায় কবির প্রেমমূলক গানগুলি সংকলিত হয়েছে। 'গীতি–বিচিত্রা' আখ্যায় ভক্তিমূলক ও ধর্মতত্ত্বাশ্রয়ী সঙ্গীতগুলি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। 'নবরাগ–মালিকা' শ্রেণীতে স্থান পেয়েছে প্রধানত কবির উদ্ভাবিত নবরাগের গানগুলি। সেগুলিতে আছে রাগ–রাগিণীর সূক্ষ্মতম কারুকার্য ও বিস্ময়প্রদ সুরবৈচিত্র্য।

নজরুল ইসলাম কলিকাতা বেতারে প্রতি মাসে একবার 'হারামণি' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অপ্রচলিত ও লুপ্তপ্রায় রাগ–রাগিণীর পুনঃপ্রচলনের জন্যে নূতন গান প্রচার করতেন। সে–সকল গানের অধিকাংশই আজ পাওয়া যায় না। একবার খবর বেরিয়েছিল যে, 'হারামণি' অনুষ্ঠানের জন্যে লেখা নজরুলের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একটি খাতা কবির অন্যমনস্কতাবশত হারিয়ে গেছে। কিন্তু সেই হারানো সম্পদ উদ্ধারের কোনো চেষ্টা কি আজ অবধি কোথাও হয়েছে?

প্রতি মাসে দুইবার 'গীতি–বিচিত্রা' অনুষ্ঠানটি হতো। সেই পৌনে এক ঘণ্টাব্যাপী অনুষ্ঠানে সম্প্রচারিত হতো গীতি–আলেখ্য। কলিকাতা বেতারে নজরুলের রচিত প্রায়

আশিটি গীতি-আলেখ্য প্রচারিত হয়েছে। প্রতিটি গীতি-আলেখ্যে একটি মূল বিষয়কে আশ্রয় করে ছয়টি করে গান পরিবেশিত হতো। নজরুলের 'শেষ সওগাত' কাব্যের 'কাবেরী-তীরে' সেই অনুষ্ঠানেই প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু 'কাফেলা', 'ছন্দসী' প্রভৃতি নামে যে-সকল গীতি-আলেখ্য প্রচারিত হয়েছিল, তাদের কোনও পাঠ অদ্যাবধি সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়নি। নজরুলের 'ছন্দিতা' নামক গীতিগুচ্ছের 'স্বাগতা', 'প্রিয়া', 'মধুমতী', 'রুচিরা', 'দীপক-মালা', 'মন্দাকিনী' ও 'মণিমালা' নামক গানগুলি সংস্কৃত বৃত্তচ্ছন্দে সংরচিত। বাংলা ভাষায় প্রাকৃত মাত্রাচ্ছন্দে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গান লিখেছেন ; কিন্তু নজরুল ইসলাম ছাড়া আর কেউই সংস্কৃত বৃত্তচ্ছন্দে বাংলা গানের বাণী বিরচন করতে সক্ষম হননি ; এই রীতিতে বাংলা সঙ্গীতে নজরুলের অচিন্তিতপূর্ব অবদান তাঁর অলৌকিক কবি-প্রতিভার বিস্ময়প্রদ পরিচয় বহন করে। তাঁর 'ছন্দসী' নামক সঙ্গীত-আলেখ্যের দুটি অনুষ্ঠানে সংস্কৃত 'মালিনী', 'বসন্ত তিলক', 'তনুমধ্যা', 'ইন্দ্রবজ্রা', 'মন্দাক্রান্তা', 'শার্দূলবিক্রীড়িত' প্রভৃতি বৃত্তচ্ছন্দে বিরচিত তাঁর ১২টি গান প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু সে-সকল মহামূল্যবান গানের বাণী কে সংগ্রহ করবেন? নজরুল ইসলামের এ-সকল অবলুপ্তিমুখীন বিচিত্র গীতাবলী ও কীর্তন-গান সংগৃহীত হলে নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপন্ন হবে যে, নজরুল ইসলাম বাংলা ভাষার সঙ্গীত-সম্রাট।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা', শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জাহাঙ্গীর' ও 'অন্নপূর্ণা', শ্রীমন্মথ রায়ের 'মহুয়া' ও 'লায়লী-মজনু' প্রভৃতি নাটকের জন্যে নজরুল ইসলাম অনেক গান লিখে দিয়েছিলেন। 'চৌরঙ্গী', 'দিক্‌শূল', 'নন্দিনী', 'পাতালপুরী', 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন' প্রভৃতি বাণীচিত্রের জন্যেও নজরুল বহু গান প্রণয়ন করেছিলেন। কিন্তু তাদের সকল গান নজরুলের গীতিগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কি না, তা অনুসন্ধেয়।

নজরুল ইসলাম ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে 'বিদ্যাপতি' ছায়াছবির কাহিনী এবং ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে 'সাপুড়ে' ছায়াছবির কাহিনী রচনা করেন। এ দুটি ছায়াচিত্রের রেকর্ডবদ্ধ বাণী লিপিবদ্ধ করবার কোনো উদ্যোগ অদ্যাবধি কেউ নিয়েছেন বলে শুনিনি। এ দুটি ছায়ানাট্যের সমগ্র পাঠ পাওয়া গেলে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে, সন্দেহ নেই।

১৩৯১ সনের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ আমার বয়স ৭৮-বৎসর পূর্ণ হয়ে ৭৯-বৎসর শুরু হবে। বর্তমানে আমি বহুব্যাধিগ্রস্ত জরাজীর্ণ ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধ। প্রায় সতেরো বছর আগে আমার ডান চোখের ছানি কাটা হয়েছিল ; কিন্তু সেই চোখ এখনও কাজে লাগছে না। ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর আমার বাম চোখের ছানি কাটা হয়েছে। এই অবস্থায় আমার পক্ষে নজরুল ইসলামের অবলুপ্তিমুখীন রচনাবলী সংগ্রহের চেষ্টা করা আর সম্ভবপর নয়। আমি আশা করব যে, নজরুল-রচনাবলী ষষ্ঠ খণ্ডের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত এবং তা সম্পাদনার কাজ সম্পন্ন করতে আমাদের নবীন নজরুল-গবেষক ও নজরুল-অনুরাগীরা সাগ্রহে এগিয়ে আসবেন।

ঢাকা
১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১

আবদুল কাদির

পঞ্চম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয়ার্ধের সম্পাদকের নিবেদন

যে-কোনো সমাজ-সচেতন সৃষ্টিশীল সাহিত্য-প্রতিভার মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবাদর্শে মোড় পরিবর্তন দেখা যায়। কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ-সচেতন কবি ; সুতরাং তাঁর রচনাবলীর কালানুক্রমিক বিচারে তাঁর চিন্তা-চেতনার ধারা-বদলের নিদর্শন পাওয়া যাবে এ খুবই স্বাভাবিক। 'নজরুল-রচনাবলী'র পঞ্চম খণ্ডের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত তাঁর মনন-ধারার অনুসরণ করে আমার মনে এই ধারণা হয়েছে যে, কবি শেষ পর্যন্ত যে-সামাজিক ভাবনার স্তরে পৌঁছেছেন তাকে বলা চলে Spiritual Communism—আধ্যাত্মিক ধন-সাম্যবাদ। নজরুলের অবশিষ্ট রচনাবলী সংগৃহীত হয়ে গ্রন্থবদ্ধ হলে তাঁর ভাবাদর্শের সামগ্রিক স্বরূপ সম্বন্ধে হয়ত পাঠকদের মনে নূতনতর উপলব্ধি হতে পারে। অতএব তাঁর অবশিষ্ট রচনাসমূহ সংগ্রহ করে 'নজরুল-রচনাবলী' ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশের যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে, এই-ই আমি আশা করছি।

ঢাকা — আবদুল কাদির

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪

নতুন সংস্করণের প্রসঙ্গ-কথা

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৯৪তম জন্মবার্ষিকীর প্রাক্কালে তাঁর রচনাবলী একসঙ্গে প্রকাশ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। ইতঃপূর্বে বাংলা একাডেমী থেকে কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় 'নজরুল-রচনাবলী' পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। জনাব আবদুল কাদির যখন কবির রচনাবলী সংকলন ও সম্পাদনার কাজ শুরু করেন তখন নজরুলের গ্রন্থাবলীর বিভিন্ন সংস্করণ ও ধারাবাহিকভাবে নজরুলের সমস্ত রচনা পাওয়া ছিল বেশ দুরূহ ব্যাপার। ফলে তাঁর সম্পাদিত রচনাবলী পূর্ণাঙ্গ ও ত্রুটিমুক্ত নয়। কিন্তু 'নজরুল-রচনাবলী' সংকলন ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ও অগ্রযাত্রীর ভূমিকা আমরা চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব।

বর্তমান রচনাবলী বাংলা একাডেমী প্রকাশিত কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত উক্ত 'নজরুল-রচনাবলী'রই আরো সংহত, পূর্ণাঙ্গ, কালানুক্রমিক ও পরিমার্জিত রূপ। এই সংস্করণটির সংকলন ও সম্পাদনার দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন বাংলা একাডেমীর কার্যনির্বাহী পরিষদ-মনোনীত দেশের বরেণ্য নজরুল-বিশেষজ্ঞগণ।

কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য এদেশের মানুষকে তাঁদের আন্দোলনে ও সংগ্রামে, কার্য ও ভাবনায় উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করে আসছে, ভবিষ্যতেও করবে। নজরুল-সাহিত্য সুলভে এদেশের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার ইচ্ছা আমাদের মন্ত্রণালয়ের অর্থানুকূল্য ব্যতীত এই প্রত্যাশা পূরণ সম্ভব ছিল না। এ-প্রসঙ্গে এই মন্ত্রণালয়ের—বিশেষভাবে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপিকা জাহানারা বেগমের ব্যক্তিগত উৎসাহ এবং আগ্রহের কথা আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

এই রচনাবলীর সংকলন, সম্পাদনা, মুদ্রণ ও প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

আমাদের এই প্রয়াস যদি নজরুল-অনুরাগ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় এবং রচনাবলীর এই নতুন সংস্করণ আদৃত হয় তাহলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

ঢাকা
১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০॥ ২৫ মে ১৯৯৩

মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

নতুন সংস্করণের মুখবন্ধ

বিশিষ্ট কবি, সমালোচক ও নজরুল–বিশেষজ্ঞ আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় পাঁচ খণ্ডে নজরুল–রচনাবলী প্রকাশিত হয় সুদীর্ঘ আঠারো বছর ধরে। কেন্দ্রীয় বাঙলা–উন্নয়ন–বোর্ড থেকে এর প্রথম তিনটি খণ্ড প্রকাশ লাভ করে যথাক্রমে ১৯৬৬, ১৯৬৭ ও ১৯৭০ সালে। ১৯৭২ সালে কেন্দ্রীয় বাঙলা–উন্নয়ন–বোর্ড একীভূত হয় বাংলা একাডেমীর সঙ্গে। তারপর বাংলা একাডেমী থেকে 'নজরুল–রচনাবলী' চতুর্থ খণ্ড ১৯৭৭ সালে এবং পঞ্চম খণ্ড দুই ভাগে ১৯৮৪ সালে (প্রথমার্ধ জুনে ও দ্বিতীয়ার্ধ ডিসেম্বরে) প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ মুদ্রিত হয় ১৯৭৫ সালে, তৃতীয় খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৭৬ সালে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৮৪ সালে। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই মুদ্রিত গ্রন্থের ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে যায়।

'নজরুল–রচনাবলী' পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তার একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশের পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং বাংলাদেশ সরকার এজন্যে বিশেষ অর্থ মঞ্জুরি প্রদান করেন। অন্যদিকে একথাও উপলব্ধ হয় যে, আবদুল কাদিরের গভীর পাণ্ডিত্য ও বিপুল শ্রমের স্বাক্ষরবহ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সম্পাদিত 'নজরুল–রচনাবলী'র বিন্যাসে কিছু যৌক্তিক পরিবর্তন করা প্রয়োজন এবং এর পাঁচ খণ্ডে যেসব রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়নি, এখন তার সন্ধান পাওয়া যাওয়ায়, সেসবও এতে সন্নিবেশিত হওয়া দরকার। এই উদ্দেশ্যে ১৯৯২ সালে বাংলা একাডেমী নয় সদস্যবিশিষ্ট সম্পাদনা–পরিষদ গঠন করে 'নজরুল–রচনাবলী'র সুলভ ও পরিমার্জিত সংস্করণ সম্পাদনার দায়িত্ব তাঁদের উপর অর্পণ করেন।

এই নতুন সংস্করণে যে–সব পরিবর্তন করা হয়েছে, তা এই :

১. কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বইগুলি যথাসম্ভব কালানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। যেমন আগে 'অগ্নি–বীণা'র পরে 'বিষের বাঁশী' এবং তারপরে 'দোলন–চাঁপা' বিন্যস্ত হয়েছিল। নতুন সংস্করণে ক্রম হয়েছে 'অগ্নি–বীণা', 'দোলন–চাঁপা', 'বিষের বাঁশী'। এসব বইয়ের ক্ষেত্রে কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত সর্বশেষ সংস্করণের পাঠ তাঁর অভিপ্রেত পাঠ বলে গণ্য করে তা অনুসরণ করা হয়েছে।

২ কবির অসুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বইগুলিও কালানুক্রমিকভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। এসব বইয়ের ক্ষেত্রে প্রথম সংস্করণের পাঠ যথাসম্ভব অনুসরণ করা হয়েছে।

৩. গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা কোনো কোনো খণ্ডে 'সংযোজন' শিরোনামে রচনাবলীতে মুদ্রিত হয়। আবার পঞ্চম খণ্ডে এ ধরনের কিছু কিছু রচনা একেক নামের গ্রন্থরূপে সন্নিবেশিত হয়। যেমন, 'সঙ্গীতাঞ্জলি', 'সন্ধ্যামণি', 'নবরাগমালিকা'। কিন্তু ওসব নামে কোনো গ্রন্থ কখনো প্রকাশিত না হওয়ায় অনুরূপ বিন্যাস আমরা সংগত বিবেচনা করিনি। ওসব শিরোনামের অন্তর্গত রচনা এবং সংযোজন পর্যায়ের রচনা 'গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা'র পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে।

৪. নজরুল ইসলামের বিভিন্ন সংগীতগ্রন্থের গান বর্তমান সংস্করণে গৃহীত হয়েছে, তবে স্বরলিপি মুদ্রিত হয়নি। আমরা মুদ্রিত গানের পাঠ অনুসরণ করেছি, রেকর্ডে ধারণকৃত বা স্বরলিপিতে বিধৃত গানের পাঠে ভেদ থাকলে তা নির্দেশ করা হয়নি।

৫. নজরুল ইসলামের নামে প্রকাশিত যে-সব গ্রন্থের সন্ধান আগে পাওয়া যায়নি কিংবা যেসব গ্রন্থ 'নজরুল-রচনাবলী' প্রকাশের পর বেরিয়েছে, সেগুলো বর্তমান সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ-ধরনের অনেক গ্রন্থে নজরুলের পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থের উপকরণ গ্রহণ করা হয়। সেক্ষেত্রে আমরা একই রচনা দু'বার মুদ্রণ না করে গ্রন্থপরিচয়ে তার উল্লেখ করেছি।

৬. আবদুল কাদির-প্রদত্ত গ্রন্থপরিচয় অক্ষুণ্ন রেখে 'পুনশ্চ' শিরোনামে গ্রন্থ-সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

৭. নজরুল ইসলামের প্রকাশিত গ্রন্থে বানানের সমতা নেই। সেজন্যে আমরা আধুনিক বানানপদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। অবশ্য বইয়ের নামের বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, যেমন 'বিষের বাঁশী' কিংবা 'পূবের হাওয়া'। তবে দ্বিত্ব বর্জিত হয়েছে, যেমন 'সর্বহারা'। যে-সব ক্ষেত্রে বানানের কোনো বিশেষত্ব অক্ষুণ্ন রাখা সংগত মনে হয়েছে, সেখানে আমরা কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত সংস্করণের বানান বজায় রেখেছি।

৮. পাঁচ খণ্ডের জায়গায় চার খণ্ডে এবারে নজরুল-রচনাবলী প্রকাশিত হলো বলে বিভিন্ন খণ্ডের বিন্যাসের বড়রকম পরিবর্তন ঘটেছে। আবদুল কাদির প্রত্যেক খণ্ডের একটা ভাবগত সামঞ্জস্যের কথা ভেবেছিলেন। তা যে সর্বত্র রক্ষা করা যায়নি, সেকথাও তিনি স্বীকার করেছিলেন। নতুন সংস্করণে প্রথম খণ্ডে ১৯২২ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত নজরুল ইসলামের সকল গ্রন্থ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ১৯৩০ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ তাঁর সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বাকি সব বই সন্নিবেশিত হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হয়েছে কবির অসুস্থাবস্থায় প্রকাশিত কাব্য ও গীতি-গ্রন্থ এবং গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা ও গান। চতুর্থ খণ্ডে আছে কবির অসুস্থাবস্থায় প্রকাশিত গদ্য ও নাট্যগ্রন্থ, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত গদ্য ও নাট্যরচনা এবং চিঠিপত্র। এই দুই খণ্ডের রচনাবিন্যাসে কালক্রম রক্ষা করা সম্ভবপর হয়নি।

৯. কবির নির্বাচিত কবিতার সংগ্রহ 'সঞ্চিতা' এই রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়নি, তবে 'সঞ্চিতা'র প্রকাশ সম্পর্কিত তথ্য ও সূচি প্রথম খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ে দেওয়া হয়েছে।

১০. 'মক্তব-সাহিত্য' বইটির একটি কীটদষ্ট কপি নজরুল ইন্সটিটিউটে রক্ষিত আছে। কীটদষ্ট অংশের পাঠ উদ্ধার করা সম্ভবপর না হওয়ায় রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে 'মক্তব-সাহিত্যে'র উদ্ধারযোগ্য অংশ সন্নিবিষ্ট হলো।

'নজরুল-রচনাবলী'র সুলভ ও পরিমার্জিত সংস্করণের পাঠ-নির্ধারণের বিষয়ে সম্পাদনা-পরিষদের সদস্যেরা যে শ্রম ও সময় ব্যয় করেছেন, তার জন্যে আমি তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। এই কাজে কবির রচনার বিভিন্ন সংস্করণ দিয়ে সাহায্য করেছেন নজরুল ইন্সটিটিউট-কর্তৃপক্ষ। তাছাড়া অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল কাইউমের কাছ থেকে আমরা বিভিন্ন গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্য সংস্করণ দেখার সুযোগ পেয়েছি। অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ও জনাব মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্র ব্যক্তিগত সংগ্রহও আমরা ব্যবহার করেছি। সম্পাদনা-পরিষদের সদস্য-সচিব সেলিনা হোসেনের উদ্যম ও মোবারক হোসেনের পরিশ্রমের কথা উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ সকল পর্যায়ে আমাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা দিয়েছেন। আমি এঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

'নজরুল-রচনাবলী'র সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করা একটি দুরূহ কর্ম। বিশিষ্ট কবি, সমালোচক ও নজরুল-বিশেষজ্ঞ আবদুল কাদির এই কাজে অগ্রসর হয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। নতুন সংস্করণে আমরা কিছু উন্নতিবিধানের চেষ্টা করেছি। তবে এটিই চূড়ান্ত নয়। আমরা আশা করব, ভবিষ্যতে গবেষকরা 'নজরুল-রচনাবলী'র আরো শুদ্ধ ও আরো সম্পূর্ণ সংস্করণ-প্রকাশে উদ্যোগী হবেন।

ঢাকা
১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪০০॥ ২৫শে মে ১৯৯৩

আনিসুজ্জামান
সম্পাদনা-পরিষদের সভাপতি

সূচিপত্র

১৯৭২ সালে ধানমন্ডীর বাসভবনে নজরুলের পাশে প্রধানমন্ত্রী (পরে রাষ্ট্রপতি) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
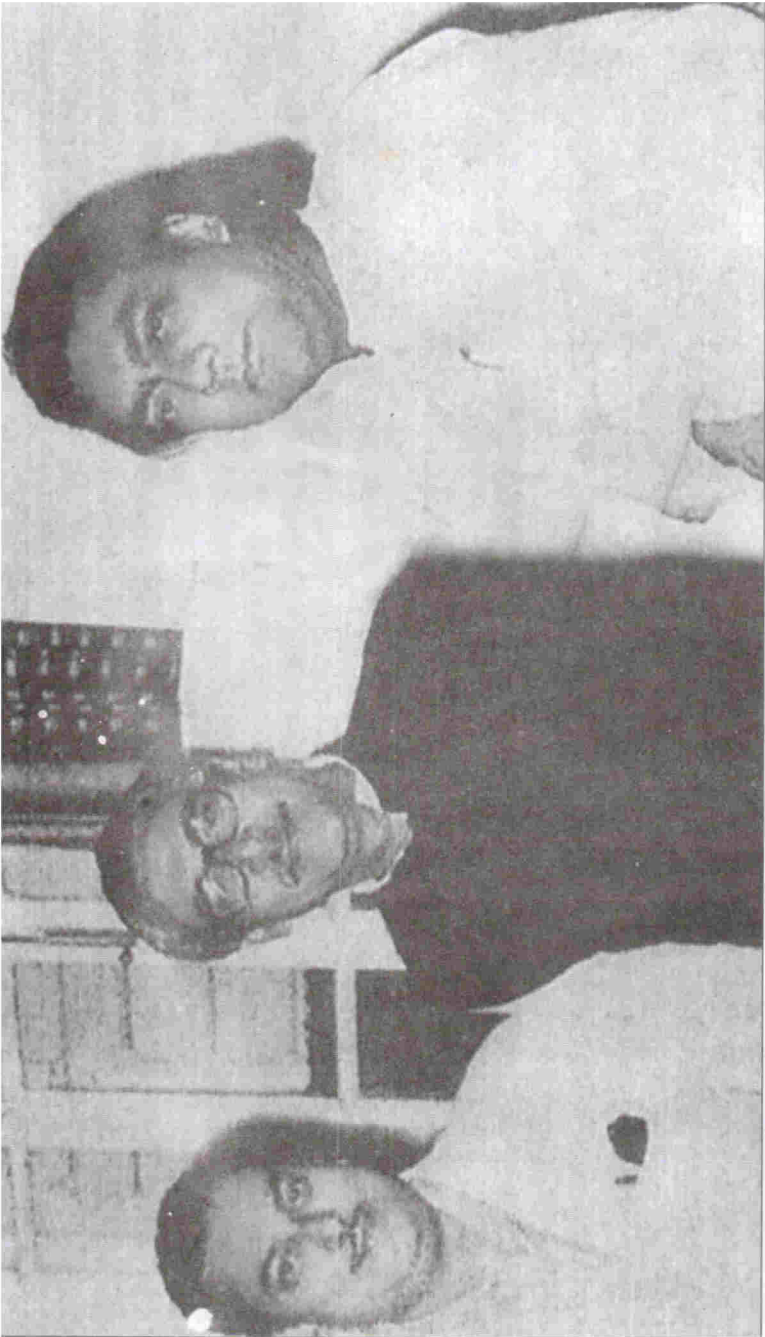
বঙ্গবন্ধু এবং কবিপুত্র কাজী সব্যসাচী ও কাজী অনিরুদ্ধ

বাংলাদেশে কবি আসার অব্যবহিত পরে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ১৯৭২ সালের ২৪শে মে ধানমণ্ডীর কবিভবনে কবিকে মাল্যভূষিত করছেন
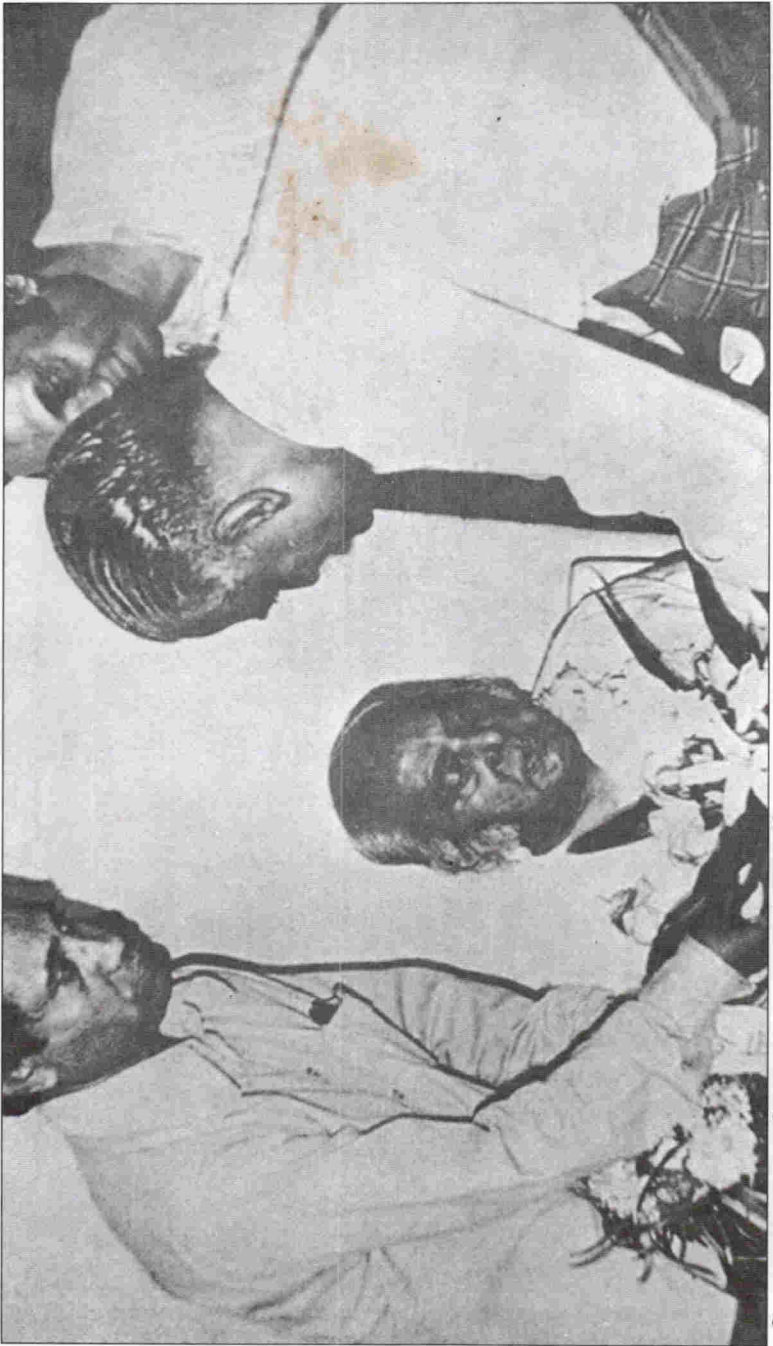
মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল এম. এ. জি ওসমানী কবিকে মাল্যভূষিত করছেন

বাংলা একাডেমীর সংবর্ধনা-অনুষ্ঠানে নজরুল

১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কবিকে সম্মানসূচক ডি.লিট. উপাধি প্রদান করা হয়

১৯৭৬ সালে বঙ্গভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কবিকে একুশে পদকে ভূষিত করছেন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবু-সা'দাত মোহাম্মদ সায়েম
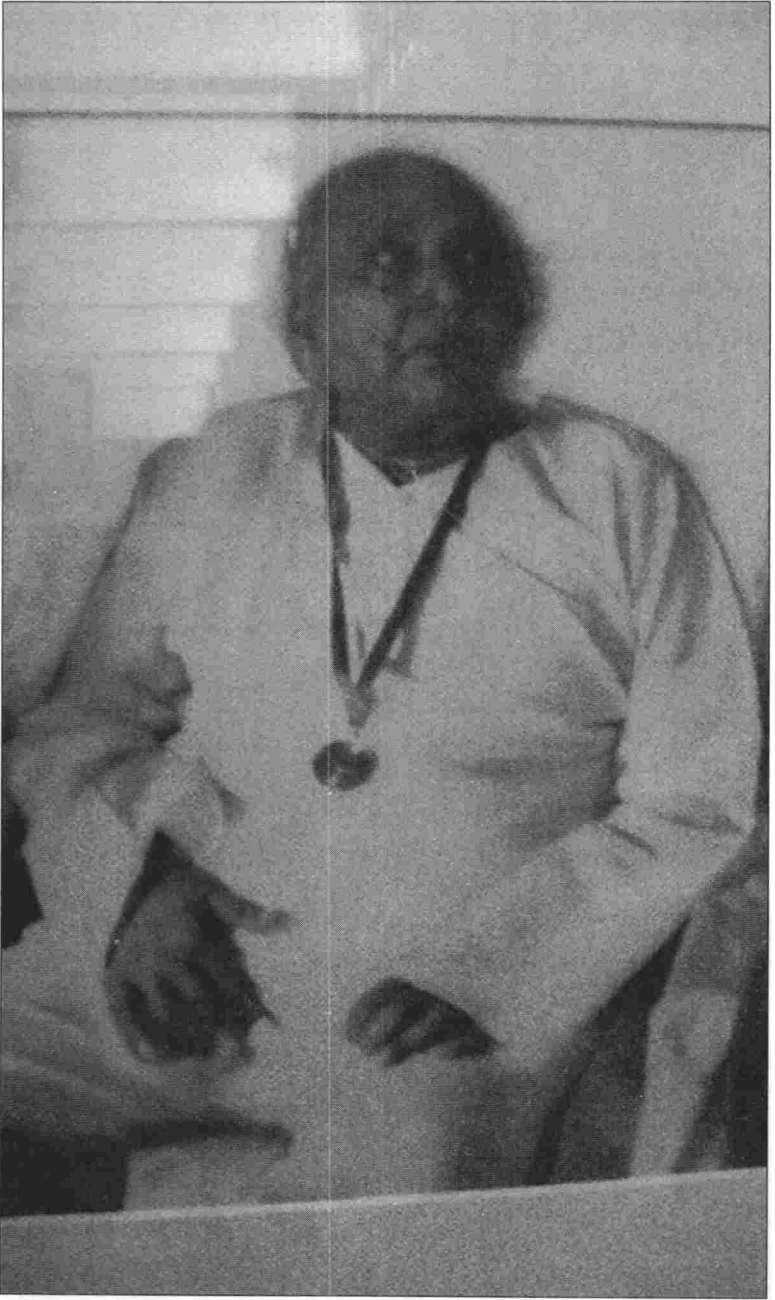
একুশে পদকে ভূষিত নজরুল

১৯৭৫ সালের মে মাসে ঢাকার পি জি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কবি নজরুল ও কবি জসীমউদ্‌দীন

১৯৭৩ সালে ধানমন্ডীর কবি ভবনে পরিবারের কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে নজরুল (বাম থেকে ডানে) কবির নাত্‌নী খিলখিল কাজী, নাতী বাবুল কাজী, পুত্র কাজী সব্যসাচী, পুত্রবধূ উমা কাজী ও নাত্‌নী মিষ্টি কাজী

চিরনিদ্রায় নজরুল
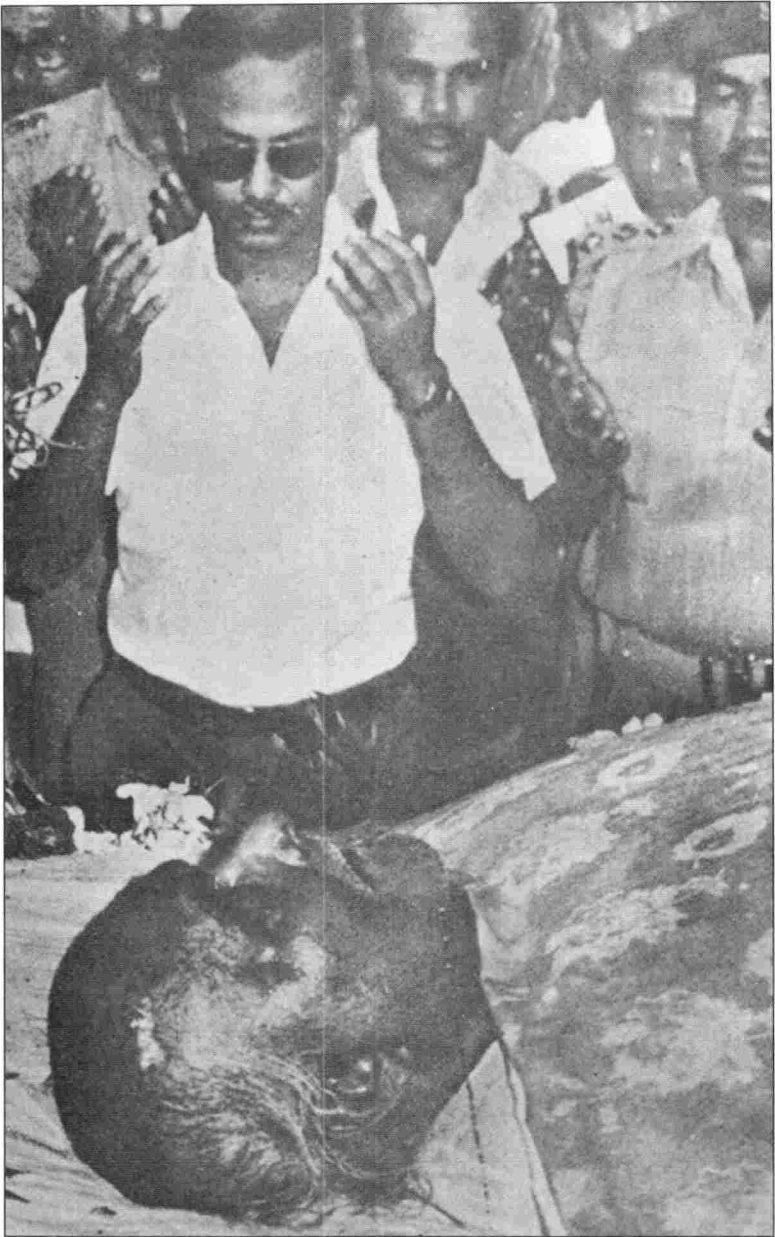
কবির লাশের পাশে তৎকালীন উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও সেনাবাহিনী-প্রধান-মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান (পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি) কবির আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করছেন

১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট কবির মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁর মরদেহের পাশে কোরআন শরীফ পাঠ করছেন কবিবন্ধু কাজী মোতাহার হোসেন
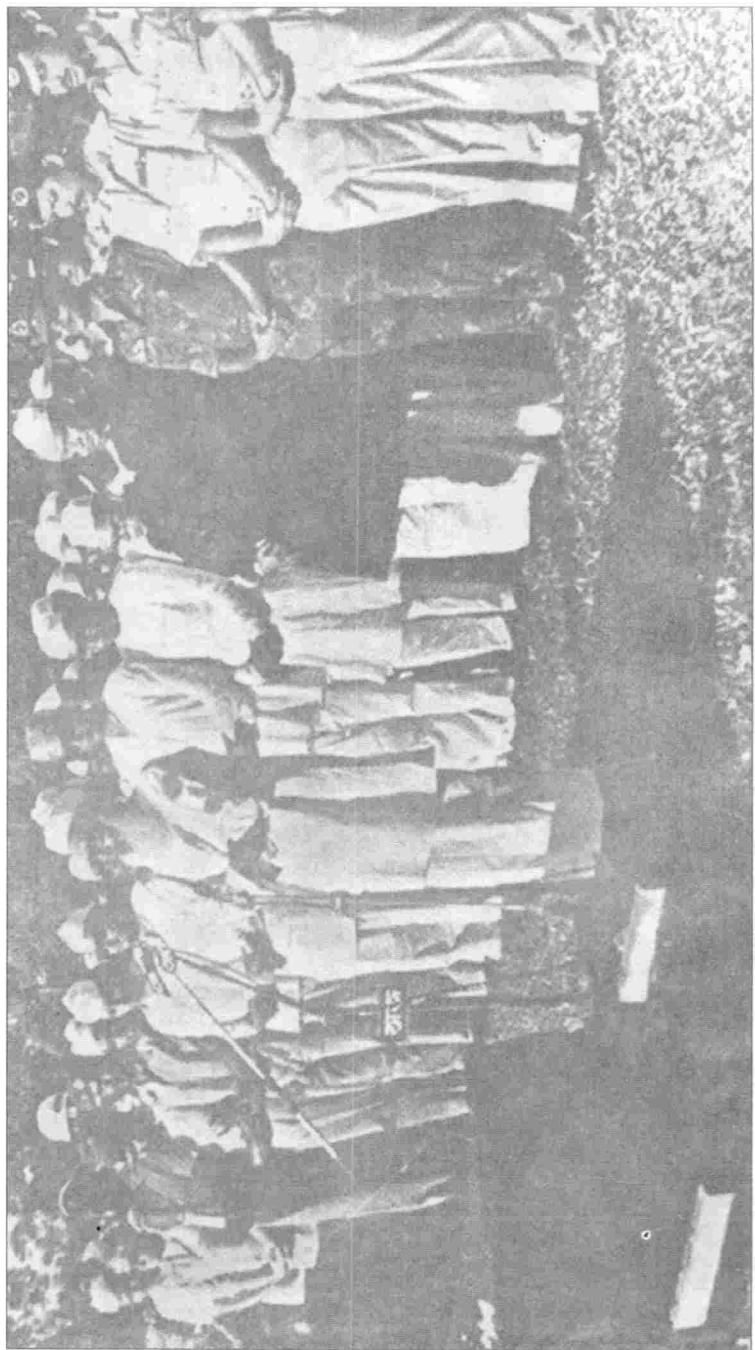
১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট ঢাকার সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে কবির নামাজে জানাজায় তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বিচারপতি আবু-সা'দাত মোহাম্মদ সায়েম এবং তৎকালীন উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও সেনাবাহিনী-প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান (পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি) ও অন্যান্য

কবির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকদল 'রেজিমেন্টাল কালার' অবনমিত করছেন
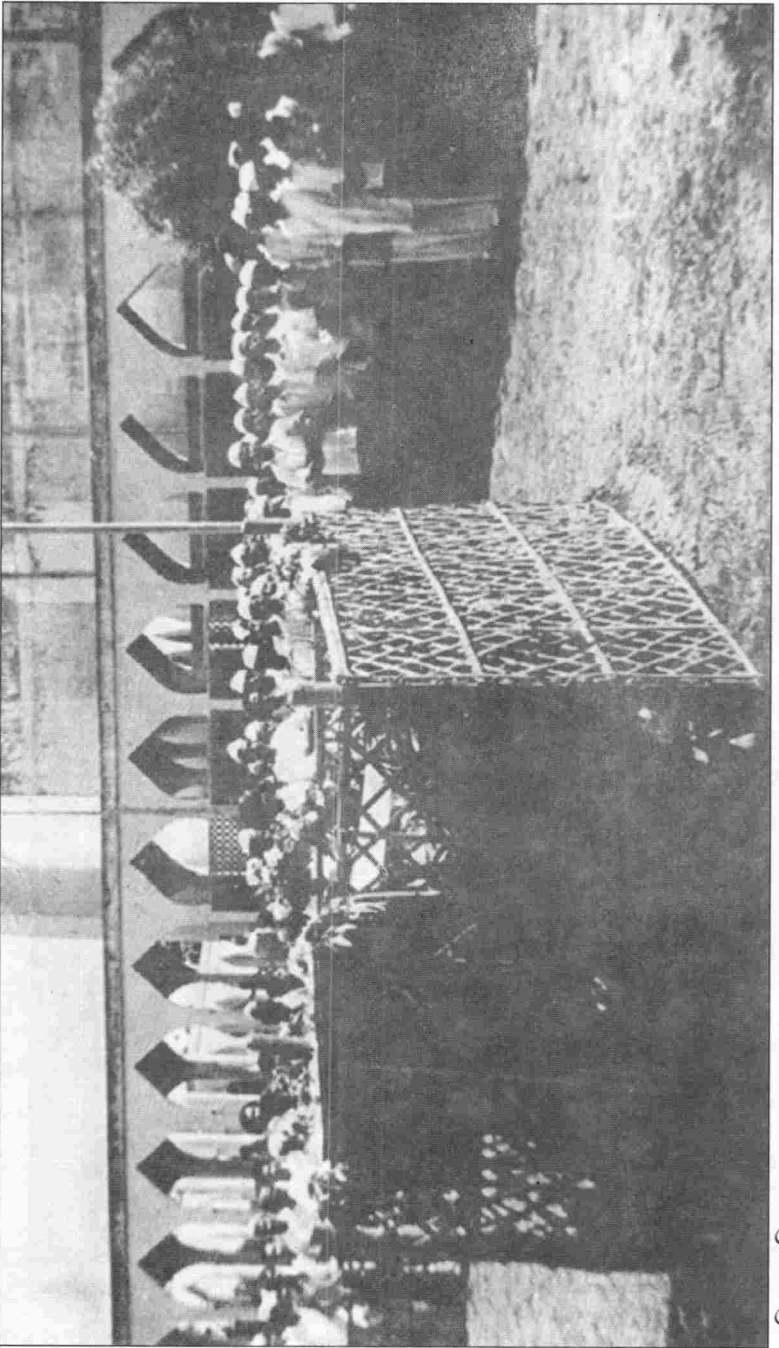
কবির সমাধি

সুর ও শ্রুতি

সুর ও শ্রুতি

বর্তমান যুগের সর্বজনমান্য সঙ্গীত-আচার্যগণ সঙ্গীতকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। (১) গ্রন্থসঙ্গীত (২) লক্ষ বা লকস সঙ্গীত (৩) ভাবীসঙ্গীত।

গ্রন্থসঙ্গীত অর্থে ইহাই বুঝায়, যে-সঙ্গীত অতীত যুগে বা আমাদের পূর্বযুগে প্রচলিত ছিল এবং যাহা এখনো প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থে পাওয়া যায়—কিন্তু যুগের পরিবর্তন অনুসারে যাহা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে এবং এখন আর যে পন্থার কেহ অনুসরণ করে না।

লক্ষ সঙ্গীত অর্থে ইহাই বুঝায়, যে সঙ্গীত বর্তমানে প্রচলিত। মতভেদের সৃষ্টি হয় এইখানেই। যাঁহারা প্রাচীন সঙ্গীত-গ্রন্থ-পন্থী তাঁহারা এখনো অনেক স্থলে প্রাচীন গ্রন্থ অনুসরণ করিয়া চলেন। অপরপক্ষে, আধুনিকতাবাদীগণ যুগোপযোগী পরিবর্তনকেই প্রাণের লক্ষণ বলিয়া বর্তমানে প্রচলিত নীতিকেই মানিয়া চলিয়াছেন।

ভাবী-সঙ্গীত অর্থে ইহাই বুঝায়, সঙ্গীতশাস্ত্র ভবিষ্যতে পরিবর্তিত হইয়া যে রূপ পরিগ্রহ করিবে। যেমন গ্রন্থসঙ্গীত পরিবর্তিত হইয়া বর্তমান 'লক্ষসঙ্গীত'-এর রূপ ধারণ করিয়াছে এবং দেশের অধিকাংশ লোকই তাহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তেমনি ভবিষ্যতেও সঙ্গীতের বর্তমান রূপ পরিবর্তিত হইয়া যাইবে এবং যুগের প্রয়োজন অনুসারে তাহাকেই দেশের অধিকাংশ লোক গ্রহণ করিবে। কোন্ ঋষি সেই পরিবর্তন সাধন করিবেন জানি না। তবে তাঁহার চরণধ্বনি শুনিতেছি বর্তমানের অভিনব সঙ্গীতের প্রতি চরণে।

সুর ও শ্রুতি

প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রমতে সুর তিন ভাগে বিভক্ত। (১) মন্দ্রস্থান বা উদারা সপ্তক (২) মধ্যস্থান বা মুদারা সপ্তক (৩) তারস্থান বা তারা সপ্তক। মন্দ্রস্থানকে আজকাল 'খজর-সপ্তক'ও বলে। মধ্যস্থানকে 'মধ্য সপ্তক' বা 'বিচকি সপ্তক'-ও বলে। 'তারস্থান'কে আজকাল 'দুনকি সপ্তক'-ও বলে। তারার সপ্তকই শেষ নয়, যন্ত্রসঙ্গীতে 'অতি-তারা' বা "অতি-উদার বা মন্দ্র" সপ্তকও পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু কণ্ঠসঙ্গীতে ইহার প্রয়োজন নাই বলিয়া এখানে ইহার উল্লেখ নিস্প্রয়োজন। বিজ্ঞানে তাহার প্রয়োজন থাকিতে পারে, সঙ্গীতে প্রয়োজন নাই।

প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রকারগণ প্রতি সপ্তক বা স্থানকে বাইশ্ ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন এবং তাহাদের নাম দিয়াছেন 'শ্রুতি' : অর্থাৎ এক সপ্তকের সাতটি সুরে সর্ব-সমেত বাইশটি শ্রুতি আছে। বৈজ্ঞানিক বলিবেন—এই শ্রুতি মাত্র বাইশটি হইবে কেন? শ্রুতি অনন্ত থাকিতে পারে, কিন্তু সঙ্গীতে উহার বেশি প্রয়োজন নাই বলিয়া

সঙ্গীতস্রষ্টাগণ তাহার বেশি গ্রহণ করেন নাই। প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থে শ্রুতির অর্থে ইহাই লেখা হইয়াছে যে, শ্রুতি সেই ধ্বনিকেই বলে, সঙ্গীতে যাহার প্রয়োজন হয় এবং অনায়াসে যে ধ্বনি বোধগম্য হয় বা চেনা যায়। কাজেই ধ্বনির কমবেশি শুনিয়া অনায়াস বোধগম্যের শর্তটি উত্থাপন করিলে বাইশের অধিক শ্রুতির কথা উত্থাপিত হইতে পারে না। যেমন, কোমল হইতে অতি কোমল বা তীব্র হইতে অতি তীব্র বা কোমলতম ও তীব্রতম বোঝা যায়—তাহার অধিক অনায়াস বোধগম্য হয় না। সুরের এই অনায়াসে চেনা যায় এমন কোমলতা বা তীব্রতার সূক্ষ্মভাগ লইয়াই আমাদের সঙ্গীতশাস্ত্রের শ্রুতি। ইহাকে অতিক্রম করিয়া গেলে তাহা শাস্ত্রসম্মত শ্রুতি হইবে না।

বাইশ শ্রুতির নাম :

(১) তীব্রা (২) কুমুদ্বতী (৩) মন্দা (৪) ছন্দোবতী (৫) দয়াবতী (৬) রঞ্জনী (৭) রক্তিকা (৮) রৌদ্রী (৯) ক্রোধী (১০) বজ্রিকা (১১) প্রসারিণী (১২) প্রীতি (১৩) মার্জনী (১৪) প্রীতি (১৫) রক্তকা (১৬) সন্দীপিনী (১৭) আলাপিনী (১৮) মদন্তী (১৯) রোহিনী (২০) রম্যা (২১) উগ্রা (২২) ক্ষোভিনী।

প্রাচীন সঙ্গীত-গ্রন্থের মতে উপরোক্ত শ্রুতিগণের মধ্যে চতুর্থ শ্রুতি 'ছন্দোবতী' ষড়জ। সপ্তম শ্রুতি 'রক্তিকা' রেখাব বা ঋষভ। নবম শ্রুতি 'ক্রোধী' গান্ধার। ত্রয়োদশ শ্রুতি 'মার্জনী' মধ্যম। সপ্তদশ শ্রুতি 'আলাপিনী' পঞ্চম। বিংশ শ্রুতি 'রম্যা' ধৈবত। দ্বাবিংশ শ্রুতি 'ক্ষোভিনী' নিষাদ বা নিখাদ। এই সপ্ত সুরের নাম লইয়া গাওয়াকে 'সরগম' করা বলে। 'সরগম' অর্থে সারেগামা। এই সাতটি সুরকেই প্রাচীন ও বর্তমান যুগে 'শুদ্ধ সুর' বলিয়া মানিয়াছেন। ইহার পরেই আরও পাঁচটি সুর প্রধান বলিয়া দুই যুগেই মানিয়াছেন—তাহাদিগকে 'বিকৃত সুর' বলে। সপ্তকের অন্তর্গত সেই পাঁচটি বিকৃত সুরের নাম : (১) বিকৃত কোমল রেখাব (২) বিকৃত বা কোমল গান্ধার (৩) বিকৃত বা কড়ি মধ্যম (৪) বিকৃত বা কোমল ধৈবত (৫) বিকৃত বা কোমল নিখাদ। রেখাব, গান্ধার, ধৈবত ও নিখাদ-এর বিকৃতির বেলায় তাহাদের নাম কোমল হইল, তাহার কারণ তাহারা ঐ নামের আসল সুর হইতে কমিয়া যায়—এই 'বিনয়ে'র জন্য তাহাদের নামকরণ হইল 'কোমল'। কিন্তু 'মধ্যম' না কমিয়া আরও খানিকটা চড়িয়া যায় বা উগ্র হইয়া উঠে—তাই তাহার নাম কড়ি মধ্যম বা তীব্র মধ্যম। কড়ি মধ্যমকে যদি আসল মধ্যম ধরা হইত, তাহা হইলে এখনকার শুদ্ধ মধ্যমই কোমল মধ্যম নামে অভিহিত হইত।

এই 'কোমল' 'তীব্র' বিশেষণের জন্য শুদ্ধ সুরগুলিও অনেক সময় 'তীব্র' নামে অভিহিত হয়। শুদ্ধ রেখাব বা গান্ধার বা নিখাদকে তীব্র রেখাব, তীব্র গান্ধার, তীব্র ধৈবত ও তীব্র নিখাদও বলে। তাই বলিয়া ষড়জ বা সা এবং পঞ্চম বা পা-কে শুদ্ধ ষড়জ বা শুদ্ধ পঞ্চম বলার প্রয়োজন করে না। করিলে অবশ্য দোষ নাই, কিন্তু অনাবশ্যক। ষড়জ আদি সুর। উহার কোনো বিশেষণ নাই—উহাকে শুদ্ধ ষড়জ বলিবারও প্রয়োজন নাই। যিনি আদি তিনি নির্গুণ, তিনি কোনো বিশেষণ বা সম্মানের অপেক্ষা রাখেন না। অন্য সুরগুলি ভক্তবৎসল, তাঁহাদের নিচে থাকিয়া যাহারা বিনয় বা ভক্তি প্রকাশ করিল,

তাহাদের জন্য নিজেরা 'তীব্র' বিশেষণ গ্রহণ করিয়া তাহাদের কোমল আখ্যায় বিভূষিত করিলেন। দর্প করিয়া মধ্যমকে অতিক্রম করিয়া যাওয়ায় বিকৃত মধ্যম কড়া মধ্যম নাম পাইল। ও বেচারা সুরলোকের ভৃগু। উহার উগ্রতার বদনামই উহার ভূষণ—উহাকে উর্ধ্বে স্থান দিল। ষড়জের আদি অন্তে এক রূপ, মধ্যেও তিনি পঞ্চম রূপে অচল হইয়া আছেন একটু রূপ বদল করিয়া। সুর-ব্রহ্মের আদি অন্ত ও মধ্য অর্থাৎ সা ও পা (ষড়জ ও পঞ্চম) তাই অচল। ইহাদের বিকৃত রূপ নাই। আদি যিনি, অন্ত যিনি, মধ্যে যিনি অচল শিব—তাঁহাদের বিকৃতি নাই। তাই সা-পা-র্সা অচল। ষড়জ ও পঞ্চমকে তাই সঙ্গীতশাস্ত্রে 'অচল সুর' বলে। তাঁহাদের স্থান ভ্রষ্ট হয় নাই—হইবেও না।

তাহা হইলে আসল সুরগুলির এই নাম হইল,—

(১) অচল বা ধ্রুব ষড়জ=সা (২) বিকৃত বা কোমল রেখাব = ঋা (৩) শুদ্ধ বা তীব্র রেখাব= রা (৪) বিকৃত বা কোমল গান্ধার=জ্ঞা (৫) শুদ্ধ বা তীব্র গান্ধার=গা (৬) শুদ্ধ মধ্যম=মা (এখানে শুদ্ধ বা তীব্র মধ্যম হইবে না, কেননা ইনি নিজেই কোমল—তপস্যাগুণে বিশ্বামিত্রের মতো ব্রাহ্মণ হইয়া বসিয়াছেন) (৭) কড়ি বা তীব্র মধ্যম=হ্মা (৮) অচল বা ধ্রুব পঞ্চম=পা (৯) বিকৃত বা কোমল ধৈবত=দা (১০) শুদ্ধ বা তীব্র ধৈবর্ত=ধা (১১) বিকৃত বা কোমল নিখাদ=ণা (১২) শুদ্ধ বা তীব্র নিখাদ=না। (অন্তে তারার ষড়জ= র্সা)।

সাধারণ সঙ্গীতজ্ঞ এই বারোটি সুরই চেনেন—আর, প্রকৃতপক্ষে ইহা লইয়াই সঙ্গীত। ইহার মধ্যে কোমল, অতি-কোমল, কোমলতম, তীব্র, তীব্রতর, তীব্রতম, কোমল-তীব্র, তীব্র কোমল প্রভৃতি শ্রুতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ওস্তাদ সারা ভারতবর্ষে দু'-চারজনের বেশি নাই—এবং এইসব মানিয়া চলেন, এমন ওস্তাদ তাহারও কম বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কারণ, লকশ-সঙ্গীতে তাহার প্রয়োজন নাই। প্রাচীনতম যে সব সঙ্গীতগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে 'রত্নাকর' অন্যতম। শ্রুতি সম্বন্ধে এই গ্রন্থে লিখিত আছে—[1]

অর্থাৎ ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চমে চারটি করিয়া শ্রুতি। নিখাদ ও গান্ধারে দুইটি করিয়া এবং রেখাব ও ধৈবতে তিনটি করিয়া শ্রুতি। বর্তমান সঙ্গীতাচার্যগণ সকলেই ইহা মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু ভীষণ মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে শ্রুতির বিভাগ লইয়া। 'গ্রন্থ-সঙ্গীত' ও 'লক্ষ-সঙ্গীত'-এ এই পার্থক্য কত বেশি তাহা দেখাইতেছি। 'গ্রন্থসঙ্গীত'-এর মতে চতুর্থ শ্রুতি বা 'ছন্দোবতী' শ্রুতিই হইতেছে ষড়জ। কিন্তু আধুনিক সঙ্গীতাচার্যগণের মতে বা 'লক্ষ-সঙ্গীত'-এর মতে, প্রথম শ্রুতি বা তীব্রই হইতেছে ষড়জ। প্রথম শ্রুতিকে ষড়জ ধরিয়া শ্রুতির এইভাবে ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়াছে 'লক্ষ-সঙ্গীত'। কাজেই 'গ্রন্থ'-সঙ্গীতের সঙ্গে ইহার অত্যধিক পার্থক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে এমন একটি গ্রন্থও পাওয়া যায় নাই যাহাতে প্রথম শ্রুতি হইতে ষড়জ-এর আরম্ভ বলিয়া উল্লেখিত আছে। সকল গ্রন্থেই স্পষ্ট লেখা আছে যে, শেষ শ্রুতি বা চতুর্থ

১ এখানে কবি 'রত্নাকর' গ্রন্থ থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দিতে চেয়েছিলেন। বেশ কিছুটা ফাঁকও আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি।

শ্রুতি হইতেই ষড়জের আরম্ভ। এইভাবে শ্রুতির ভাগ বাঁটোয়ারার পরিবর্তন হওয়ায় গ্রন্থ-সঙ্গীত ও লক্ষসঙ্গীত-এ আকাশ-পাতাল তফাৎ হইয়া গিয়াছে। নিচের ছবি হইতে বোঝা যাইবে—আগে শ্রুতির বিভাগ কিরূপ ছিল এবং এখনই বা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে।

গ্রন্থ-সঙ্গীতের শ্রুতি বিভাগ

(১)

লক্ষ সঙ্গীত বা বর্তমান প্রচলিত সঙ্গীতের শুদ্ধ সুর :—

গ্রন্থ-সঙ্গীতের শুদ্ধ সুর		শ্রুতি		লক্ষ সঙ্গীতের শুদ্ধ সুর
	১	তীব্রা	১	o ষড়জ
	২	কুমুদ্বতী	২	
	৩	মন্দা	৩	
ষড়্জ o	৪	ছন্দোবতী	৪	
	১	দয়াবতী	৫	o রেখাব (শুদ্ধ)
	২	রঞ্জনী	৬	
শুদ্ধ রেখাব o	৩	রক্তিকা	৭	
	১	রৌদ্রী	৮	o গান্ধার (শুদ্ধ)
শুদ্ধ গান্ধার o	২	ক্রোধী	৯	
	১	বজ্রিকা	১০	o মধ্যম (শুদ্ধ)
	২	প্রসারিণী	১১	
	৩	প্রীতি	১২	
শুদ্ধ মধ্যম o	৪	মার্জনী	১৩	
	১	ক্ষিতি	১৪	o পঞ্চম
	২	রক্তা	১৫	
	৩	সন্দীপনী	১৬	
পঞ্চম o	৪	আলাপিনী	১৭	
	১	মদন্তী	১৮	o ধৈবত (শুদ্ধ)
	২	রোহিণী	১৯	
শুদ্ধ ধৈবত o	৩	রম্যা	২০	
	১	উগ্রা	২১	o নিখাদ (শুদ্ধ)
নিখাদ o	২	ক্ষোভিনী	২২	
	১	তীব্রা	১	o ষড়জ (শুদ্ধ)
	২	কুমুদ্বতী	২	
	৩	মন্দা	৩	
ষড়্জ o	৪	ছন্দোবতী	৪	

এই ছবির বামধারে 'গ্রন্থ সঙ্গীত' মতে এবং ডান ধারে 'লক্ষ সঙ্গীত' মতে কোন শ্রুতি হইতে শুদ্ধ সুরের আরম্ভ তাহা দেখানো হইয়াছে। কাজেই 'আকাশ-পাতাল' তফাৎ যে অত্যুক্তি নয়, তাহা সহজেই ধরা পড়ে। শ্রুতি ও সুর সম্বন্ধে 'গ্রন্থ সঙ্গীত' ও 'লক্ষ সঙ্গীত'-এর মতভেদ নিম্নের চিত্রে আরো পরিষ্কার করিয়া দেখানো যাইতেছে।

(২)

গ্রন্থ-সঙ্গীতের শুদ্ধসুর					বর্তমানে প্রচলিত বা লক্ষ সঙ্গীতের শুদ্ধ সুর
	তীব্রা	১			
	কুমুদ্বতী	২			
	মন্দা	৩			
	ছন্দোবতী	৪	তীব্রা	১	
ষড়্জ ০					০ ষড়্জ
	দয়াবতী	১	কুমুদ্বতী	২	
	রঞ্জনী	২	মন্দা	৩	
	রক্তিকা	৩	ছন্দোবতী	৪	
শুদ্ধ রেখাব ০					০ শুদ্ধ রেখাব
	রৌদ্রী	১	দয়াবতী	১	
	ক্রোধী	২	রঞ্জনী	২	
শুদ্ধ গান্ধার ০					
	বজ্রিকা	১	রক্তিকা	৩	
	প্রসারিণী	২	রৌদ্রী	১	
					শুদ্ধ গান্ধার
	প্রীতি	৩	ক্রোধী	২	
	মার্জনী	৪	বজ্রিকা	১	
শুদ্ধ মধ্যম ০					০ শুদ্ধ মধ্যম
	প্রীতি	১	প্রসারিণী	২	
	রক্তা	২	প্রীতি	৩	
	সন্দীপিনী	৩	মার্জনী	৪	
	আলাপিনী	৪	প্রীতি	১	
পঞ্চম ০					০ পঞ্চম
	মদন্তী	১	রক্তা	২	
	রোহিণী	২	সন্দীপিনী	৩	

	রম্যা	৩	আলাপিনী	৪	
শুদ্ধ ধৈবত ০					
	উগ্রা	১	মদন্তী	১	
					০ শুদ্ধ ধৈবত
	ক্ষোভিনী	২	রোহিণী	২	
শুদ্ধ নিখাদ ০					
	তীব্রা	১	রম্যা	৩	
					০ শুদ্ধ নিখাদ
	কুমুদ্বতী	২	উগ্রা	১	
	মন্দা	৩	ক্ষোভিনী	২	
	ছন্দোবতী	৪	তীব্রা	১	
ষড়্জ ০					০ ষড়্জ
			কুমুদ্বতী	২	
			মন্দা	৩	
			ছন্দোবতী	৪	

এই চিত্রে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, বর্তমান রীতি অনুসারে প্রথম শ্রুতি অর্থাৎ 'তীব্রা'-তে ষড়্জ স্থাপিত করায় বর্তমানের ষড়্জ গ্রন্থ-সঙ্গীতের ষড়্জ হইতে অনেক বেশি বদলাইয়া গিয়াছে। গ্রন্থসঙ্গীত-এর রেখাব হইতে বর্তমানে রেখাব এক শ্রুতি নিচে নামিয়া গিয়াছে। গ্রন্থের শুদ্ধ গান্ধার আমাদের বর্তমান কোমল গান্ধার-এর মতো। মধ্যম ও পঞ্চম দুই মতেই এক শ্রুতিতে আছে, কিন্তু গ্রন্থের শুদ্ধ ধৈবত বর্তমানের শুদ্ধ ধৈবত হইতে এক শ্রুতি আগে। গ্রন্থের শুদ্ধ নিখাদ বর্তমান সঙ্গীতের কোমল নিখাদের মতো। এই পরিবর্তনের একমাত্র কারণ, আগে চতুর্থ বা শেষ শ্রুতি হইতে ষড়্জ আরম্ভ হইত, এখন প্রথম শ্রুতি হইতে ষড়্জ আরম্ভ হয়।

এখনকার সঙ্গীতাচার্যগণ লক্ষ-সঙ্গীতের মতেই চলেন। কাজেই আমাদিগকেও এই গ্রন্থে ঐ মতানুসারেই চলিতে হইবে। ইহা না করিলে বর্তমান সঙ্গীত-পদ্ধতিকে পরিপূর্ণরূপে ঢালিয়া সাজাইতে হয়, এবং তাহা অসম্ভব। 'ভাবীসঙ্গীত'-এ হয়তো ইহা বদলাইয়া যাইবে—কে বলিতে পারে!

মাদ্রাজ অঞ্চলে এক অদ্ভুত শুদ্ধ সুরাবলীর প্রচলন আছে। আমাদের কোমল রেখাব ওদেশে শুদ্ধ রেখাব বলিয়া পরিচিত। আমাদের শুদ্ধ রেখাব ওদেশের শুদ্ধ গান্ধার। এই প্রকারে আমাদের কোমল ধৈবত ওদেশে শুদ্ধ ধৈবত ও আমাদের শুদ্ধ ধৈবত ওদেশে শুদ্ধ নিখাদ। এই রীতি অনুসারেই ওদেশের সঙ্গীত আজো নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। আমাদের বর্তমান মতানুসারে এই মাদ্রাজী রীতিকে অদ্ভুত ও ভ্রমাত্মক বলিয়া আমরা হাসিতে পারি, কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থ-সঙ্গীতানুসারে তাঁহাদের মতই ঠিক—এবং আমাদের মতামত ভ্রমাত্মক। মাদ্রাজ অঞ্চলে বহু প্রচলিত অধিকাংশ শুদ্ধ সুর 'রত্নাকর' প্রভৃতি প্রাচীনতম

গ্রন্থ মতে মেলে, কিন্তু, আমাদের দেশে প্রচলিত ও শুদ্ধ সুর প্রাচীন কোনো গ্রন্থ মতেই মিলে না।

নিম্নে প্রাচীনতম সঙ্গীত-গ্রন্থ 'রত্নাকর' (সংস্কৃত)-এর শুদ্ধ ও বিকৃত সুরের সঙ্গে লক্ষ-সঙ্গীতের বা প্রচলিত সঙ্গীতের শুদ্ধ ও বিকৃত সুরের পার্থক্য দেখানো হইয়াছে। ইহার পরে অন্যান্য আরো কয়েকটি বিখ্যাত সংস্কৃত প্রাচীন সঙ্গীত-গ্রন্থের মতে শুদ্ধ ও বিকৃত সুরের সঙ্গে বর্তমান প্রচলিত শুদ্ধ ও বিকৃত সুরের পার্থক্য দেখানো হইবে। ইহা হইতে বোঝা যাইবে—ক্রমে ক্রমে সঙ্গীতের সুরে কত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। ইউরোপেও আমাদের মতো এক সপ্তকে বা গ্রামে বারোটা সুরের প্রচলন আছে—কড়ি কোমল লইয়া। তবে ওদেশে শ্রুতি আছে বলিয়া জানি না।

'রত্নাকর' যুগের এবং বর্তমান যুগের সুরের পার্থক্য

রত্নাকর'-এ

(৩)

বর্তমান প্রচলিত শুদ্ধ ও বিকৃত সুর	'রত্নাকর'-এ লিখিত শুদ্ধ ও বিকৃত সুর
শুদ্ধ ষড়্‌জ ০	০ শুদ্ধ বা অচ্যুত ষড়্‌জ
কোমল রেখাব ০	০ শুদ্ধ রেখাব বা বিকৃত ঋষভ
শুদ্ধ রেখাব ০	০ শুদ্ধ গান্ধার
কোমল গান্ধার ০	০ সাধারণ গান্ধার
শুদ্ধ গান্ধার ০	০ অন্তর গান্ধার
	০ শুদ্ধ মধ্যম বা চ্যুত মধ্যম
শুদ্ধ মধ্যম ০	০ বিকৃত পঞ্চম বা অচ্যুত মধ্যম
তীব্র মধ্যম ০	০ কৈশিক পঞ্চম
শুদ্ধ পঞ্চম ০	০ শুদ্ধ পঞ্চম
কোমল ধৈবত ০	০ বিকৃত ধৈবত বা শুদ্ধ ধৈবত
শুদ্ধ ধৈবত ০	০ শুদ্ধ নিখাদ
কোমল নিখাদ ০	০ কৈশীক নিখাদ
শুদ্ধ নিখাদ ০	০ কাকলি নিখাদ
	০ চ্যূত ষড়্‌জ
শুদ্ধ ষড়্‌জ ০	০ শুদ্ধ ষড়্‌জ বা অচ্যূত ষড়্‌জ

মনোযোগ দিয়া এই উপরের চিত্র দেখিলে দেখা যাইবে যে, বর্তমানের কোমল রেখাব 'রত্নাকর' যুগের রেখাব (চিত্রে লিখিত বিকৃত ঋষভ মানে তীব্র রেখাব) বর্তমানের শুদ্ধ রেখাব সে যুগে ছিল শুদ্ধ গান্ধার। কোমল ও শুদ্ধ ধৈবতেরও এই অবস্থা। আমাদের এখনকার কোমল ধৈবত তখন ছিল শুদ্ধ ধৈবত। আমাদের এখনকার শুদ্ধ ধৈবত তখন ছিল শুদ্ধ নিখাদ। রত্নাকর-এ আবার শুদ্ধ মধ্যমের পরে আর এক মধ্যমের কথা আছে—যাহার নাম অচ্যুত মধ্যম—ইহা হয়তো সে যুগের কড়ি মধ্যম ছিল। তাহা যদি হয় তবে কৈশিক পঞ্চম কি বস্তু? ইহাই যদি সে যুগের কড়ি মধ্যম হয়—তাহা হইলে অচ্যুত-মধ্যম বলিয়া যে সুর সে যুগে ছিল, এ যুগে তাহা নাই। আমরা তীব্র মধ্যমকে বিকৃত পঞ্চম বলিলেও বলিতে পারি, কিন্তু কৈশিক পঞ্চম বলিয়া কোনো কিছু নাই আমাদের যুগে। রত্নাকরের যুগেও কোমল তীব্র ছিল—তবে তাহাদের নাম ছিল বোধ হয় চ্যুত ও অচ্যুত।

রত্নাকরী যুগে কড়ি কোমল সুর ছাড়া শ্রুতির সুরও প্রচলিত ছিল ইহা স্পষ্ট বোঝা যায়। কারণ, দুই প্রকার ষড়জ, তিন প্রকার গান্ধার ও নিখাদের কথা এবং দুই তিন প্রকারের মধ্যম পঞ্চমের কথাও উল্লিখিত আছে। এ যুগে বহু গবেষণার পর সপ্তককে প্রধান বারো ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—ইহা অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। আজকাল যন্ত্র-সঙ্গীত ছাড়া কণ্ঠ-সঙ্গীতে শ্রুতি স্পষ্ট করিয়া দেখাইতে পারেন এরূপ গুণী খুব বেশি নাই ভারতবর্ষে। বর্তমান প্রচলিত রাগ-রাগিণীতেও কড়ি কোমল সুর ছাড়া শ্রুতি ব্যবহার করার সম্বন্ধে কোনো নিয়ম নাই। কারণ, আমরা যখন গ্রন্থ-লিখিত বহু রাগ-রাগিণীর পরিবর্তন সাধন করিয়া বর্তমানোপযোগী করিয়া লইয়াছি এবং গ্রন্থোক্ত বহুরূপ রাগিণীও বাতিল করিয়া দিয়াছি—তখন গ্রন্থোক্ত সুর ও শ্রুতি মানিয়া চলিবারই বা প্রয়োজন কি—লক্ষ-সঙ্গীতের এই যুক্তি অসমীচীন বলিয়া মনে হয়। 'ভাবী-সঙ্গীত'-এ হয়তো আমাদেরও এই মত বাতিল হইয়া যাইবে—কিন্তু দুঃখ করিবার কিছু নাই। ইহাই যুগধর্ম—জীবনের ধর্ম।

সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থের মতে শুদ্ধ ও বিকৃত সুরের নক্সা নিচে দেওয়া গেল। তাহার পার্শ্বে বর্তমানে প্রচলিত শুদ্ধ ও বিকৃত সুরের রূপেরও আভাস দেওয়া গেল। ইহা হইতে বোঝা যাইবে—এই পরিবর্তন কিরূপে একটু একটু করিয়া সাধিত হইয়াছে। নিচে 'রাগ-বিরোধ' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের শুদ্ধ বিকৃত সুরের নক্সা দিলাম। গোঁড়াদলের অনেকে এখনো এই গ্রন্থের মত মানিয়া চলিতে চাহেন—কিন্তু তাহা ভ্রমাত্মক। ভ্রমাত্মক এই জন্য যে, আজকাল এমন কোনো রাগ-রাগিণী নাই যাহা শ্রুতি অনুসরণ করিয়া চলে। মীড় ও সুরের কাজের সময় অবশ্য শ্রুতি স্পর্শ করিয়া যায়—কিন্তু বর্তমান সঙ্গীত জগতে এমন কোনো গ্রন্থ নাই যাহাতে রাগ-রাগিণীর শ্রুতি মানিয়া চলার নির্দেশ লিখিত হইয়াছে। শ্রুতি অনুসারে বাঁধা হইয়াছে এমন কোনো রাগ-রাগিণী কি এ যুগে প্রচলিত আছে?

আজকাল দু'একজন গুণী বা গায়ক শ্রুতির রেখাব গান্ধার বা ধৈবত ইত্যাদি ব্যবহার করেন রাগ-রাগিণীতে—কিন্তু 'লক্ষ-সঙ্গীত' মতে ইহা ভুল। কারণ এ যুগে শ্রুতিতে বাঁধা কোনো রাগ-রাগিণী নাই, ইহা লক্ষ-সঙ্গীতের স্পষ্ট নির্দেশ। লক্ষ-সঙ্গীত বা বর্তমান

যুগ-প্রচলিত সঙ্গীত-শাস্ত্রের ইহাই স্পষ্ট নির্দেশ যে, 'মাত্র বারো সুর অর্থাৎ সাতটি শুদ্ধ ও পাঁচটি বিকৃত সুর লইয়াই এ যুগের সঙ্গীতের সৃষ্টি, ইহাকে অতিক্রম করিয়া রাগ-রাগিণীতে শ্রুতির কোনো প্রয়োজন নাই।' কেবল মীড় ও সুরে যেটুকু শ্রুতি আপনা হইতে আসে—তা ছাড়া কষ্ট করিয়া বা জিমন্যাস্টিক করিয়া শ্রুতি নির্গমের কোনো প্রয়োজন নাই। যাঁহারা বাহাদুরি দেখাইবার জন্য এসব করেন তাঁহারা করিতে পারেন—কিন্তু ইহা প্রয়োজনের অতিরিক্ত।

যাক, 'রাগ বিরোধ' গ্রন্থের সঙ্গে বর্তমান প্রচলিত শুদ্ধ বিকৃত সুরের পার্থক্য দেখানো হইল নিচের নক্সায়।

নিম্নে 'কলানিধি' নামক আর এক প্রাচীন সঙ্গীত-গ্রন্থের সহিত বর্তমান যুগের শুদ্ধ ও বিকৃত সুরের পার্থক্য দেখানো হইল :

'সারামৃত' গ্রন্থে লিখিত শুদ্ধ ও বিকৃত সুরের সঙ্গে বর্তমানে প্রচলিত সুরের পার্থক্য নিম্নে দেখানো যাইতেছে :

'সঙ্গীত পারিজাত' গ্রন্থ প্রাচীন সঙ্গীত-গ্রন্থের মধ্যে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ; ইহার শুদ্ধ ও বিকৃত সুরের নক্সা নিচে দেওয়া গেল।

বর্তমান প্রচলিত শুদ্ধ ও বিকৃত সুর
(৭)
'পারিজাত' লিখিত শুদ্ধ ও বিকৃত সুর
শুদ্ধ ষড়জ o
o শুদ্ধ ষড়জ
o পূর্ব ঋষভ
কোমল রেখাব o
o কোমল রেখাব
তীব্র বা শুদ্ধ রেখাব o
o পূর্ব গান্ধার—শুদ্ধ রেখাব
o কোমল গান্ধার—তীব্র রেখাব
কোমল গান্ধার o
o তীব্রতর রেখাব ও শুদ্ধ গান্ধার
তীব্র ও শুদ্ধ গান্ধার o
o তীব্র গান্ধার
o তীব্রতর গান্ধার
o তীব্রতম গান্ধার
শুদ্ধ মধ্যম o
o অতি তীব্রতম গান্ধার—শুদ্ধ মধ্যম
o তীব্র মধ্যম
তীব্র মধ্যম o
o তীব্রতর মধ্যম
o তীব্রতম মধ্যম
শুদ্ধ পঞ্চম o
o শুদ্ধ পঞ্চম
o পূর্ব ধৈবত
কোমল ধৈবত o
o কোমল ধৈবত
শুদ্ধ ধৈবত o
o পূর্ব নিখাদ—শুদ্ধ ধৈবত
o তীব্র ধৈবত—কোমল নিখাদ
কোমল নিখাদ o
o তীব্রতর ধৈবত—শুদ্ধ নিখাদ
তীব্র নিখাদ o
o তীব্র নিখাদ
o তীব্রতর নিখাদ
o তীব্রতম নিখাদ
শুদ্ধ ষড়জ o
o শুদ্ধ ষড়জ

এই নক্সাগুলি দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায়, সমস্ত গ্রন্থকারই বিনা দ্বিধায় ও আপত্তিতে বাইশ শ্রুতি মানিয়া লইয়াছেন, কিন্তু শুদ্ধ সুরসকলকে শ্রুতিতে স্থাপিত করিতে গিয়া কেহ কাহারো সহিত একমত হন নাই। একজন এক সুর যে শ্রুতিতে বলিয়াছেন, অন্য গ্রন্থকার সেই সুর অন্য শ্রুতিতে বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন। কিন্তু ষড়জ বা 'সা' সম্বন্ধে সকলে একমত অর্থাৎ সকলেই চতুর্থ শ্রুতি বা ছন্দোবতীতে ষড়জ বলিতেছেন। 'গ্রন্থ সঙ্গীত' ও 'লকস্ সঙ্গীত'-এ ইহাই অত্যধিক পার্থক্য। 'সঙ্গীত-পারিজাত' বোধ হয় ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে নবীনতম, কারণ উহার সুরের সঙ্গে আমাদের বর্তমান প্রচলিত অনেক সুরের সঙ্গে খেলে। ইহাও হইতে পারে যুগধর্ম অনুসারে এইরূপ পরিবর্তন হইতে হইতে সুরে বর্তমান রূপ—যাহা এখন আকাশ-পাতাল তফাৎ বলিয়া মনে হয়—পরিগ্রহ করিয়াছে। যে যে নক্সায় গ্রন্থের শুদ্ধ সুর ও বর্তমানের শুদ্ধ সুর একস্থানে লিখিয়া দেখানো হইয়াছে তাহা ভালো করিয়া দেখুন—তাহা হইলে দেখিবেন গ্রন্থের ষড়জ ও আজকালকার ষড়জ একস্থান হইতে আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু গ্রন্থের মতানুসারে এই ষড়জের স্থান চতুর্থ শ্রুতি অর্থাৎ ছন্দোবতী। অর্থাৎ এই ষড়জের স্বর বা সুর ছন্দোবতী শ্রুতির সুরের ন্যায়। কিন্তু এই সুরকে আমরা এখনো প্রথম শ্রুতির সুর বলিয়া মানি। কেননা, আমাদের এই যুগের ষড়জ প্রথম শ্রুতি হইতে আরম্ভ। (২ নং নক্সা দেখুন) অতএব, গ্রন্থের চতুর্থ শ্রুতি 'ছন্দোবতী'—আমাদের এখনকার প্রথম শ্রুতি 'তীব্রা' এবং গ্রন্থের পঞ্চম শ্রুতি 'দয়াবতী' যাহা ও-যুগে ছিল রেখাবের শ্রুতি—উহাকে আমরা ষড়জের দ্বিতীয় শ্রুতি 'কুমুদ্বতী' বলিয়া মানিতেছি। গ্রন্থের 'রঞ্জনী' শ্রুতি আমাদের এখনকার 'মন্দা' শ্রুতি। গ্রন্থের 'রক্তিকা' শ্রুতি আমাদের এখানকার 'ছন্দোবতী' ইত্যাদি।

এইরূপ অন্যান্য বহু গ্রন্থে সেই যুগে প্রচলিত শুদ্ধ ও বিকৃত সুরের পরিচয় লিখিত আছে, কিন্তু ষড়জের বেলায় সকলেই একমত। 'রাগবিরোধ' ব্যতীত অন্য কোনো গ্রন্থে শ্রুতিতে বাঁধা রাগ-রাগিণীর উল্লেখ নাই। 'রাগবিরোধ'-এ বহু রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে—যাহা শ্রুতির সূক্ষ্ম সূত্রে বাঁধা—কিন্তু পরবর্তী যুগে তাহা বাতিল হইয়া গিয়াছে। এখনো যাঁহারা রাগ-রাগিণীতে শ্রুতির কথা বলিয়া থাকেন তাঁহারা এই 'রাগবিরোধ' পন্থী।

এই শ্রুতির সাহায্য লইয়াই সঙ্গীতাচার্যগণ শুদ্ধ ও বিকৃত দ্বাদশটি সুর লইয়া পরবর্তী সঙ্গীতের সৃষ্টি করিয়াছেন। 'রত্নাকর'-এ লিখিত আছে যে, 'এক সপ্তকে বাইশটি শ্রুতি আছে এবং ষড়জ রেখাব গান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত নিখাদ এই শ্রুতি হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে।' শ্রুতি ও শুদ্ধ সুরের কথা ইহার বেশি লিখিবার প্রয়োজন নাই। এই যুগের সঙ্গীত-শিক্ষার্থীগণের শুদ্ধ ও বিকৃত বারোটি স্বর ব্যতীত শ্রুতি লইয়া মাথা ঘামাইবার কোনো প্রয়োজন নাই। কেননা, এই যুগের সঙ্গীতে কোথাও শ্রুতির প্রয়োজন হয় না—মীড় ও স্বরের কাজ ব্যতীত।

আরোহী-অবরোহী

সা রে গা মা পা ধা নি পরিপূর্ণ সপ্তকে এই সাতটি সুর থাকে।

অসমাপ্ত

খাম্বাজ ঠাট বা কানভোজী মেল

সুর : সা রা গা মা পা ধা ণা র্সা

ক্রমিক সংখ্যা	রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
১.	ঝিঝোটি	ধা় সা--রা মা গা-- মা পা ধা না র্সা	র্স ণা ধা পা মা গা রা সা	গান্ধার	ধৈবত	সম্পূর্ণ	সকল সময়	আরোহীতে তীব্র নিখাদের কৃর্ণ লাগে। পশ্চিম অঞ্চলের অত্যন্ত প্রিয় রাগিণী। ঠুমরীতে অত্যন্ত বেশি ব্যবহৃত হয়।
২.	খাম্বাজ	সা গা মা পা--ণা ধা না র্সা	র্সা ণা ধা--পা মা গা-- রা সা	গান্ধার	নিখাদ	খাড়ব সম্পূর্ণ	রাত্রি দ্বিহর	আরোহীতে রেখাব বর্জিত মধ্যম ও ধৈবতের সঙ্গত অত্যন্ত মধুর শোনা যায়। দুই নিখাদ লাগে।
৩.	তিলং	সা গা মা পা না র্সা	র্সা ণা পা মা গা সা	গান্ধার	নিখাদ	ওড়ব	রাত্রি দ্বিপ্রহর	রেখাব ও ধৈবত বর্জিত। কোমল নিখাদ হইতে পঞ্চমে মীড় মধুর শোনা যায়। দুই নিখাদ লাগে।
৪.	খাম্বাবতী	সা রা মা পা--ধা-- পা না র্সা	র্সা ণা ধা পা--ধা মা-- গা মা সা	ষড়জ বা গান্ধার	পঞ্চম বা নিখাদ	বক্র সম্পূণ	রাত্রি দ্বিপ্রহর	এই রাগিণীতে খাম্বাজ ও ঝাড় রাগিণী মিশ্রিত বলিয়া মনে হয়। গা মা সা উহার বিশেষ তান। কম গাওয়া হয়।
৫.	দুর্গা	সা গা মা ধা না র্সা	র্সা ণা ধা মা গা সা	গান্ধার	নিখাদ	ওড়ব	রাত্রি দ্বিপ্রহর	রেখাব ও পঞ্চম বর্জিত। উত্তরবঙ্গে বাগেশ্রীর ছায়া আসে। কিন্তু বাগেশ্রীর গান্ধার কোমল। কম গাওয়া হয়। দুই নিখাদ লাগে।

ক্রমিক সংখ্যা	রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
৬.	রাগেশ্রী	সা রা সা--গা মা ধা--না র্সা	সা ণা ধা মা গা--রা সা	ষড়জ বা মধ্যম	পঞ্চম বা ষড়জ	খাড়ব	রাত্রি দ্বিপ্রহর	বাগেশ্রীর সঙ্গে খানিক মিল আছে। বাগেশ্রীর গান্ধার কোমল, রাগেশ্রীর গান্ধার তীব্র। পঞ্চম ইহাতে বর্জ্জিত। দুই নিখাদ লাগে।
৭	সুরঠ	সা রা মা পা না র্সা	র্সা ণা ধা পা মা রা সা	রেখাব	ধৈবত	ওড়ব খাড়ব	রাত্রি দ্বিপ্রহর	মধ্যম হইতে রেখাব পর্যন্ত মীড় এই রাগিণীর বিশিষ্ট তান। দুই নিখাদ লাগে।
৮.	দেশ	সা রা মা পা--ণা ধা--পা না র্সা	র্সা ণা ধা পা--মা গা রা সা	রেখাব	নিখাদ	ওড়ব সম্পূর্ণ	রাত্রি দ্বিপ্রহর	আরোহীতে গান্ধার বর্জ্জিত। দুই নিখাদ লাগে।
৯.	তিলক কামোদ	পা় না় সা রা গা সা--রা মা পা না র্সা	র্সা ণা ধা--পা মা রা--গা সা	ষড়জ	পঞ্চম	খাড়ব সম্পূর্ণ	রাত্রি দ্বিপ্রহর	খাদের নিখাদ ইহার প্রধান মাধুর্য। আরোহীতে রেখাব লাগাইলে বক্র করিয়া লাগাইতে হয়। দুই নিখাদ লাগে। অনেক অঞ্চলে কেবল তীব্র নিখাদ লাগায়।
১০.	জয়জয়ন্তী	সা--রা--রা গা--রা সা--ণা় ধা় পা়	র্সা ণা ধা--পা মা রা--জ্ঞা রা না় সা	রেখাব	ধৈবত	সম্পূর্ণ	রাত্রি দ্বিপ্রহর	দুই গান্ধার ও দুই নিখাদ লাগে। খাদের পঞ্চম হইতে সুদারার রেখাব পর্যন্ত মীড় ইহার প্রধান মাধুর্য।
১১.	নটমল্লার	সা রা গা মা--রা পা--মা পা ধা ণা--র্সা	র্সা ণা ধা পা--মা--গা মা রা সা	মধ্যম	ষড়জ	সম্পূর্ণ	বর্ষা	

ক্রমিক সংখ্যা	রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
১২	গারা	ম্‌া প্‌া ধ্‌া ন্‌ সা রা জ্ঞা রা গা মা পা ধা না র্সা	র্সা গা ধা গা পা মা গ্‌া রা--সা ন্‌া সা	ষড়জ	পঞ্চম	সম্পূর্ণ	রাত্রি দ্বিপ্রহর	দুই গান্ধার ও দুই নিখাদ লাগে। কতকটা জয়জয়ন্তীর আত্মীয়া। দুই গান্ধার সাবধানে ব্যবহার করিতে হয়।
১৩.	নারায়ণী	সা রা মা পা ধা র্সা	র্সা ণা ধা পা ম্না রা সা	ষড়জ বা পঞ্চম রেখাব	পঞ্চম বা ষড়জ	ওড়ব খাড়ব	সকল সময়	
১৪.	প্রতাপ-বরালী	সা রা মা--পা ধা র্সা	র্সা ধা পা মা গা রা সা	রেখাব	ধৈবত	ওড়ব	সকল সময়	মাদ্রাজ অঞ্চলে ইহা মামুলী রাগিণী। এ দেশে প্রচলিত নাই।
১৫.	নাগেশ্বরবলী	সা গা মা পা ধা র্সা	র্সা ধা পা মা গা সা	ষড়জ বা মধ্যম	পঞ্চম বা ষড়জ	ওড়ব	সকল সময়	ইহাও অপ্রচলিত রাগিণী।
১৬.	গৌড় মল্লার	সা রা মা পা--মা পা ধা র্সা	র্সা না ধা পা--মা গা মা রা সা	মধ্যম	ষড়জ	বক্র সম্পূর্ণ	বর্ষা	কোমল নিখাদের কণ্‌ দেওয়া হয়। রা জ্ঞা রা মা জ্ঞা--এই রাগিণীর প্রধান তাল।
১৭	বড় হংস	সা রা মা পা ধা ণা পা--না র্সা	র্সা ণা পা--ধা পা-- সা রা সা	পঞ্চম	রেখাব	খাড়ব	দিবা দ্বিপ্রহর	পাঞ্জাব অঞ্চলে ইহার প্রচলন আছে। অন্য দেশে বিশেষ শোনা যায় না।

পাণ্ডুলিপির প্রথমে 'শোভাবতী' শব্দটি লেখা আছে—কোন বিস্তারিত ব্যাখ্যা নেই।

খাম্বাজ-ঠাট

প্রাচীন সঙ্গীত-গ্রন্থে খাম্বাজ ঠাটের নাম 'কাম-ভোজী' মেল। 'কাম-ভোজ'—এরই অপভ্রংশ খাম্বাজ। ইহার আসল সুর ষড়জ, শুদ্ধ অর্থাৎ তীব্র রেখাব, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, শুদ্ধ বা তীব্র ধৈবত ও কোমল নিখাদ। তবে, আজকাল কোনো কোনো রাগিণীতে তীব্র নিখাদও লাগে। ইহাকে এখন খাম্বাজ ঠাট বলে। বেলাবল ঠাটে যেমন কোমল নিখাদ আজকাল প্রচলিত হইয়াছে, তেমনি খাম্বাজ ঠাটেও তীব্র নিখাদ ব্যবহার—অতি আধুনিক না হইলেও কিছুদিন হইতে ব্যবহৃত হইতেছে।

খাম্বাজ ঠাট সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কতকগুলি বিষয় গায়কদের সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।

খাম্বাজ ঠাটের অন্তর্ভুক্ত যে সব রাগরাগিণী, তাহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম—যাহাদের বাদী সুর গান্ধার ; দ্বিতীয়—যাহাদের বাদী সুর রেখাব। *সুরজ্ঞজনের ইহা বিশেষ ভাবে জানা আছে বলিয়া এই ঠাটের রাগরাগিণী গাহিবার সময় কোনো গোলমাল হয় না—বা এক রাগিণীর সহিত অন্য রাগিণীর জট পাকাইয়া যায় না। যে সব রাগরাগিণী খাম্বাজ-অঙ্গের, তাহাদের বাদী সুর গান্ধার এবং যে সব রাগরাগিণী সুরট-অঙ্গের তাহাদের বাদী সুর রেখাব—ইহা গায়কগণের বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা উচিত।

খাম্বাজ, বাগেশ্রী, দুর্গা, খাম্বাবতী, তিলং ইত্যাদি রাগিণী খাম্বাজ অঙ্গের, এবং ইহাদের বাদী সুর গান্ধার।

সুরঠ, দেশ, জয়জয়ন্তী প্রভৃতি রাগিণী সুরঠ-অঙ্গের এবং ইহাদের বাদী সুর রেখাব।

জয়জয়ন্তীর বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে দুই গান্ধার বিশেষ করিয়া কোমল গান্ধারের আবেশ আসিয়া জানাইয়া দেয় যে, কানাড়া গাহিবার সময় হইয়া আসিল। জয়-জয়ন্তী কানাড়া-অঙ্গের রাগরাগিণীদলের অগ্রদূতী।

দুই বা তিন রাগরাগিণীর মিশ্রণে যে রাগ বা রাগিণীর উৎপত্তি হয়, উহাকে মিশ্র রাগ বা রাগিণী বলে। মিশ্ররাগ গাহিবার সময় প্রচলিত রীতি বা 'রেওয়াজ'কে মানিয়া চলাই উচিত। ভাবভট্ট পণ্ডিত তাঁহার সঙ্গীত-গ্রন্থে বহু মিশ্র রাগরাগিণীর নাম দিয়াছেন, কিন্তু ঐ সব রাগরাগিণীর লক্ষণ কি, বা কোন কোন সুর লাগে ইত্যাদি কিছুই বলেন নাই। কাজেই মনে হয় ঐ সব রাগরাগিণী হয় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে কিম্বা কোনো কোনো 'খান্দানী' ঘরে বন্দী হইয়া আছে। 'খান্দানী' ঘরের উদার প্রকৃতির কেহ যদি স্বেচ্ছায় ঐ সব রাগরাগিণীকে মুক্তি দেন, তবেই তাহাদের রূপ সম্বন্ধে আমরা কিছু জানিতে পারিব। আজকাল গায়ক ও গুণীগণ কল্যাণ, বেলাবল, নট, সারাং, বাহার, শ্রী, মল্লার, কানাড়া ও টোড়ির বিভিন্ন শ্রেণীর উল্লেখ করেন এবং গাহিয়াও থাকেন—এ সম্বন্ধে অসংখ্য মতভেদও দেখা যায়। কাজেই এই সব ব্যাপারে 'চলতি রেওয়াজ' মানিয়া চলাই সমীচীন মনে করি।

---

* এখানে সম্ভবত. কবি কিছু নোট দিতে চেয়েছিলেন।

কল্যাণ ঠাট

সুর : সা রা গা মা পা ধা ণা র্সা

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
১.	ইমন	সা রা গা হ্মা পা ধা না র্সা	র্সা না ধা পা হ্মা গা রা সা	গান্ধার	নিখাদ	সম্পূর্ণ ওড়ব	প্রথম সন্ধ্যা	মাধুর্য্যের জন্য এই রাগিণীর অবরোহণে গান্ধারের সাথে শুদ্ধ মাধ্যমের কৃণ্ দেওয়া হয়, কিন্তু ইহা বিবাদী সুর বলিয়া সাবধানে লাগানো উচিত। অনেকে শুদ্ধ মধ্যম দিয়া ইহাকে ইমন-কল্যাণ নাম দিয়া থাকেন। কিন্তু ইমনেও শুদ্ধ মধ্যম নাই, কল্যাণেও নাই। ইহার গতি অত্যন্ত সবল বলিয়া আলাপের জন্য অত্যন্ত উপযোগী রাগিণী।
২.	শুদ্ধ কল্যাণ	সা রা গা পা ধা র্সা	র্সা না ধা পা হ্মা গা রা সা	গান্ধার বা রেখাব	ধৈবত বা পঞ্চম	সম্পূর্ণ	প্রথম সন্ধ্যা	আরোহীতে মধ্যম ও নিখাদ লাগে না। আরোহী ভূপালীর মত। অবরোহণের কড়ি মধ্যম ও নিখাদ দুর্বল হওয়ার দরুণ ইহা অনেকটা ভূপালীর মত শোনায়। সত্যকার গুণীর মুখে অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম হয়। ইহা কম গাওয়া হয়।
৩.	ভূপালি	সা রা গা পা ধা র্সা	র্সা ধা পা গা রা সা	গান্ধার	ধৈবত	ওড়ব	প্রথম সন্ধ্যা	অত্যন্ত প্রচলিত রাগিণী। ধৈবত বাদী করিলে 'দেশকার' হইয়া যাইবে।

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
৪.	চন্দ্রকান্ত	সা রা গা পা ধা না র্সা	র্সা না ধা পা ক্ষা গা রা সা	গান্ধার	ধৈবত	খাড়ব সম্পূর্ণ	প্রথম সন্ধ্যা	উদারা ও মুদারা গ্রামে ইহা বেশি গাওয়া হয়। অনেকটা শুদ্ধ কল্যাণের মত। শুদ্ধ কল্যাণে নিখাদ ও মধ্যম প্রবল নয়, ইহাতে এই দুই সুর প্রবল করিলে কোনো হানি হয় না।
৫.	হিণ্ডোল	সা গা ক্ষা ধা না ধা র্সা	র্সা না ধা ক্ষা গা সা	ধৈবত	গান্ধার	ওড়ব	প্রথম প্রহর (দিবা)	আরোহীর নিখাদ দুর্বল। অনেকে আরোহীতে নিখাদ দেন না। গান্ধার হইতে ষড়জ পর্যন্ত মীড় মধুর শোনায়। উত্তর-অঙ্গ করিয়া গাওয়া উচিত অর্থাৎ চড়ার দিকে বেশি গাওয়া উচিত। কেহ কেহ বলেন, গান্ধার বাদী।
৬.	মালবশ্রী	সা গা ক্ষা পা না র্সা	র্সা না পা ক্ষা গা সা	পঞ্চম	ষড়জ	ওড়ব	দিবা তৃতীয় প্রহর	মধ্যম ও নিখাদ দুর্বল। কণ স্বরূপ এই দুই সুর লাগানো উচিত। ষড়জ গান্ধার ও পঞ্চম এই তিনটি সুরই ইহাতে প্রবল। অনেকে এই তিন সুরেই গান। কিন্তু ইহা ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্র বিরুদ্ধ। পাঁচ সুরের কম সুর যে রাগিণীতে তাহা ভারতীয় নহে ইহাই[১] পণ্ডিতের মত।
৭	হাম্বীর	সা রা সা--গা মা ধা--না ধা র্সা	র্সা না ধা মা--ক্ষা পা ধা মা--গা মা রা সা	পঞ্চম বা ধৈবত	ষড়জ বা রেখাব	বক্র সম্পূর্ণ	রাত্রির প্রথম প্রহর	আরোহীর নিখাদ দুর্বল। অবরোহীর গান্ধারও দুর্বল। ইহার রূপ বক্র। অর্থাৎ ইহার আরোহী অবরোহী সরল নয়। অতিপরিচিত রাগিণী।

১. মালবশ্রী রাগের মন্তব্যের শেষে 'ইহাই' শব্দের পর একটি শব্দের পাঠোদ্ধার করা গেল না।

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
৮.	কেদারা	সা মা--মা পা--পা ধা পা--না ধা র্সা	র্সা না ধা পা হ্মা পা-- ধা পা--মা রা সা	মধ্যম	ষড়্জ	ওড়ব সম্পূর্ণ	রাত্রির প্রথম প্রহর	ইহার গান্ধার দুর্বল বা গুপ্ত। আরোহীতে রেখাব একেবারে লাগিবে না।
৯.	কামোদ	সা রা পা--হ্মা পা-- ধা পা--ধা সা	র্সা না ধা পা--গা মা পা--গা মা রা সা	পঞ্চম	রেখাব বা ষড়্জ	বক্র সম্পূর্ণ	রাত্রির প্রথম প্রহর	আরোহীর নিখাদ দুর্বল। অবরোহীর গান্ধারও দুর্বল। কামোদ ছায়ানটের সঙ্গে মিলিয়া যাইবার খুব সম্ভাবনা। বাদী সম্বাদী বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া গাহিতে হয়।
১০.	ছায়ানট	স--রা গা মা পা-- ধা না ধা র্সা	র্সা না ধা পা--হ্মা পা--রা গা-মা পা-- মা গা মা রা সা	রেখাব বা পঞ্চম	ধৈবত বা ষড়্জ	বক্র সম্পূর্ণ	রাত্রির প্রথম প্রহর	পঞ্চম হইতে রেখাবে মীড় ছায়ানটের রূপকে পরিস্ফুট করিয়া তুলে। কামোদের তান ঃ সা রা পা পা--গা মা ধা পা-- গা সা পা গা মা রা সা। ছায়ানটের তান ঃ ধা পা রা--রা গা পা মা পা গা মা রা সা।
১১.	শ্যাম	না সা--রা--মা রা-- হ্মা পা--ধা পা--না সা	র্সা না ধা পা-- হ্মা পা--মা গা রা না সা	ষড়্জ	পঞ্চম	সম্পূর্ণ	রাত্রির প্রথম প্রহর	অনেকটা কামোদের সঙ্গে মিলে। নিখাদ পরিস্কার দেখাইতে হয়। তাহাতেই কামোদ হইতে বাঁচে। আরোহীতে গান্ধার নাই। কম গাওয়া হয়।
১২.	গৌড় সারং	সা রা সা--গা রা মা গা পা হ্মা--ধা পা না ধা র্সা	র্সা ধা--না পা--বা হ্মা--পা গা সা রা-- পা রা সা	ধৈবত বা গান্ধার	রেখাব বা নিখাদ	ষাড়ব সম্পূর্ণ	দিবা দ্বিপ্রহর	অত্যন্ত বক্র স্বরূপ। 'গা রা সা গা' তানেই ইহার রূপ পরিস্ফুট হইয়া ওঠে।

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
১৩.	ইমনী বেলাবল্	সা রা গা মা গা--হ্মা পা--ধা না ধা র্সা	র্সা না ধা--পা মা গা মা রা সা	ষড়জ বা পঞ্চম	পঞ্চম বা ষড়জ	খাড়ব সম্পূর্ণ	সকাল	ইহা বেলাবলের রকম-ফের রূপ। কেবল আরোহীতে তীব্র মধ্যম লাগে। ইহাতেই ইমনের রূপ ফুটিয়া ওঠে। অবরোহীতে বেলাবলের রূপ ফুটিয়া ওঠে। ইহাকে দনের কল্যাণও বলে। আরোহীতে নিখাদ লাগে। প্রায় অপ্রচলিত।
১৪.	শাওণী কল্যাণ	সা ন্া ধ্া ন্া ধ্া প্া-- সা রা সা--গা পা ধা র্সা	র্সা না ধা--না ধা পা-- গা রা সা ধ্া	ষড়জ বা পঞ্চম	পঞ্চম বা ষড়জ	খাড়ব	রাত্রি প্রথম প্রহর	শুদ্ধ কল্যাণের মত অনেকটা। আরোহী ও অবরোহীতে মধ্যম নাই। কেহ কেহ অবরোহীতে গান্ধারের সাথে শুদ্ধ মধ্যমের কণ দেন।
১৫.	জয়ত	সা রা গা পা--পা ধা পা র্সা	র্সা ধা পা পা--গা পা-- গা রা সা	পঞ্চম	ষড়জ	ওড়ব	রাত্রি প্রথম প্রহর	ইহা উদারা ও মুদারা গ্রামে গাওয়া উচিত।
১৬.	আনন্দী	(অসমাপ্ত)[১]						

বেলাবল্ ঠাট বা শঙ্করা ভরণ মেল

সুর : সা রা গা মা পা ধা ণা র্সা

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
১.	শুদ্ধ বেলাবল্	সা রা গা মা পা ধা না র্সা	র্সা না ধা পা মা গা রা সা	ষড়জ বা ধৈবত	পঞ্চম বা রেখাব	সম্পূর্ণ	সকাল	এই রাগিণীর স্বরূপ আরোহীতে প্রকাশ পায় উত্তরাঙ্গে জোর যাবে। কম গাওয়া হয়।
২.	আলাইয়া	সা রা সা--গা রা-- গা পা--ধা না ধা-র্সা	র্সা না ধা--পা--ধা না ধা পা--মা গা-- মা রা সা	ধৈবত	গান্ধার	খাড়ব সম্পূর্ণ	সকাল	আরোহীতে মধ্যম লাগে না। অবরোহীর গান্ধার বক্র। অবরোহীতে কোমল নিখাদও লাগে কিন্তু ইহা বিষাদী সুর বলিয়া সাবধানে লাগাইতে হয়।
৩.	বেহাগ	ন্‌া সা গা মা পা ন্‌া স।	র্সা না—ধা পা—মা গা-- রা সা	গান্ধার	নিখাদ	ওড়ব সম্পূর্ণ	রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর	আরোহীতে রেখাব ও ধৈবত বর্জিত। অবরোহীতেও এই দুই সুর দুর্বল। আজকালকার রীতি অনুসারে দুই মধ্যম লাগে।
৪.	বেহাগরা	ন্‌া সা গা মা পা না র্সা	র্সা না ধা পা--ণা ধা পা হ্মা--মা গা রা সা	গান্ধার	নিখাদ	ওড়ব সম্পূর্ণ	রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর	কোমল নিখাদের জন্য ইহা বেহাগ হইতে বিভিন্ন হইয়া থাকে।
৫.	শঙ্করা (ক) :-- শঙ্করা (খ) :--	সা গা পা ধা--না ধা র্সা সা রা গা পা না ধা র্সা	র্সা না--পা না ধা র্সা না--পা গা র্সা র্সা না ধা পা গা--না ধা পা গা-- রা সা	ষড়জ গান্ধার	পঞ্চম	ওড়ব	রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর	(ক) ওড়ব জাতীয় করিয়া গাহিলে রেখাব ও মধ্যম দুই সুর বর্জিত করিতে হয়। (খ) খাড়ব করিয়া গাহিলে শুধু মধ্যম বর্জিত করিতে হয়। প্রচলিত রীতি অনুসারে মধ্যমের কৃণ্‌ লাগাইয়া গাওয়া হয়।

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
৬.	দেশকার	সা রা গা পা ধা র্সা	র্সা ধা পা গা রা সা	ধৈবত	রেখাব	ওড়ব	সকাল	ইহা উত্তরাঙ্গের রাগিণী। উত্তরাঙ্গ প্রবল করিয়া গাহিতে হয়। 'ধা পা গা'র সঙ্গত অধিক থাকে। গান্ধার প্রবল করিলে ভূপালি হইয়া যাইবে। ধৈবত বাদীর জন্য ইহা সকালের ও বেলাবল ঠাটের হইয়াছে।
৭	পাহাড়ী	সা রা গা পা ধা র্সা	র্সা ধা পা গা রা সা ধ্া	ষড়জ বা পঞ্চম	পঞ্চম বা ষড়জ	ওড়ব	রাত্রি	খাম্বাজ ঠাটের পাহাড়ী যাঁরা গান তাহা আসলে 'পাহাড়ী-ঝিঁঝোটী'। এ পাহাড়ী কম শোনা যায়। 'পাহাড়ী-ঝিঁঝোটী'ই পাহাড়ী নামে চলতি।
৮.	দেবগিরি	সা ন্া ধ্া ন্া ধ্া--সা রা গা--গা মা গা--পা ধা না ধা র্সা	স্া না ধা না পা মা গা--মা রা--সা	ষড়জ	পঞ্চম	বক্র সম্পূর্ণ	সকাল	ইহা এক প্রকার বেলাবল জাতীয় প্রায় অপ্রচলিত রাগ।
৯.	মাঁড়	সা গা রা--মা গা পা--মা ধা--পা না-ধা র্সা	র্সা ধা--না পা--ধা মা--পা গা--মা রা--গা সা	মধ্যম বা ষড়জ	পঞ্চম বা ষড়জ	বক্র সম্পূর্ণ	সকল সময়	এই রাগের মধ্যম পঞ্চম ষড়জ প্রবল থাকে। অর্থাৎ ঐসব সুরেই বেশি জোর দেওয়া হয়। আরোহী অবরোহী বিলম্বিত লয়ে গাওয়া উচিত। প্রচলিত রীতি অনুসারে মধ্যমকেই 'জান' করিয়া গাওয়া হয়। গজল ঠুংরীতে খুব ব্যবহৃত হয়। মাড়বার দেশের খুব প্রচলিত ও প্রিয় রাগিণী। তাই নাম মাঁড়।

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
১০.	নট	সা সা গা মা মা--মা পা মা মা পা--পা ধা না র্সা	র্সা না ধা না পা— মা পা মা গা সা— সা রা সা	মধ্যম	ষড়জ	সম্পূর্ণ ওড়ব	রাত্রি দ্বিপ্রহর	আরোহীতে গান্ধার ও ধৈবত বর্জিত। ইহাও প্রায় অপ্রচলিত।
১১.	নট-বেলাবল্	সা সা--গা মা গা-- মা পা মা--ধা না র্সা	র্সা না ধা--গা পা-- মা গা মা রা সা	মধ্যম	ষড়জ	বক্র সম্পূর্ণ	সকাল	বেলাবল ও নটের মিশ্রণে ইহার সৃষ্টি। আরোহীতে কোমল নিখাদের রূপ লাগে। ইহাও বেশি প্রচলিত নাই।
১২.	শুক্ল বেলাবল	সা--গা মা--মা পা গা ধা সা--ধা না র্সা	র্সা না ধা--গা ধা পা মা--গা রা--সা রা সা	মধ্যম	ষড়জ	বক্র সম্পূর্ণ	সকাল	আরোহীতে রেখাব দুর্বল বা গুপ্ত। উত্তর অঙ্গ প্রবল করিয়া গাহিতে হয়। আরোহীতে কোমল নিখাদের ঋণ লাগে। ইহা অপ্রচলিত নয়। বেলাবল জাতীয় মধুর রাগিণী।
১৩.	মালোহা কেদারা	স্ পা্ না্ সা--রা সা-- গা পা মা--না র্সা	র্সা না ধা পা--মা গা মা রা--সা		পঞ্চম বা ষড়জ	খাড়ব সম্পূর্ণ	প্রথম প্রহর রাত্রি	মন্দ্রস্থান বা উদারা গ্রামে ভাল শোনায়। আরোহীতে ধৈবত নাই। পশ্চিমে প্রচলিত। এদেশে শোনা যায় না।
১৪.	কুকুভ	সা রা রা পা মা পা ধা না ধা র্সা	র্সা না ধা পা মা পা মা গা মা রা সা		ধৈবত বা ষড়জ	খাড়ব সম্পূর্ণ	সকাল	আরোহীতে গান্ধার নাই। ইহাও প্রচলিত রাগ নয়।
১৫.	দুর্গা	সা রা--মা রা--পা ধা র্সা	র্সা ধা পা ধা মা রা সা		ষড়জ বা রেখাব	ওড়ব	রাত্রি দ্বিপ্রহর	গান্ধার নিখাদ বর্জিত। অতি অল্পদিন ইহা প্রচলিত হইয়াছে। বেলাবল ঠাটের অন্যতম মধুর রাগিণী। ধৈবতবাদী বলিয়া ইহা দিনে গাওয়া হয়।

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
১৬.	সরপর্দা	সা রা গা মা--ধা পা ধা না র্সা	র্সা না ধা পা না ধা পা--ধা পা মা-- গা মা রা সা		পঞ্চম বা ষড়জ	বক্র সম্পূর্ণ	সকাল	ইহা কতকটা প্রচলিত।
১৭.	লচ্ছাশাখ	সা রা গা মা--পা মা মা গা--ধা না ধা না র্সা	র্সা না ধা ধা পা--পা ধা পা মা গা রা সা		রেখাব বা নিখাদ	সম্পূর্ণ	দিবা প্রথম প্রহর	এই রাগিণীতে বেলাবল বিবোটী ও গৌড় সারং এই তিন রাগিণীর রূপ দেখা যায়। কিন্তু বেলাবলই প্রধান থাকে।
১৮.	হংসধনু	সা রা গা পা না র্সা	র্সা না পা গা রা সা		পঞ্চম	ওড়ব	রাত্রি	মাদ্রাজ অঞ্চলের ইহা মামুলী রাগিণী। এ অঞ্চলে প্রচলিত নাই। মধ্যম ও ধৈবত বর্জিত।
১৯.	হেম	পা ধা পা--সা রা সা-- গা মা পা--ধা পা--র্সা	র্সা ধা পা--গা মা পা-- গা মা রা সা		পঞ্চম	ওড়ব	রাত্রি	মন্দ্রস্থান ও উদারা গ্রামে মধুর শোনায়। ইহা প্রচলিত নয়।
২০.	পঠমঞ্জরী	সা রা সা--না ধা না পা--গা রা গা মা--পা মা পা--না র্সা	র্সা না ধা--না পা মা গা রা সা		পঞ্চম	বক্র সম্পূর্ণ	সকাল	মন্দ্র ও মধ্যস্থান অর্থাৎ উদারা ও মুদারা গ্রামে ইহা গাওয়া উচিত। কাফি ঠাটের পঠমঞ্জরীই কতকটা প্রচলিত। বেলাবল ঠাটের পঠমঞ্জরী শোনা যায় না।
২১.	জলধর কেদারা	সা রা সা মা রা--মা মা পা--না ধা--র্সা	র্সা না ধা পা মা পা-- ধা পা মা রা সা		ষড়জ	খাড়ব	রাত্রি	গান্ধার বর্জিত। ইহা এক প্রকার কেদারা।
২২.	গুণকলি	সা--গা রা সা--না ধা সা--গা মা পা না র্সা	র্সা না ধা পা--গা রা সা		পঞ্চম	বক্র সম্পূর্ণ	সকাল	ভৈরোঁ ঠাটেরই গুণকেলী আলাদা। ভৈরোঁ ঠাট দ্রষ্টব্য।

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
২৩.	নৌরোচ্‌কা	সা রা গা--সা ধ্‌া প্‌া-- ধ্‌া না--সা রা গা মা পা ধা	ধা পা গা মা রা সা ধ্‌া প্‌া		পঞ্চম	সম্পূর্ণ খাড়ব	সকল সময়	অপ্রচলিত রাগিণী।
২৪.	বাঙ্গাল	সা রা গা মা পা র্সা	র্সা না ধা পা মা গা রা সা		মধ্যম	ওড়ব সম্পূর্ণ	সকাল	অপ্রচলিত রাগিণী
২৫.	জলধর	সা রা মা পা ধা র্সা	র্সা ধা পা মা--রা সা		মধ্যম	ওড়ব	বর্ষা	অপ্রচলিত রাগিণী। প্রায় দুর্গা'র মত।
২৬.	আশা (অসমাপ্ত)							
২৭.	নট-বেহাগ (অসমাপ্ত)[২]							

২ বেলাবল ঠাটের জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে কবি কিছু লেখেন নি

ভৈরোঁ (ভৈরব) ঠাট বা গৌড়-মালব মেল

সুর : সা ঋা গা মা পা দা না র্সা (রেখাব ও ধৈবত কোমল)

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
১.	ভৈরোঁ (ভৈরব)	সা ঋা গা মা পা দা না র্সা	র্সা না দা পা মা গা ঋা সা	ধৈবত	রেখাব	সম্পূর্ণ	সকাল	রেখাব ও ধৈবত আন্দোলিত করিয়া গাওয়া হয়।
২.	দেশ-গৌড়	সা ঋা সা--পা দা না র্সা	র্সা না দা পা--সা ঋা সা	ধৈবত	রেখাব	ওড়ব	সকাল	মধ্যম ও গান্ধার বর্জিত।
৩.	মেঘ-রঞ্জনী	সা ঋা গা মা--না র্সা	সা না সা গা ঋা সা	মধ্যম	ষড়জ	ওড়ব	রাত্রি প্রথম প্রহর	কেহ কেহ ললিতের মত দুই মধ্যম ব্যবহার করেন। নিখাদ ও মধ্যমের মীড় ইহার বিশেষত্ব।
৪.	গুণকলি	সা ঋা মা পা দা র্সা	র্সা দা পা মা ঋা সা	ধৈবত	রেখাব	ওড়ব	সকাল	ভৈরব-অঙ্গ স্পষ্ট হওয়ায় যোগিয়া হইতে বিভিক হয়।
৫.	যোগিয়া	সা ঋা মা পা দা র্সা	র্সা না দা পা মা ঋা সা	মধ্যম	পঞ্চম বা ষড়জ	ওড়ব খাড়ব	সকাল	রেখাব বেশি দেওয়া বা উদার বাড়তের কাজ করা উচিত নয়। যোগিয়ার বিশেষত্ব 'ঋা মা'র এবং 'মা ঋা সা'র মীড় ; কেহ কেহ আরোহীতে গান্ধারের কৃণ দেন। উত্তরাঙ্গের রাগিণী।
৬.	প্রভাবতী বা প্রভাতী	সা ঋ গা মা পা দা না র্সা	র্সা না দা পা মা গা ঋা সা	মধ্যম	ষড়জ	সম্পূর্ণ	রাত্রির শেষ প্রহর	ভৈরোঁর বাদী সম্পাদী ধৈবত ও রেখাব। ইহার বাদী সম্বাদী মধ্যম ষড়জ। ইহাতেই ইহা ভৈরব হইতে অন্যরূপ শোনা যায়।

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
৭	কালংড়া	সা ঋা গা মা পা দা না র্সা	র্সা না দা পা মা গা ঋা সা	মধ্যম	ষড়্জ	সম্পূর্ণ	রাত্রির শেষ প্রহর	ভৈরোঁর মত রেখাব ধৈবত আন্দোলিত হয় না। ইহা চঞ্চল প্রকৃতির রাগিণী। কেহ কেহ গান্ধার-বাদী করিয়া প্রভাতী হইতে বাঁচান। কিন্তু ইহার চঞ্চল প্রকৃতিই ইহাকে সহজে পরিচিত করিয়া দেয়। গান্ধার অনুবাদী করা চলে। বাদী সম্বাদী করার প্রয়োজন নাই।
৮.	সৌরাষ্ট্র বা সুরষ্টি	সা ঋা গা মা ধা না র্সা	র্সা না দা পা মা গা ঋা সা	মধ্যম	ষড়্জ	সম্পূর্ণ	সকাল	দুই ধৈবত লাগে। আরোহীতে তীব্র ও অবরোহীতে কোমল ধৈবত।
৯.	বামকেলি	সা ঋা গা পা দা র্সা	র্সা না দা পা মা গা ঋা সা	ধৈবত	রেখাব	ওড়ব সম্পূর্ণ	সকাল	কেহ কেহ দুই মধ্যম লাগান।
১০.	বিভাস	সা ঋা গা পা দা র্সা	র্সা দা পা গা ঋা সা	ধৈবত	রেখাব	ওড়ব সম্পূর্ণ	সকাল	গা-পা'র সঙ্গত মধুর শোনায়। অন্য একরূপ বিভাস প্রচলিত আছে। তাহাতে তীব্র ধৈবত লাগে।
১১.	ললিত পঞ্চম	সা ঋা গা মা ধা না র্সা	র্সা না দা পা--ঋা পা--গা মা গা ঋা সা	মধ্যম	ষড়্জ	খাড়ব সম্পূর্ণ	সকাল	এই রাগে দুই মধ্যম লাগে।
১২.	সাবেরী	সা ঋা মা পা দা র্সা	র্সা না দা পা সা ঋা সা	পঞ্চম	ষড়্জ	ওড়ব সম্পূর্ণ	রাত্রির শেষ প্রহর	ইহা এক প্রকার আশাবাদী। অবরোহী সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য যোগিয়া ও গুণকেলী হইতে বিভিক হয়। আজকাল আশাবরী অধিকাংশ স্থলেই তীব্র রেখাব দিয়া গাওয়া হয়। কেহ কেহ দুই রেখাবও লাগান। তবে, আশাবরীর গান্ধার কোমল, ইহার তীব্র।

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
১৩.	বাঙ্গালা ভৈরোঁ	সা ঋা গা মা পা দা র্সা	র্সা দা পা মা গা মা ঋা সা	ধৈবত	রেখাব	খাড়ব	সকাল	ইহাতে নিখাদ বর্জিত বা বিবাদী।
১৪.	শিবমত ভৈরব	সা ঋা গা মা পা দা না র্সা	র্সা না দা পা--ণা দা পা মা জ্ঞা মা ঋা সা	ধৈবত	রেখাব	সম্পূর্ণ	সকাল	ইহাতে গান্ধার ও নিখাদ আরোহীতে তীব্র ও অবরোহণে কোমল করিয়া গাওয়া হয়। কাজেই ইহা আরোহণে ভৈরোঁ ঠাট এবং অবরোহণে টোড়ী ঠাট। এই জাতীয় রাগ বা রাগিণীকে মিশ্র মেল বলে। ইহার প্রচলন হওয়া উচিত।
১৫.	আনন্দ ভৈরব	সা ঋা গা মা পা ধা না র্সা	র্সা না ধা পা মা গা ঋা সা	পঞ্চম	রেখাব	সম্পূর্ণ	সকাল	ইহার ধৈবত তীব্র। ভৈরোঁ ও বেলাবলের মিশ্রণে ইহার সৃষ্টি। কেহ কেহ আরোহণে বক্রভাবে কোমল ধৈবত লাগান। ইহাতে এই রাগিণী মধুরতর শোনায়। এইভাবে কোমল ধৈবত লাগান :--র্সা না ধা পা মা--দা--পা মা গা ঋা সা। এই মতের যাঁহারা পরিপোষক, তাঁহারা মধ্যমকে সম্বাদী ও ষড়জবাদী করিয়া এই রাগিণী আলাপ করেন। আনন্দ-ভৈরবী অন্য রাগিণী। তাহা আশাবরী ঠাটের। ভৈরবী ঠাটের হওয়া উচিত নয়।
১৬.	হেজাজ্ বা হুজীজ্	সা ঋা গা মাপা দা গা র্সা	র্সা ণা দা পা মা--গা মা পা ঋা সা	মধ্যম	ষড়জ-	সম্পূর্ণ	সকাল	ভৈরোঁ ও ভৈরবীর সংমিশ্রণে ইহার উৎপত্তি। আরবের হেজাজ প্রদেশের সুর ভোল বদলাইয়া ভারতয়ি হইয়াছে।

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
১৭.	জিলফ	সা ঋা গা মা পা দা না র্সা	র্সা না দা পা--দা পা মা--গা মা ঋা সা	ধৈবত	গান্ধার	সম্পূর্ণ	সকাল	মিশ্র মেলের রাগিণী। মুসলমান গায়কগণের সৃষ্টি এই রাগিণী। যন্ত্রে এই রাগিণীর আলাপ শোনা যায়। গান প্রায় শোনা যায় না।
১৮.	আহীর ভৈরোঁ	সা ঋা গা মা পা ধা ণা র্সা	র্সা ণা ধা পা মা গা ঋা সা	ষড়জ	মধ্যম	সম্পূর্ণ	সকাল	নিখাদ কোমল। ইহা মিশ্র মেলের রাগ। ইহার পূর্বাঙ্গ ভৈরোঁ ঠাটের এবং উত্তরাঙ্গ কাফি ঠাটের। ভৈরব ও কাফির সংমিশ্রণে ইহার সৃষ্টি।
১৯.	বাঙালি (অসমাপ্ত)							
২০.	কর্ণাট-সামন্ত (অসমাপ্ত)							

১. হৈমন্তী শব্দটি লেখা আছে প্রথমে—কোন বিস্তারিত ব্যাখ্যা নেই।

ভৈরোঁ বা ভৈরব ঠাট

আজকাল যাহা ভৈরোঁ বা ভৈরব ঠাট নামে পরিচিত, প্রাচীন সঙ্গীত-গ্রন্থে তাহার নাম 'গৌড়-মালব' মেল। ইহার সুর ঃ—ষড়জ, কোমল রেখাব, তীব্র গান্ধার, শুদ্ধ মধ্যম, পঞ্চম, কোমল ধৈবত, তীব্র নিখাদ। ইহার প্রধান বিশেষত্ব এই যে, এই ঠাটের রেখাব ও ধৈবত কোমল। 'সন্ধি-প্রকাশ' রাগ-রাগিণীর ইহা প্রধান লক্ষণ। 'সন্ধি-প্রকাশ' রাগ-রাগিণী তাহাকে বলে, যাহা দুই সময় (মিলাইয়া) গাওয়া যায়। এই ঠাটের আরো বিশেষত্ব এই যে ইহার রাগ-রাগিণী উত্তর-অঙ্গ প্রধান অর্থাৎ মুদারা গ্রামের পঞ্চম হইতে তারা স্থানের ষড়জ পর্যন্ত প্রবল হয়। ইহার প্রথম রাগ ভৈরব এবং এই রাগের নামানুসারে এই ঠাটের নামকরণ হইয়াছে। তাহার কারণ, ইহার অন্তর্গত সকল রাগ রাগিণীতেই ভৈরব-অঙ্গ প্রধান।

ভৈরবী ঠাট

(প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থে ইহার নাম 'টৌড়ী ঠাট')

সুর : সা ঋা জ্ঞা মা পা দা না র্সা

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
১.	ভৈরবী	সা ঋা জ্ঞা মা পা দা ণা র্সা	র্সা ণা দা পা মা জ্ঞা ঋা সা	পঞ্চম বা ষড়্জ	ষড়্জ বা পঞ্চম	সম্পূর্ণ	সকাল	কেহ কেহ ধৈবত বাদী ও গান্ধার সম্বাদী বলেন।
২.	মালকোষ	সা জ্ঞা মা দা ণা র্সা	র্সা ণা দা মা জ্ঞা সা	মধ্যম	ষড়্জ	ওড়ব	রাত্রি শেষ প্রহর	রেখাব ও পঞ্চম বিবাদী।
৩.	ভূপাল	সা ঋা জ্ঞা পা দা র্সা	র্সা দা পা জ্ঞা ঋা সা	ধৈব	রেখাব	ওড়ব	সকাল	ভূপালী যেমন তীব্র সুর দ্বারা সন্ধ্যায় গাওয়া হয়, তেমনি কোমল সুর দিয়া সকালে ভূপালী গাওয়া হয়।
৪.	আশাবরী	সা ঋা মা পা দা র্সা	র্সা ণা দা পা মা জ্ঞা ঋা সা	ধৈবত	গান্ধার বা রেখাব	ওড়ব	দিবা দ্বিতীয় প্রহর	উত্তর-অঙ্গ প্রধান রাগিণী। কেহ কেহ আরোহীতে তীব্র ও অবরোহণে কোমল রেখাব ব্যবহার করেন।
৫.	ধানশ্রী	ণা সা জ্ঞা মা পা ণা র্সা	র্সা ণা দা পা মা জ্ঞা ঋা সা	পঞ্চম	ষড়্জ	ওড়ব সম্পূর্ণ	সকাল	কাফি ঠাটেও এক প্রকার ধান রহিয়াছে। পূরবী ঠাটেও এক প্রকার ধানশ্রী আছে, যাহার নাম 'পুরিয়া-ধানশ্রী'।
৬.	জঙ্গোলো	সা ঋা জ্ঞা মা পা ধা ণা র্সা	র্সা ণা ধা পা মা গা ঋা সা	ষড়্জ	পঞ্চম বা ষড়্জ	সম্পূর্ণ	সকাল	কম গাওয়া হয়।

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
৭	মোট্‌কী	ণ্‌া সা জ্ঞা মা পা ধা ণা র্সা	র্সা দা ণা ধা পা মা জ্ঞা ঋা সা	ষড়্‌জ বা পঞ্চম	পঞ্চম বা ষড়্‌জ	সম্পূর্ণ	সকাল	বাগেশ্রী ও টোড়ির মিশ্রণে ইহার সৃষ্টি। দুই নিখাদ ও দুই ধৈবত লাগে। এ দেশে শোনা যায় না।
৮.	শুদ্ধ শাওন্ত	সা ঋা মা পা দা র্সা	র্সা দা পা মা জ্ঞা সা	মধ্যম	ষড়্‌জ বা পঞ্চম	ওড়ব	সকাল	মাদ্রাজ অঞ্চলে খুব প্রচলিত।
৯.	বসন্ত মুখারী	সা ঋা গা মা পা দা ণা সা	র্সা দা পা মা জ্ঞা ঋা ঋা সা	মধ্যম	রেখাব	সম্পূর্ণ	সকাল	ভৈরোঁ ও ভৈরবীর সংমিশ্রণে ইহার সৃষ্টি। এই জন্য ইহার গান্ধার তীব্র ও অন্যান্য সুর ভৈরবীর ন্যায় কোমল।
১০.	আনন্দ ভৈরবী (অসমাপ্ত)							

ভৈরবী-ঠাট

প্রচলিত রীতি অনুসারে যাহার নাম এখন 'ভৈরবী-ঠাট', প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থে ইহার নাম টোড়ি, ঠাট বা মল। সর্বজন প্রিয় ও পরিচিত ভৈরবী রাগিণীর নামানুসারে ইহার নূতন নামকরণ হইয়াছে। ইহার সুর : ষড়্‌জ, কোমল রেখাব, কোমল গান্ধার, শুদ্ধ মধ্যম, পঞ্চম, কোমল ধৈবত, কোমল নিখাদ। ইহার অন্তর্গত রাগরাগিণীতে ভৈরবীর অঙ্গ প্রধান বলিয়া ভৈরবী ঠাটের অন্তর্গত করা হইয়াছে।

আশাবরী ঠাট

(প্রাচীন গ্রন্থে ইহার নাম 'নট ভৈরবী' ঠাট)

সুর : সা রা জ্ঞা সা পা দা না সা

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
১.	আশাবরী	সা রা মা পা দা র্সা	র্সা ণা দা পা মা জ্ঞা রা সা	ধৈবত	রেখাব	ওড়ব সম্পূর্ণ	দিনের দ্বিতীয় প্রহর	পঞ্চম হইতে গান্ধারের মীড় মধুর শোনায়। কেহ কেহ আরোহীতে কোমল রেখাব লাগান। ভৈরবী ঠাটের আশাবরী ভৈরবী ঠাটে দ্রষ্টব্য।
২.	জৌনপুরী	সা রা মা পা দা ণা র্সা	র্সা ণা দা পা মা জ্ঞা রা সা	ধৈবত বা নিখাদ	রেখাব বা গান্ধার	খাড়ব সম্পূর্ণ	দিনের দ্বিতীয় প্রহর	আশাবরী, জৌনপুরী, গান্ধারী বা দেব-গান্ধার ও দেশীর আরোহী অবরোহী বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিবার যোগ্য। নৈলে শুদ্ধ করিয়া গাওয়া অসম্ভব।
৩.	দেব-গান্ধার বা গান্ধারী	সা জ্ঞা মা পা ণা র্সা	র্সা ণা দা পা মা জ্ঞা রা সা	পঞ্চম	ষড়জ	ওড়ব সম্পূর্ণ	দিনের দ্বিতীয় প্রহর	ধানশ্রী ও আশাবরীর মিশ্রণে ইহার উৎপত্তি। আরোহীতে ধানশ্রীর অঙ্গ স্পষ্ট। কিন্তু আশাবরীব অঙ্গ স্পষ্ট থাকা উচিত। কেহ কেহ আরোহণে তীব্র গান্ধার ও ধৈবত লাগান।

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
৪.	দেশী	সা রা মা পা ণা র্সা	র্সা ণা দা পা মা জ্ঞা রা সা	মধ্যম	ষড়জ	ওড়ব সম্পূর্ণ	দিনের দ্বিতীয় প্রহর	কেহ কেহ দুই ধৈবত লাগান, কেহ শুধু তীব্র ধৈবত দেন। অবরোহণে কিন্তু অবরোহণে কোমল রেখাবও ব্যবহার করেন।
৫.	সিন্ধু ভৈরবী	সা রা জ্ঞা মা পা দা ণা র্সা	র্সা ণা দা পা মা জ্ঞা রা সা	ষড়জ বা মধ্যম	পঞ্চম বা ষড়জ	সম্পূর্ণ	দিনের দ্বিতীয় প্রহর	কেহ কেহ অবরোহণে কোমল রেখাবও ব্যবহার করেন।
৬.	আভিরী	ণা সা জ্ঞা মা পা ণা র্সা	র্সা ণা দা পা মা জ্ঞা রা সা	মধ্যম	নিখাদ	ওড়ব সম্পূর্ণ	সকাল	প্রাচীন গ্রন্থের রাগিণী।
৭	দরবারী	ণা সা--জ্ঞা রা--মা পা--দা ণা র্সা	র্সা দা ণা পা--মা পা--জ্ঞা--মা--রা সা	গান্ধার	নিখাদ	সম্পূর্ণ খাড়ব	অর্দ্ধরাত্রি	গান্ধার আন্দোলিত হয়। কেহ কেহ আরোহীতে গান্ধার বর্জন করেন। নিখাদ ও পঞ্চমের মীড় মধুর শোনায়। তানসেন ইহার স্রষ্টা। কেহ কেহ বলেন মেঘ ও মালকোষে ইহার সৃষ্টি।
৮.	আড়ানা	সা রা গা পা দা ণা র্সা	র্সা দা ণা জ্ঞা মা রা সা	ষড়জ	পঞ্চম	খাড়ব	অর্ধরাত্রি	পঞ্চম গান্ধারের মাখামাখি ইহার বিশেষত্ব। ইহা উত্তরাঙ্গের রাগিণী। তারা স্থানে ইহা গাহিতে হয়।

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
৯.	কৌশী	ণ্‌া সা--জ্ঞা মা--পা মা--দা ণা র্সা	র্সা ণা দা মা পা মা জ্ঞা রা সা	মধ্যম	ষড়জ	ওড়ব সম্পূর্ণ	অর্ধরাত্রি	মালকোষ ও ধানশ্রীর সংমিশ্রণে ইহার উৎপত্তি।
১০.	খট বা ষট	ণ্‌া সা জ্ঞা মা পা--দা র্সা	র্সা ণা দা পা--ধা মা--পা মা--গা ঋা সা	ধৈবত	রেখাব	ওড়ব সম্পূর্ণ	দ্বিপ্রহর (দিবা)	দুই রেখাব, দুই গান্ধার, দুই ধৈবত ও দুই নিখাদ লাগে। ইহা ছয় রাগিণীর সংমিশ্রণে সৃষ্ট বলিয়া ইহার নাম খট বা ষট। ইহার আরোহী অবরোহী অত্যন্ত দুরূহ।

* 'মনোরঞ্জনী' শব্দটি লেখা আছে প্রথমে—কোন ব্যাখ্যা নেই।

আশাবরী ঠাট

প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থে যাহা 'নট ভৈরবী' মেল নামে খ্যাত, তাহাকেই আজকাল আশাবরী ঠাট বাধা হইয়া থাকে। ইহার সুর :—ষড়জ, তীব্র রেখাব, কোমল গান্ধার, শুদ্ধ মধ্যম, পঞ্চম, কোমল ধৈবত, কোমল নিখাদ। লোককান্ত আশাবরী রাগিণীর নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থে ইহার নাম 'ভৈরবী মেল' এইজন লিখিত আছে যে পূর্বে ভৈরবীর রেখাব তীব্র ছিল, এখন চলতি রীতি অনুসারে ভৈরবীর রেখার কোমল। তাই ইহার বর্তমান নাম আশাবরী–ঠাট রাখা হইয়াছে। ইহার অন্তর্গত রাগরাগিণীতে আশাবরী অঙ্গ প্রধান।

টোড়ী ঠাট (বা নটবরালী মেল)

সুর : সা ঋা জ্ঞা হ্মা পা দা না র্সা

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
১.	টোড়ী	সা ঋা জ্ঞা হ্মা পা দা না র্সা	র্সা না দা পা হ্মা জ্ঞা ঋা সা	ধৈবত	গান্ধার	সম্পূর্ণ	দিবা দ্বিপ্রহর	কেহ কেহ গান্ধারবাদী ও ধৈবত সম্বাদী বলেন।
২.	বাহাদুরী টোড়ী	দ্‌া প্‌া দ্‌া ন্‌া সা--ঋা	র্সা না দা--হ্মা জ্ঞা ঋা সা	ধৈবত	গান্ধার	সম্পূর্ণ খাড়ব	দিবা দ্বিপ্রহর	মন্দ্রস্থান বা উদারা গ্রামে ইহা মধুর শোনায়। অবরোহণে পঞ্চম বর্জিত।
৩.	মুলতানী	ন্‌া সা জ্ঞা হ্মা পা না র্সা	র্সা না দা পা হ্মা জ্ঞা ঋা সা	পঞ্চম	নিখাদ	ওড়ব সম্পূর্ণ	দিবা তৃতীয় প্রহর	কেহ কেহ বলেন, ষড়জ সম্বাদী সুর।
৪.	গুর্জরী	সা ঋা জ্ঞা হ্মা দা না র্সা	র্সা না দা হ্মা জ্ঞা ঋা সা	ধৈবত	গান্ধার বা রেখাব	খাড়ব	দিবা দ্বিপ্রহর	
৫.	মিয়া-কি-টোড়ী	সা ঋা সা--দ্‌া ন্‌া সা-- ঋা জ্ঞা হ্মা দা--না র্সা	র্সা না দা পা--হ্মা জ্ঞা ঋা সা	ধৈবত	রেখাব	খাড়ব সম্পূর্ণ	দিবা দ্বিপ্রহর	আরোহীতে পঞ্চম নাই। অবরোহণে পঞ্চম লাগিলেও কম লাগে।
৬.	দরবারী টোড়ী	ম্‌া প্‌া দ্‌া গ্‌া সা--ঋা। সা--জ্ঞা--হ্মা পা--দা না র্সা	র্সা না দা পা--হ্মা জ্ঞা দা পা--জ্ঞা মা জ্ঞা ঋা সা	ষড়জ	পঞ্চম	বক্র সম্পূর্ণ	দিবা দ্বিপ্রহর	দরবারী ও টোড়ির মিশ্রণে ইহার সৃষ্টি। মন্দ্রস্থানে দরবারী কানাড়ার মত। মধ্যস্থানে নিখাদ ও মধ্যম তীব্র। শুদ্ধ মধ্যমও লাগে অবরোহণে বক্রভাবে।

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
৭	বিলাসখানী টোড়ী	সা রা মা পা দা না র্সা	র্সা না দা পা--মা জ্ঞা ঋা সা	ষড়জ	পঞ্চম	খাড়ব সম্পূর্ণ	দিবা দ্বিপ্রহর	আশাবরী ও টোড়ির মিশ্রণ। দুই রেখাব লাগে। মধ্যম শুদ্ধ। আরোহীতে গান্ধার নাই। শুধু নিখাদ তীব্র--ইহাতেই টোড়ির রূপ ফোটে।
৮.	ছায়াটোড়ী	সা ঋা জ্ঞা--হ্মা দা র্সা	র্সা দা হ্মা জ্ঞা ঋা সা	ধৈবত	রেখাব	ওড়ব	দিবা দ্বিপ্রহর	পঞ্চম ও নিখাদ বর্জিত। মন্দ্রস্থানে বা উদারা গ্রামে ইহা মধুর শোনায়।

টোড়ি ঠাট

প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থে ইহার নাম 'নট বরালী' মেল। বিখ্যাত 'টোড়ি' রাগিণীর নামানুসারে ইহার বর্তমান নামকরণ হইয়াছে। ইহার সুর :—ষড়জ, কোমল রেখাব, কোমল গান্ধার, কড়ি মধ্যম, পঞ্চম, কোমল ধৈবত, তীব্র নিখাদ। আজকাল বহুপ্রকার টোড়ির প্রচলন দেখা যায়—ইহার অধিকাংশই মুসলমান গুণিগণ মুসলমান রাজত্বকালে সৃজন করিয়াছেন। প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থে শুধু একটি টোড়ি পাওয়া যায়। বর্তমানে টোড়ি অষ্টাদশ প্রকার শোনা যায়। ইহারাও অধিক থাকিতে পারে, আমার তাহা জানা নাই বা শুনি নাই। অষ্টাদশ টোড়ির নাম :—

১। জৌনপুরী টোড়ি ২। গান্ধারী টোড়ি বা দেব-গান্ধার ৩। দেশী টোড়ি ৪। আশা টোড়ি (এই চারিটি টোড়ি আশাবরী ঠাটের অন্তর্গত) ৫। বাহাদুরী টোড়ি ৬। গুর্জরী টোড়ি ৭। বিলাসখানী টোড়ি ৮। ছায়া টোড়ি ৯। দরবারী টোড়ি ১০। মিয়া-কি টোড়ি ১১। হোসেনী টোড়ি ১২। লছমী টোড়ি ১৩। লাচারী টোড়ি ১৪। খট টোড়ি ১৫। সুঘরাই টোড়ি ১৬। সুহা টোড়ি ১৭ মন্দ্রিক টোড়ি ১৮। মাল টোড়ি (এই চতুর্দশ টোড়ি টোড়ি ঠাটের অন্তর্গত। কাহারও মতে খট-টোড়ি আশাবরী ঠাটের অন্তর্গত)। মিশ্র রাগরাগিণী লইয়া মতভেদের অন্ত নাই।

১. 'টোড়ি' বানান কবি 'টোড়ী' এবং 'টোড়ি' দু রকমই লিখেছেন।

পূরবী ঠাট

সুর : সা ঋা গা হ্মা পা না র্সা

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
১.	পূরবী	সা ঋা গা হ্মা পা দা না র্সা	র্সা না দা পা হ্মা গা মা গা ঋা সা	পঞ্চম বা গান্ধার	নিখাদ	সম্পূর্ণ	প্রথম সন্ধ্যা	দুই মধ্যম লাগে। শুদ্ধ মধ্যম কম লাগে।
২.	শ্রী	সা ঋ হ্মা পা--না র্সা	র্সা না দা পা--হ্মা গা ঋা--সা	রেখাব	পঞ্চম	ওড়ব সম্পূর্ণ	প্রথম সন্ধ্যা	আরোহীতে গান্ধার ও ধৈবত বর্জিত।
৩.	হংস নারায়ণ	সা ঋা গা হ্মা পা র্সা	র্সা না পা মা গা দ্দা সা	ষড়জ	পঞ্চম	ওড়ব খাড়ব	প্রথম সন্ধ্যা	প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থের রাগ।
৪.	মালবী	সা ঋা গা হ্মা পা--হ্মা দা র্সা	র্সা ণা পা হ্মা গা ঋা সা	রেখাব	পঞ্চম	খাড়ব	প্রথম সন্ধ্যা	আরোহীতে নিখাদ বর্জিত। অবরোহীতে ধৈবত বর্জিত।
৫.	ত্রিবেণী	সা ঋা গা পা দা--না র্সা	র্সা না দা পা গা ঋা সা	রেখাব	ষড়জ	খাড়ব সম্পূর্ণ	প্রথম সন্ধ্যা	এই রাগিণীতে মধ্যম বিবাদী। শ্রীরাগ-অঙ্গ করিয়া গাওয়া উচিত।
৬.	টঙ্করা	সা ঋা গা পা দা না র্সা	র্সা না দা পা হ্মা গা ঋা সা	পঞ্চম	ষড়জ	খাড়ব সম্পূর্ণ	প্রথম সন্ধ্যা	অনেকাংশে ত্রিবেণীর মত। বাদী সুরের তফাৎ ছাড়াও টঙ্করার অবরোহণে মধ্যম লাগে। ত্রিবেণী মধ্যম বর্জিত।

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
৭	গৌরী	সা ঋা হ্মা পা না র্সা	র্সা না দা পা হ্মা ঋা সা	রেখাব বা পঞ্চম	পঞ্চম বা রেখাব	ওড়ব খাড়ব	প্রথম সন্ধ্যা	আরোহীতে গান্ধার ও ধৈবত বর্জ্জিত। অবরোহীতে গান্ধার বর্জ্জিত। কেহ কেহ আরোহী অবরোহীতে দুই-এই গান্ধার ও ধৈবত বর্জ্জিত করিয়া গান। শ্রীরাগের অঙ্গ প্রবল না হয় এমন করিয়া গাহিতে হয়।
৮.	দীপক	সা গা হ্মা পা দা না র্সা	র্সা দা পা--হ্মা গা ঋা সা	ষড়জ	পঞ্চম	খাড়ব		ইহার আরোহীতে রেখাব বর্জ্জিত এবং আরোহীতে নিখাদ বর্জ্জিত। অনেকের বিশ্বাস, দীপক লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা ভুল। দীপক গাহিলে আগুন জ্বলে, ইহা এক প্রকার ঠিক, কেননা ইহার গাহিবার সময় তখন--যখন দীপ জ্বালানোর সময় হয়। কেহ কেহ ইহা কল্যাণ ঠাটে এবং কেহ বা ভৈরোঁ ঠাটে গান। কিন্তু দীপক নামেই প্রকাশ। ইহা পূরবী ঠাটের।
৯.	রেবা	সা ঋা সা পা দা র্সা	র্সা দা পা গা ঋা সা	গান্ধার বা ষড়জ	ধৈবত	ওড়ব	প্রথম সন্ধ্যা	মধ্যম ও নিখাদ বর্জ্জিত। ভূপালীর মত--তবে ইহার রেখাব ও ধৈবত কোমল। ভূপালীর রেখাব ধৈবত তীব্র।

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
১০.	জয়জয়ন্তী	সা ঋা সা--গা হ্মা পা-- না র্সা	র্সা না দা পা হ্মা গা ঋা সা	গান্ধার	নিখাদ	ওড়ব সম্পূর্ণ	প্রথম সন্ধ্যা	আরোহীতে ধৈবত বর্জ্জিত। রেখাবও প্রায় বর্জ্জিত।
১১.	পূরিয়া ধানশ্রী	সা ঋা গা হ্মা পা--দা না র্সা	র্সা না দা পা হ্মা গা ঋা সা	পঞ্চম	ষড়জ	সম্পূর্ণ	প্রথম সন্ধ্যা	
১২.	পরজ	সা ঋা গা হ্মা পা দা না র্সা	র্সা না দা পা হ্মা গা মা গা ঋা সা	ষড়জ	পঞ্চম	সম্পূর্ণ	রাত্রি শেষ প্রহর (বসন্ত ঋতু)	উত্তরাঙ্গ প্রধান রাগিণী। চঞ্চল প্রকৃতি। নিখাদ বাদী সম্বাদী না হইলেও খুব বেশি লাগে। ইহা দ্রুত লয়ে গাওয়া উচিত। কড়ি মধ্যমও একটু বেশি লাগে।
১৩.	বসন্ত	সা ঋা গা হ্মা দা না র্সা	র্সা না দা পা হ্মা গা ঋা সা	ষড়জ (তারা স্থানের)	পঞ্চম	খাড়ব সম্পূর্ণ	রাত্রি শেষ প্রহর (বসন্ত ঋতু)	আরোহীতে পঞ্চম বর্জ্জিত। মধ্যম ও গান্ধার বার বার লাগানো হয়। পূর্বাঙ্গে শুদ্ধ মধ্যমের সঙ্গে কড়ি মধ্যমের কৃণ দিয়া একটু ললিতাকে করিয়া আজকাল গাহিবার রীতি। ইহাতে ইহা পরজ হইতে বিভিন্ন হয়। ষড়জ হইতে শুদ্ধ মধ্যম পর্যন্ত মীড় মধুর শোনায়।
১৪.	ধবলশ্রী পূরবী পূর্বকল্যাণ							

পূরবী ঠাট

প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রে ইহার নাম 'রাম-ক্রিয়া' মেল। কর্ণাটক সঙ্গীতে ইহার নাম 'কাম বর্দ্ধিনী' মেল। অতি পরিচিত পূরবী রাগিণীর নামানুসারে ইহার বর্তমান নাম 'পূরবী ঠাঠ'। ইহার সুর :— ষড়জ, কোমল রেখাব, তীব্র গান্ধার, কড়ি মধ্যম, পঞ্চম, কোমল ধৈবত, তীব্র নিখাদ। ভাল করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, পূরবী ও ভৈরোঁ ঠাটে শুধু মধ্যমের তফাৎ। অর্থাৎ ভৈরোঁ ঠাটে শুদ্ধ মধ্যমের স্থানে তীব্র মধ্যম লাগাইলেই 'পূরবী' ঠাট হইয়া যাইবে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পুরবী ঠাটের রাগরাগিণী দুই অঙ্গ করিয়া গাওয়া হয়। প্রথম—পূরবী অঙ্গ, দ্বিতীয় শ্রী-অঙ্গ। যে সব রাগরাগিনী পূরবী-অঙ্গ করিয়া গাওয়া হয়, তাহাতে সর্বদা নিখাদ ও গান্ধারের সঙ্গত থাকে। যাহা শ্রী-অঙ্গ করিয়া গাওয়া হয়, তাহাতে পঞ্চম ও রেখাব-এর সঙ্গত থাকে।

✣ পাণ্ডুলিপিতে পূরবী ঠাট আলোচনার প্রথমে 'কুমারী' শব্দটি লেখা আছে—কোন ব্যাখ্যা নেই।

মারওয়া ঠাট (বা গমনশ্রম মেল)

সুর : সা ঋা গা হ্মা পা ধা না র্সা

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
১.	মারওয়া	না ঋা গা হ্মা ধা--না ধা র্সা	র্সা না ধা হ্মা গা ঋা সা	গান্ধার	ধৈবত	খাড়ব	সন্ধ্যা	আরোহীতে রেখাব ও অবরোহীর নিখাদ বক্র। পঞ্চম বর্জিত।
২.	পুরিয়া	সা না় ধা় না়--ঋা গা--হ্মা ধা--না ধা-র্সা	র্সা--না ধা না--হ্মা গা ঋা সা	গান্ধার	নিখাদ	খাড়ব	সন্ধ্যা	রেখাব ও নিখাদের সঙ্গত থাকে। পঞ্চম বর্জিত।
৩.	বরারী	সা ঋা গা হ্মা পা--হ্মা ধা র্সা	র্সা না ধা পা--হ্মা গা ঋা সা	গান্ধার	ধৈবত	বক্র সম্পূর্ণ	সন্ধ্যা	নিখাদ দুর্বল। পঞ্চম ও গান্ধারের সঙ্গত থাকা উচিত।
৪.	ললিত	সা ঋা সা--গা মা--হ্মা গা--হ্মা ধা র্সা	র্সা না ধা--ধা হ্মা গা ঋা সা	মধ্যম	ষড়জ	খাড়ব	অর্ধরাত্রের পর	পঞ্চম বর্জিত। দুই মধ্যম লাগে। বহু অঞ্চলে কোমল ধৈবত দিয়া গাওয়া হয়।
৫.	জয়ত	সা ঋা গা পা ধা র্সা	র্সা ধা পা গা ঋা সা	পঞ্চম	ষড়জ	ওড়ব	সন্ধ্যা	উত্তরাঙ্গ দুর্বল। কল্যাণ ঠাটের জয়তই বেশি গাওয়া হয়।
৬.	ভাটিয়ার	সা ঋা সা গা হ্মা ধা র্সা	র্সা না ধা পা--মা--গা হ্মা গা--ঋা সা	মধ্যম	ষড়জ	ওড়ব সম্পূর্ণ	রাত্রি শেষ প্রহর	উত্তরাঙ্গ প্রবল। আরোহীতে কড়ি মধ্যম। অবরোহীতে দুই মধ্যম। শুদ্ধ মধ্যম স্পষ্ট করিয়া লাগাইতে পারা যায়। তাহাতে রাগিণীর বৈচিত্র্য ও মাধুর্য্য বাড়ে।

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
৭	ভিখার (বক্কার)	সা ঋা সা গা মা গা হ্মা ধা র্সা	র্সা না ধা পা--হ্মা গা-- পা গা--হ্মা সা	পঞ্চম	ষড়জ	ওড়ব সম্পূর্ণ	রাত্রি শেষ প্রহর	ইহাও উত্তরাঙ্গ-প্রবল রাগিণী। তবে ভাটিয়ারের মত শুদ্ধ মধ্যম বেশি করিয়া লাগানো যায় না।
৮.	পঞ্চম	সা গা মা--পা মা গা-- হ্মা দা র্সা	র্সা না ধা পা মা--গা পা গা--ঋা সা	মধ্যম	ষড়জ	ওড়ব সম্পূর্ণ	রাত্রি শেষ প্রহর	শুদ্ধ মধ্যমের জন্য ললিতের মত শোনায়।
৯.	সোহিনী	সা গা হ্মা ধা না র্সা	র্সা না ধা হ্মা ধা--গা-- হ্মা গা ঋা সা	ধৈবত	গান্ধার	ওড়ব খাড়ব	রাত্রি শেষ প্রহর	পঞ্চম বর্জিত। আরোহীতে রেখাব বর্জিত। উত্তরাঙ্গ প্রবল রাগিণী।
১০.	বিভাস	সা ঋা সা--গা পা ধা পা--ধা র্সা	র্সা না ধা পা--হ্মা গা-- পা গা ঋা সা	ধৈবত	গান্ধার	ওড়ব সম্পূর্ণ	সকাল	ইহাও উত্তরাঙ্গ-প্রবল রাগিণী। অন্যরূপ বিভাস ভৈঁরো-ঠাট দ্রষ্টব্য।
১১.	মালিগোরা	সা ঋা সা--না ধা পা-- ধা সা--ঋা গা হ্মা পা-- ধা না ধা র্সা	র্সা না ধা পা হ্মা গা ঋা সা	রেখাব	পঞ্চম	বক্র সম্পূর্ণ	সন্ধ্যা	শ্রীরাগ ও পূরিয়ার মিশ্রণে ইহার উৎপত্তি বলিয়া মনে হয়। মন্দ্র ও মধ্যস্থানের রাগিণী।
১২	সাজগিরি	না ঋা গা ঋা সা না ধ-- না ঋা গা মা--গা হ্মা পা ধা না র্সা	র্সা না দা পা ধা হ্মা গা ঋা সা	গান্ধার	নিখাদ	বক্র সম্পূর্ণ	সন্ধ্যা	দুই ধৈবত, দুই নিখাদ ও দুই মধ্যম লাগে। পূরবী ও পুরিয়ার মিশ্রণে ইহার উৎপত্তি।
১৩.	পুরিয়া কল্যাণ	সা ঋা গা হ্মা পা না ধা র্সা	র্সা না ধা পা হ্মা গা ঋা সা	পঞ্চম	ষড়জ	সম্পূর্ণ	দিবা তৃতীয় প্রহর	পুরিয়া ও কল্যাণের মিশ্র রূপ।

মারওয়া ঠাট

প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রে ইহার নাম 'গমন শ্রম' মেল। 'গমন শ্রম' কি 'গাওন-শ্রম'-এর অপ্রভ্রংশ? এ ঠাটের রাগরাগিণী গাওয়া বা আয়ত্তাধীন করা যেরূপ শ্রমসাধ্য ব্যাপার—তাহাতে এ নামের সার্থকতা কতকটা উপলব্ধি হয় বটে। পূরবী ঠাটের সঙ্গে ইহার এইমাত্র প্রভেদ যে, ইহার ধৈবত তীব্র ও পূরবীর ধৈবত কোমল। ইহাতে এই সুর লাগে :—ষড়জ, কোমল, রেখাব, তীব্র গান্ধার, তীব্র বা কড়ি মধ্যম, পঞ্চম, তীব্র ধৈবত, তীব্র নিখাদ। ইহার রাগ রাগিণীতে 'মারওয়া' রাগিণীর অঙ্গ প্রধান বলিয়া আজকাল ইহাকে 'মারওয়া ঠাট' নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

বর্তমান 'মারওয়া' ঠাটে পণ্ডিতগণ যে বারটি রাগিণীর (পুরিয়া কল্যাণ বাদ দিয়া) নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার ছয়টি রাগিণী সন্ধ্যার ও ছয়টি সকালের। পুরিয়া, মারওয়া, জয়ত, গৌরী, সাজগিরি ও বারারী সন্ধ্যার রাগিণী এবং ললিত, পঞ্চম, ভাটিয়ার, বিভাস, ভঙ্কার ও সোহিনী দিনের বা শেষ প্রহর রাত্রির রাগিণী। সঙ্গীত-শাস্ত্রে দিন বলিতে রাত্রি বারটার পর হইতে দিন বারটা পর্যন্ত বুঝায় এবং রাত্রি বলিতে দিন বারটার পর রাত্রি বারটা পর্যন্ত বুঝায়।

উপরে সপ্র্যার যে ছয় রাগিণীর উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার কতক গৌরী-অঙ্গ ও কতক পুরিয়া-অঙ্গ করিয়া গাওয়া হয়। উল্লিখিত সকালের ছয়টি রাগিণীর মধ্যে কতক ললিত-অঙ্গ ও কতক সোহিনী-অঙ্গ করিয়া গাওয়া হয়।

সন্ধ্যার রাগ রাগিণীতে পূর্বাঙ্গ প্রবল থাকে অর্থাৎ সা হইতে পঞ্চম পর্যন্ত (মুদারা গ্রামের) বেশি লাগে। সকালের রাগ-রাগিণীতে উত্তরাঙ্গ অর্থাৎ পঞ্চম হইতে তারা স্থানের সা পর্যন্ত প্রবল থাকে।

এইগুলি স্মরণ রাখিলে রাগ-রাগিণী বিশুদ্ধ করিয়া গাওয়ায় অনেকটা সাহায্য করিবে।

কাফি ঠাট হরপ্রিয়া মেল

সুর : সা রা জ্ঞা মা পা যা ণা র্সা

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
১.	কাফি	সা রা গা মা পা ধা র্ণা র্সা	র্সা না ধা পা মা জ্ঞা রা সা	পঞ্চম	ষড়জ	সম্পূর্ণ	সকল সময়	কখনো কখনো তীব্র নিখাদ ও তীব্র গান্ধার লাগানো হয়।
২.	ধানী	সা জ্ঞা মা পা ণা র্সা	র্সা ণা পা মা জ্ঞা সা	গান্ধার	নিখাদ	ওড়ব খাড়ব	সকল সময়	'সঙ্গীত পারিজাত' গ্রন্থে ইহার নাম ওড়ব ধানশ্রী বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। কোন কোন গ্রন্থে ইহার নাম খাড়ব ধানশ্রী বলিয়া কথিত হইয়াছে। ব্যবহারে কিন্তু আরোহীতে দুই ধৈবত ব্যবহার দেখা যায়। পূরা নিখাদও ব্যবহৃত হয়।
৩.	সিন্দুড়া	সা রা জ্ঞা মা পা ধা র্সা	র্সা ণা ধা পা মা জ্ঞা রা সা	ষড়জ	পঞ্চম	ওড়ব সম্পূর্ণ	সকল সময়	কেহ কেহ আরোহীতেও নিখাদ লাগান শোনা গিয়াছে।
৪.	ধানশ্রী	ণ্া সা জ্ঞা মা পা ণা র্সা	র্সা ণা ধা পা মা জ্ঞা রা সা	পঞ্চম	ষড়জ	ওড়ব সম্পূর্ণ	তৃতীয় প্রহর দিবা	গান্ধার ও পঞ্চমের সঙ্গত থাকা অতীব প্রয়োজনীয়।
৫.	ভীমপলাশী	ণ্া সা জ্ঞা মা পা ণা র্সা	র্সা ণা দা পা মা জ্ঞা রা সা	মধ্যম	ষড়জ	ওড়ব সম্পূর্ণ	তৃতীয় প্রহর দিবা	ধানশ্রী বাঁচাইয়া ইহা গাওয়া অত্যন্ত কঠিন। ধানশ্রীর বাদী পঞ্চম, ইহার বাদী মধ্যম।

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
৬.	হংস-কিঙ্কিণী	ণা সা গা মা পা না র্সা	র্সা ণা ধা পা মা জ্ঞা রা সা	পঞ্চম	ষড়জ	ওড়ব সম্পূর্ণ	তৃতীয় প্রহর দিবা	পিলু ও ধানশ্রী মিশ্রণে এই রাগিণীর উৎপত্তি বলিয়া মনে হয়।
৭	পঠমঞ্জরী	সা রা মা পা না র্সা (অথবা কোমল নি)	র্সা না (অথবা ণা) ধা পা রা মা পা রা মা বা জ্ঞা সা রা না সা	ষড়জ	পঞ্চম	ওড়ব সম্পূর্ণ	তৃতীয় প্রহর দিবা	মন্তব্যের ঘরে বিশেষ চিহ্ন দেওয়া আছে কিন্তু কোন মন্তব্য নেই।
৮.	প্রদীপ কী	না সা গা মা পা ণা র্সা	র্সা ণা ধা পা মা জ্ঞা রা সা	ষড়জ	পঞ্চম	ওড়ব সম্পূর্ণ	তৃতীয় প্রহর দিবা	আড়া ও বাগেশ্রীর মিশ্রিত চালে বা ঢং-এ গাহিতে হয়।
৯.	বাহার	না সা গা মা পা মা ধা ণা ধা না সা	র্সা ণা পা মা পা জ্ঞা মা রা সা	ষড়জ	মধ্যম	খাড়ব খাড়ব	বসন্তকাল	
১০.	নীলাম্বরী	সা রা জ্ঞা মা পা ণা র্সা	সা ণা সা পা মা জ্ঞা রা সা	পঞ্চম	ষড়জ	খাড়ব সম্পূর্ণ	তৃতীয় প্রহর	
১১.	পিলু	না সা রা জ্ঞা মা পা ধা না র্সা	র্সা ণা ধা পা মা রা সা ণা সা	গান্ধার	নিখাদ	সম্পূর্ণ	তৃতীয় প্রহর	
১২.	বাগেশ্রী	সা ণা ধা ণা সা মা জ্ঞা মা ধা ণা র্সা	র্সা ণা ধা মা পা মা জ্ঞা রা সা	মধ্যম	ষড়জ	খাড়ব সম্পূর্ণ	অর্ধেক রাত্রি	
১৩.	আড়ানা	সা রা মা পা ধা ণা পা ণা র্সা	র্সা ণা পা জ্ঞা মা রা সা	ষড়জ	পঞ্চম	খাড়ব সম্পূর্ণ	অর্ধেক রাত্রি	
১৪.	সাহানা	সা রা জ্ঞা মা পা ণা র্সা	র্সা ণা ধা পা মা পা জ্ঞা মা রা সা	পঞ্চম	ষড়জ	খাড়ব সম্পূর্ণ	অর্ধেক রাত্রি	

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
১৫.	হোসেনী কানাড়া	সা রা জ্ঞা মা পা ধা ণা র্সা	র্সা ণা ধা পা জ্ঞা মা রা সা	ষড়জ	মধ্যম	সম্পূর্ণ	অর্ধেক রাত্রি	
১৬.	নায়কী কানাড়া	সা রা জ্ঞা মা পা ণা র্সা	র্সা ণা পা মা জ্ঞা মা রা সা	মধ্যম	ষড়জ	খাড়ব	অর্ধেক রাত্রি	
১৭	কৌশী কানাড়া	সা রা জ্ঞা মা পা ধা ণা র্সা	র্সা ণা ধা পা মা জ্ঞা রা সা	মধ্যম	ষড়জ	সম্পূর্ণ	অর্ধেক রাত্রি	
১৮.	সুহা	সা রা জ্ঞা মা পা ণা র্সা	র্সা ণা পা মা জ্ঞা রা সা	মধ্যম	ষড়জ	খাড়ব সম্পূর্ণ	দ্বিপ্রহর	
১৯.	সুঘরাই	সা রা জ্ঞা মা পা ণা র্সা	র্সা ণা ধা পা মা জ্ঞা রা সা	ষড়জ	পঞ্চম	খাড়ব সম্পূর্ণ	দ্বিপ্রহর	
২০.	দেবশাখ	সা রা মা পা ণা র্সা	র্সা ণা ধা পা মা জ্ঞা রা সা	মধ্যম	ষড়জ	খাড়ব সম্পূর্ণ	দ্বিপ্রহর	
২১	মেঘ	সা রা মা পা ণা র্সা	র্সা ণা পা মা রা সা	ষড়জ	পঞ্চম	খাড়ব	বর্ষা	
২২.	সুরদাসী	সা রা মা পা না র্সা	র্সা ণা পা মা ণা ধা পা মা রা সা	মধ্যম	ষড়জ	ওড়ব খাড়ব	বর্ষা	
২৩.	মিয়া-কি-মল্লার	সা রা মা পা ণা ধা না র্সা	র্সা ণা পা জ্ঞা মা বা সা	ষড়জ	পঞ্চম	খাড়ব খাড়ব	বর্ষা	
২৪.	মধুমাধবী সারং	সা রা মা পা না র্সা	র্সা ণা পা মা রা সা	রেখাব	পঞ্চম	ওড়ব	দ্বিপ্রহর	

ক্রমিক সংখ্যা	রাগ বা রাগিণীর নাম	আরোহী	অবরোহী	বাদী সুর	সম্বাদী সুর	বর্ণ বা জাতি	গাহিবার সময়	মন্তব্য
২৫.	শুদ্ধ সারং	সা রা মা পা না র্সা	র্সা ধা ণা পা মা রা সা	রেখাব	পঞ্চম	ওড়ব খাড়ব	দ্বিপ্রহর	
২৬.	বৃন্দাবনী সারং	সা রা মা পা না র্সা	র্সা ণা ধা.পা মা রা সা	রেখাব	পঞ্চম	ওড়ব খাড়ব	দ্বিপ্রহর	
২৭.	মিয়া কা সারং	সা রা মা পা ধা না র্সা	র্সা ণা ধা পা জ্ঞা পা মা রা সা ণা ধা না সা	রেখাব	পঞ্চম	ওড়ব খাড়ব	দ্বিপ্রহর	
২৮.	লঙ্কধুন সারং	পা না সা রা জ্ঞা রা মা পা না র্সা	র্সা ণা ণা জ্ঞা মা রা সা	রেখাব	পঞ্চম	ওড়ব	দ্বিপ্রহর	
২৯.	শ্রীরঞ্জনী	সা জ্ঞা মা ধা ণা র্সা	র্সা ণা ধা মা জ্ঞা রা সা	মধ্যম	ষড়জ	ওড়ব খাড়ব	রাত্রি দ্বিপ্রহর	
৩০.	শাবন্ত সারং	সা রা মা পা না র্সা	র্সা না ধা পা মা পা রা সা	রেখাব	পঞ্চম	ওড়ব খাড়ব	দ্বিপ্রহর	
৩১.	বারোয়াঁ	সা রা মা পা ধা না র্সা	র্সা ণা ধা পা ধা মা জ্ঞা রে জ্ঞা সা	ষড়জ	পঞ্চম	ওড়ব সম্পূর্ণ	রাত্রি	
৩২	রামদাসী মল্লার	না সা রা গা মা পা জ্ঞা মা ণা পা না র্সা	র্সা ণা ধা ণা পা জ্ঞা মা রা সা	মধ্যম	ষড়জ	সম্পূর্ণ	বর্ষা	

❖ কাফি ঠাটের পরিচিতির শেষে কবি এই রাগ–রাগিণীর নামগুলি লিখে রেখেছেন, কোন মন্তব্য নেই : শিবরঞ্জনী, পঠ–দীপ, হংস–শ্রী, নাগ–ধ্বনি কানাড়া, রাজ–বিজয়, ভীম, পলাশী (ভীম–পলাশী ?), মালগুঞ্জ।

❖ কাফি ঠাটের বিবরণের শুরুতে কবি স্বরলিপি সংক্রান্ত যে মন্তব্য লেখেন সেগুলি এই : জ্ঞা=কোমল গান্ধার, দ=কোমল ধৈবত, হ্মা=কড়ি মধ্যম, ণ=কোমল নিখাদ, ঋ=কোমল রেখাব। মাথায় রেফ (́) তারা গ্রামের চিহ্ন, নিচে হসন্ত (্) উহারা গ্রামের চিহ্ন, নিচে বা উপরে কোন চিহ্ন না থাকিলে মুদারা গ্রাম বুঝিতে হইবে।

কাফি ঠাট

প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থে 'কাফি ঠাট' 'হরপ্রিয়া' মেল নামে খ্যাত। এই ঠাটে সাধারণতঃ ষড়জ, তীব্র রেখাব, কোমল গান্ধার (দুই এক স্থলে তীব্র গান্ধার), শুদ্ধ মধ্যম, পঞ্চম, তীব্র ধৈবত, কোমল নিখাদ (দুই এক জায়গায় তীব্র নিখাদ) ব্যবহৃত হয়। তীব্র মধ্যম ও কোমল ধৈবত ক্বচিত ব্যবহৃত হয়, একরূপ হয় না বলিলেই চলে। কেবল মাত্র 'মিয়া কি সারং' রাগের অবরোহীতে তীব্র মধ্যম ও 'ধানী' রাগিণীর অবরোহীতে কেহ কেহ (তাহাও সম্প্রতি) কোমল ধৈবত দুর্বল করিয়া লাগান। আজকাল ইহাকে কাফি রাগিণীর নামানুসারে কাফি ঠাট বলে। এই ঠাটের বিশেষত্ব এই যে, ইহার সকল রাগরাগিণী দিবা দ্বিপ্রহর বা রাত্রি দ্বিপ্রহরে গীত হইয়া থাকে। গান্ধার ও নিখাদ কোমল হওয়ার জন্যই এই রাগিণী দ্বিপ্রহরে গাওয়া হয়। রাত্রিতে দরবারী কানাড়া প্রভৃতি রাগরাগিণী গাওয়ার পর (যে রাগ বা রাগিণীতে কোমল ধৈবত লাগে) এই ঠাটের অর্থাৎ তীব্র ধৈবত–যুক্ত রাগরাগিণী গাওয়া উচিত। ইহাই নিয়ম। এই রূপের দিবাভাগের সকাল বেলাতেও কোমল ধৈবতযুক্ত রাগরাগিণী (যেমন আশাবরী, জৌনপুরী টোড়ি প্রভৃতি) গাহিবার পর তীব্র ধৈবত যুক্ত এই মেলের রাগরাগিণী গাওয়া উচিত। কোনো কোনো গ্রন্থে এই ঠাটকে শ্রীরাগের ঠাট বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কেননা পূর্বকালে এই ঠাটেই শ্রীরাগ গীত হইত।

'কাফি' রাগিণী

'হরপ্রিয়া' মেলের ইহা সম্পূর্ণ জাতীয় রাগিণী। ইহার আরোহী অবরোহী অত্যন্ত সরল। এই রাগিণীতে 'ন্যাস' সুর পঞ্চম অর্থাৎ পঞ্চমে আসিয়া ছাড়িতে হয়। শ্রোতারা এই 'ন্যাস' পঞ্চম সুরের জন্যই ইহাকে অনায়াসে চিনিয়া ফেলেন। আজকাল কাফি রাগিণীতে ছোট ছোট বা চুটকী গান গীত হইয়া থাকে। ইহার পঞ্চম বাদী ও ষড়্জ সম্বাদী।

আরোহী : সা রা জ্ঞা মা পা ধা ণা র্সা।
অবরোহী : র্সা ণা ধা পা মা জ্ঞা রা সা।

লক্ষণ গীত : চৌতাল

গুণী গাওত কাফি রাগ কর হরপ্রিয়া ঠাট জানেতা কোমল গা নি
ওজাবাল পরা সুয়া পঞ্চম বাদী সাধ
সরল স্বরপাদি কেশরওত মানত সব নেত অবিরুল আশেরী
সম চতর কহত।

আস্থায়ী

০	১	২	×	০	১
ণা পা	জ্ঞা -া	সা সা	জ্ঞা -া	মা পা	-া মা
গু ণী	গা ০	ও ত	কা ০	ফি রা	০ গ
র্সা রা	র্সা ণা	ধা পা	জ্ঞা -া	রা সা	রা সা
ক র	হ র	প্রি য়া	ঠা -০	ঠ জা	ন ত
সা সা	রা রা	জ্ঞা জ্ঞা	মা মা	পা পা	ধা ধা
কো ০	ম ল	গা নি	ও ০	জা বল্	ণ রা
ণা র্সা	ণর্সা র্রা	র্সা ণা	ধা -া	মা পা	-া পা
সু রা	পন্ আন্	চ ম	বা ০	দী সা	০ ধ

অন্তরা

মা মা	মা পা	ণা -া	র্সা না	র্সা -া	র্সা র্সা
স র	ল স্ব	র ০	পা দি	পা ০	কেশ্ রা ত্

ণা র্সা	র্রা র্জ্ঞা	র্রা র্সা	র্রা ণা	র্সা ণা	ধা ধা
মা ০	ন ত	স ব	নে ত	অ বি	ক ল
র্সা -া	ণা ধা	মা পা	জ্ঞা জ্ঞা	রা সা	রা সা
আ ০	শে রী	স ম	চ ত	র ক	হ ত

ধানী

'ধানী' কাফি ঠাটের ওড়ব রাগিণী। ইহা রেখাব ও ধৈবত বর্জিত। গান্ধার ইহার বাদী সুর, নিখাদ সম্বাদী। 'সঙ্গীত পারিজাত' গ্রন্থে ইহার নাম ওড়ব-ধানশ্রী বলিয়া লিখিত আছে। অন্য এক বিখ্যাত প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থে ইহা খাড়ব-ধানশ্রী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ধানশ্রী হইতে পৃথক করিবার জন্য পণ্ডিতগণ ইহার নাম ধানী রাখিয়াছেন। যাঁহারা খাড়ব-ধানশ্রী বলিয়া মানেন তাঁহারা তীব্র ধৈবত (কেহ কেহ দুই ধৈবত) লাগাইয়া থাকেন। যে সব রাগিণী লইয়া নানা তর্ক-বিতর্কের উদ্ভব হয় তাহা প্রচলিত রীতি অনুসারে অর্থাৎ 'রেওয়াজ' দেখিয়া গাওয়াই উচিত। এই রাগিণীতে ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চম সুর দুর্বল এবং রেখাব ও ধৈবত বিবাদীবা বর্জিত হওয়াতে ইহার স্বভাব অত্যন্ত চঞ্চল অর্থাৎ কোথাও স্থায়ী হইবার অবকাশ পায় না। আরোহী :—সা জ্ঞা মা পা ণা র্সা। অবরোহী : র্সা ণা পা মা জ্ঞা সা।

লক্ষণ গীত—তেতালা

আস্থায়ী : তুহে ধানী কহুঁ সমঝায়ে সখি উডো-সম্মত ধমাশী সখি।
অন্তরা : কর হরপ্রিয়া আহোবস কহে সুন্দর-(গান অংশ) রহেতো ধা গা মান সখি।
(- ই তু হে)

আস্থায়ী

	০	১	×	৩
ণ্ সা	জ্ঞা -া জ্ঞা জ্ঞা	জ্ঞা সা জ্ঞা মা	পা ণা পা পা	জ্ঞা -া জ্ঞা মা
তু হে	ধা ০ নী ক	হুঁ ০ স ম	ঝা ০ এ স	খি ০ উ ০
	পা পা পা পা	পা পা জ্ঞা মা	পা ণা পা পা	মজ্ঞা -া ণ্ সা
	ডো ০ স ন্	ম ত ধন আন	না ০ সি স	খি ০ তু হে

অন্তরা

মা মা মা মা	পা পা না না	র্সা র্সা র্সা র্সা	না র্সা র্সা র্সা
ক র হ র	প্রি য়া আ হো	ব ল ক হে	সু ০ ন্দ র
র্সা -া ণা ণা	পা পমা মজ্ঞা মা	পা ণা পা পা	জ্ঞা -া ণ্ সা
গান আন শ র	হে তা ধা গা	মা ০ ন স	খি ০ তু হে

সৈন্ধবী বা সিন্দুড়া

সৈন্দরী রাগিণীকে গীত-শিল্পীরা সাধারণত 'সিন্দুড়া' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। ইহা কাফিঠাটের ওড়ব-সম্পূর্ণ রাগিণী। ইহার আরোহীতে গান্ধার ও নিখাদ বর্জিত হইয়া যাইবে। অবরোহীতে ইহা সম্পূর্ণ। এই রাগিণীতে ষড়জ ও পঞ্চম বাদীসম্বাদী কেহ কেহ রেহাব ও ধৈবতকে বাদী সম্বাদী মানিয়া থাকেন। বর্তমানে প্রচলিত রীতি অনুসারে এই রাগিণীর অবরোহণে নিখাদ বর্জিত করা হয় না। নিখাদ দুর্বল করিয়া অবরোহণে লাগাইলে দোষ হয় না। রাগিনী জাতিভ্রষ্টাও হয় না। ইহাই প্রধান গুণীজনের মত। সঙ্গীতাচার্য্য সোমনাথ পণ্ডিত এই রাগিণীতে গান্ধার ও নিখাদ বর্জন করিতে বলিয়াছেন। ... ... এই রাগিণীকে অবরোহণে সম্পূর্ণ জাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। গায়কগণ প্রায়শই সিন্দুড়া গাহিতে হইলেই ইহার সহিত কাফি মিলাইয়া দেন। আশাবরী রাগিণীরও আরোহণ গান্ধারও নিখাদ বর্জ্জিত কিন্তু আশাবরীতে ধৈবত কোমল, সৈন্ধবীর ধৈবত তীব্র। ভৈরব রাগে গান্ধার ও নিখাদ বর্জ্জিত হইলে গুণকেলি রাগিণীর উৎপত্তি হয়। তবে অস্থায়ী ও রেখাব ও ধৈবত কোমল—সিন্ধুড়ীর রেখাব ও ধৈবত তীব্র। বেলাওল ঠাটে গান্ধার নিখাদ বর্জন করিলে দুর্গা রাগিণীর সৃষ্টি হয়। কিন্তু দুর্গা মানেই সম্পূর্ণ নয় ... ঠাটে গান্ধার নিখাদ বর্জিত হইলে শুদ্ধ মল্লার রাগিণীর রূপ পাওয়া যায়। ইহা সহসা স্মরণযোগ্য। কাজেই দেখা যাইতেছে প্রচলিত দক্ষিণী ঠাটের অবরোহীতে গান্ধার নিখাদ সহসা রাগ রাগিণী সৃষ্টির পক্ষে বলিষ্ঠভাবে বহু রাগ রাগিণীর উৎপত্তি হয়।

আরোহী : সা রা মা পা ধা র্সা।

অবরোহী : র্সা ণা ধা পা মা জ্ঞা রা সা।

লক্ষণগীত—তেতলা

আস্থায়ী : বে ঠাসা বিশালবক্ষ চতুরবুজা এক দন্ত লখোদর হরপ্রিয়া

অন্তরা : সিন্ধুর বদনা মুষিক রাহনা ঋদ্ধ সিদ্ধ কে দায়ক গুণ-নায়ক

সা রে মা রে মা পা ধা মা পা ধা রে সা নি ধা পা ধা।।

আস্থায়ী

								৩				০			
মা	মা	পা	ধা	র্সা	ধা	ধা	ধা	সা	ণা	ধা	পা	মা	জ্ঞা	-া	রা
বে	ধা	না	বে	না	০	শ	না	০	চ	ত	র	ভু	কা	০	এ
-া	মা	জ্ঞা	-া	জ্ঞা	রা	-া	সা	-া	রা	সা	র্সা	না	ধা	পা	ধা
০	ক	দন্	০	ত	লম	০	বো	০	দ	র	হ	র	০	প্রি	য়া

অন্তরা

মা	-া	পা	ধা	র্সা	ধা	র্সা	-া	র্রা	র্জ্ঞা	র্রা	র্সা	র্রা	র্রা	র্সা	র্রা
শিব্	০	দু	র	ব	দ	না	০	মূ	০	ষি	ক	বা	হ	না	ঋ

+								৩				০			
র্সা	ধণা	পা	জ্ঞা	-া	জ্ঞা	-া	রা	জ্ঞা	-া	রা	সা	রা	-া	সা	সা
দ্দ	মি	দ্ধ	কে	০	পা	০	য়	ক	০	ও	ণ	না	০	য়	০
সা	রা	মা	রা	মা	পা	ধা	মা	পা	ধা	র্রা	র্সা	ণা	ধা	পা	ধা
সা	রে	সা	রে	মা	পা	ধা	মা	সা	ধা	রে	সা	নি	ধা	পা	ধা

ধানশ্রী

ধানশ্রী কাফি ঠাটের ভড়ব-সম্পূর্ণ জাতীয় রাগিণী। ইহার আরোহীতে রেখাব ও ধৈবত বিবাদী। অবরোহীতে ইহা সম্পূর্ণ। পঞ্চম বাদী ও ষড়জ সম্বাদী। দিবাভাগের তৃতীয় প্রহরে এই রাগিণী গাহিবার সময়। ইহার গ্রহ সুর নিখাদ ও ন্যাস-সুর পঞ্চম। এই রাগিণী অবরোহণে পঞ্চম ও গান্ধারের সঙ্গত বা আত্মীয়তা অতিশয় শ্রুতি-সুখকর। মধ্যম সুর জায় বা বাদী করিলে এই সুরই ভীমপলশ্রী হইয়া যাইবে। ভীমপলশ্রীর আরোহীতেও রেখাব ও ধৈবত বর্জিত হইয়া যাবে। কিন্তু মধ্যম বাদী, ধানশ্রীর ... পঞ্চম বাদী নহে।

তৃতীয় প্রহরের রাগিণীতে প্রায়ই রেখাব দুর্বল হইয়া থাকে। সুরস্রষ্টারা এই নিয়মের ব্যতিক্রম করেন নাই বলিলেই হয়। যে রাগ-রাগিণীতে রেখাব ও ধৈবত দুর্বল হয় সেই রাগ রাগিণীতে গুণীগন 'সা মা পা' র আলাপ অত্যন্ত বেশীভাবে করিয়া থাকেন। ধানশ্রী ও ভীমপলশ্রীতে এই নিয়মে বাড়বের কাজ অত্যন্ত মিষ্ট শুনায়। আহোবল পণ্ডিত বলেন বাকি ঠাটের আরোহণে রেখাব ধৈবত বর্জন করিলে ধানশ্রী হয়। সারামৃত গ্রন্থে ধানশ্রী কাফিঠাটে রেখাব, ধৈবত অবরোহণে বর্জন করিয়া ওড়ব জাতীয় বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা গাহিবার সময় সকাল বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। কোনো কোনো পণ্ডিত ধানশ্রীকে পূরবী ঠাটের অবরোহীতে রেখাব ধৈবত বর্জিত করিয়া লিখিয়াছেন— ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজনীয়। সোমনাথ পণ্ডিত বলেন, এই রাগিণীতে যখন রেখাব ধৈবত বর্জিত হয় এবং ষড়জবাদী ও পঞ্চম সুর গমকে গীত হইয়া থাকে তখন ইহাকে ধবলশ্রী বলা হয়। অবশ্য, আমাদের মতে ধানশ্রীতে ধৈবত ও রেখাব বিবাদী ত নয়ই। বরং সম্বাদী অসম্বাদী সুর এবং পঞ্চম বর্জিত মধ্যমবাদী। সঙ্গীত-সম্রাট – বাদল খাঁ সাহেব ও তঁহার বিখ্যাত শিষ্যগণ ধানশ্রীতে কোমল নিখাদ ব্যবহার না করিয়া তীব্র নিখাদ (আরোহণ ও অবরোহণ) ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু অনেক গুণীর মতে তখন ইহা 'পঠ-দীপ' হইয়া যায়।

বাঙলাদেশে প্রচলিত ধানশ্রী (বাদল খাঁ সাহেব ও তাঁহার শিষ্যগণ অনুসারে) পশ্চিমে গাহিলেই 'পাঠ-দীপ' বলেন, আরে ইহা বহু শ্রেষ্ঠ খেয়ালীর নিকট শুনিয়াছে। খৈয়াজ খাঁ, খান সাহেব আবদুল করিম খাঁ বন্দে হোসেন খাঁ শ্রীকৃষ্ণ ... ... খণ্ডে ... ... প্রভৃতিরও এই মত।

আরোহী : ণা সা জ্ঞা মা পা — ণা র্সা।

অবরোহী : র্স ণা ধা পা মা জ্ঞা রা সা।

লক্ষণ গীত—চৌতাল

আস্থায়ী : শাস্তর সম্মত বাগ গায়ে ওড়ো পূরণ বসায়ে হরপ্রিয়া সুর মেল সাধ রিধা বর্জত নেত দেখায়ে

অন্তরা : পঞ্চম বার বাদী করত ধনালীওনী বারমত ভীম পলাসী মুঁ চতর বাদীমধ্যম কহায়ে।

আস্থায়ী

×	০	১	০	১	২
ণা –া	পা পা	সা পা	জ্ঞা মা	জ্ঞা রা	–া সা
শা ০	স সু	ম ত	রা ০	গ সা	০ য়ে
ণা –া	সা সা	জ্ঞা মা	পা পা	ণা ধা	া পা
ও ০	তে ০	পু ০	র ন	র না	০ য়ে
পা পা	জ্ঞ মা	পা পা	র্সণা –া	র্সণা র্সা	–া র্সা
ব র	প্রি য়া	সু র	মে ০	ল সা	০ ধা
র্সা ণা	ধা পা	মজ্ঞা পা	জ্ঞা মা	জ্ঞা রা	–া সা
রি ধা	ব র	জ্জ ত	নে ত	দে খা	০ য়ে

অন্তরা

পা –া	পা পা	জ্ঞা মা	পা পা	ণা র্সা	র্সা র্সা
পা ০	চ ম	য ব	বা	দী ক	র ত
ণা –া	র্সা ণা	র্জ্ঞর্রা র্সা	র্রা র্সা	ণা ধা	পা পা
ধা ০	ন্ন ০	স্পী ০	গু নী	বা র	ণ ত
মা পা	ণা র্সা	র্মর্জ্ঞা –া	র্মা র্পা	র্মা র্জ্ঞা	র্রা র্সা
ভী ০	ম প	লা ০	নী ০	মু চ	ত র
র্সা –া	ণধা পা	জ্ঞা –া	পা সা	মা জ্ঞা	রা সা
বা ০	দী ০	ম	ধ্য ম	ক হা	০ য়ে

ভীমপলশ্রী

ভীমপলাশী কাফি ঠাটের ভড়ব-সম্পূর্ণ রাগিণী। ইহার আরোহীতে রেখাব ও ধৈবত বর্জিত হইয়া থাকে। মধ্যম সুর বাদী। গ্রহ ও ন্যাসের সুরও ইহাই। গাহিবার সময় দিবা তৃতীয় প্রহর। মধ্যম সুর বাদী হওয়ায় ইহা ধানশ্রী হইতে পৃথক, এবং অবরোহণে ইহা

সম্পূর্ণ বলিয়া ধানীও হইতেই স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া থাকে। আরোহীতে গান্ধার ও নিখাদ থাকায় সৈন্ধবী হইতেও ইহা স্বতন্ত্র। এক মতে ইহাও লিখিত আছে যে, ভীমপলশ্রীর ধৈবত ও রেখাব কোমল, আবার অন্যমতে ইহাতে রেখাব বিবাদী করিলে অর্থাৎ একেবারে বর্জিত করিলে ইহা ধানশ্রী হইতে একেবারে পৃথক হইয়া যাইবে। তবে এ মত প্রচলিত নয় অন্ততঃ উত্তর ভারতীয়-সঙ্গীতে।

আরোহী : ণ্া সা জ্ঞা মা—পা ণা র্সা।

অবরোহী : র্সা ণা ধা পা মা—জ্ঞা রা সা।

লক্ষণগীত—তেতালা

আস্থায়ী : মানত সব ভীমপলাশী ওডো সম্পূরণ ছাস্তরী দহানাকো আধি রু হেয়।

অন্তরা : সুর বাদী করে মধ্যম কো চতর গুণী সব ধানশ্রী কো বচায়ে।

আস্থায়ী

	০	১	×	৩
মা ধমা	মা জ্ঞা রা সা	রা ণ্া ণ্া ণ্া	সা -া -া মা	মা -া -া জ্ঞা
মা ০	ন ত স র	ভী ০ ম প	লা ০ ০ শী	০ ০ ০ ০
	ণ্া সা জ্ঞা মা	পা পা -া পা	-া মা -া পা	মা র্সা-া ণা
	ও ০ ০ ০	ভ ব ০ সম্	০ পু ০ র	ণ ছাব ০ ত
	র্সা র্রা র্সা ণা	-া ধা -া পা	-া মা -া সা	-া জ্ঞা
	মি ধা না কো	০ আ ০ খি	০ রো ০ হেয়	০ ০

অন্তরা

×	৩	০	১
		র্স	
র্সা র্সা ণা ণা	-া ণা ণা ণা	ণা -া র্সা -া	ণা ধা পা -া
সু র ০ বা	০ দী ০ ক	রে ০ ম ০	ধ ম কো ০
পা মা জ্ঞা সা পা	পা ণা র্সা র্সা	-া র্রা -া র্সা	ণা পধা -পা
চ ত র গু	ণী ০ স ব	০ ধ না ০	সে রি ০ কো

-া ধপপা পা পা মা -া জ্ঞা

০ বা ০ চা ০ য়ে

হংস—কিঙ্কিণী

ইহা কাফি ঠাটের ওড়ব সম্পূর্ণ জাতীয় রাগিণী। আরোহীতে রেখাব ধৈবত বর্জিত হইয়া থাকে। অবরোহী সম্পূর্ণ। ধানশ্রী সঙ্গে এই রাগিণী গীত হইলে অত্যন্ত মধুর শোনায়। এই রাগিণীতে দুই গান্ধার যে ভাবে লাগানো হয়, তাহাতে ইহার মনোহারিত্ব শতগুণে বাড়িয়া যায়। আরোহীর গান্ধার তীব্র, অবরোহণে কোমল। নিখাদও আরোহীতে তীব্র, অবরোহণে কোমল। পঞ্চম বাদী সুর। এই রাগিণীতেও ষড়জ মধ্যম ও পঞ্চম সুরকে লইয়া 'বাড়তের' কাজ করা হয়। কর্ণাট ও কাফি এই দুই ঠাট মিলিয়া এই রাগিণীর উৎপত্তি হইয়াছে। এই মধুর রাগিণী কেন যে জনপ্রিয় হয় নাই, বলা দুষ্কর। সত্যকার গীত-শিল্পী ও সুর-অভিজ্ঞের কাছে খুব পীড়াপীড়ি করিলে এই রাগিণী শোনা যায়।

আরোহী : ণ্া সা গা মা—পা না র্সা।

অবরোহী : র্সা ণা ধা পা—মা জ্ঞা রা সা।

লক্ষণগীত—ঝাঁপতাল

আস্থায়ী : ধানা হন্‌স্‌-কঙ্কনী আত আত চেতর রাগিণী।

অন্তরা : কর্ণাট সুর শুক্ল শুদ্ধ মেল শুন মেলায়ে পঞ্চম করত বাদী চতর গুণ সাধনী।

আস্থায়ী

×		৩			০		১		
					ব				
গা	গা	মা	-া	পা	জ্ঞা	-া	রা	সা	-া
ধা	না	হ	ন্	স	ক্যঙ্	০	ক	ণী	০
ন্া	ন্া	সা	গ্া	মা	প	-া	পা	মা	গা
আ	ত	চে	০	তর	রা	০	গি	ণী	০

অন্তরা

মা	পা	না	-া	না	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা
ক	র	না	০	ট	সু	র	সু	ক	ল
মা	পা	না	র্সা	জ্ঞা	র্রা	র্সা	ণা	ধা	পা
শু	ধ	মে	০	ল	শুন্	মে	লা	০	য়ে
পা	ণা	ধা	পা	মা	গা	গা	মা	-া	মা
পন্	০	চ	ম	ক	র	ত	বা	০	দী
সা	সা	গা	গা	মা	পা	মা	পা	মা	গা
চ	ত	র	গু	ণ	সা	০	ধ	নী	০

পঠ-মঞ্জরী

পঠ-মঞ্জরী কাফি ঠাটের সম্পূর্ণ রাগিণী। তবে, আরোহণে ধৈবত গান্ধার লাগিলেও অত্যন্ত দুর্বল অর্থাৎ ঈষৎ ছোঁওয়া মাত্র লাগিয়া থাকে। এই রাগিণী অত্যন্ত মধুর হইলেও ইহা এক প্রকার অপ্রচলিত রাগিণী। ইহার নামের মতই এই রাগিণী সুখ-শ্রাব্য। পঠ-মঞ্জরী মানে প্রথম মঞ্জরী। প্রথম মঞ্জরীর মতই ইহার রূপ গুণ ও আকর্ষণী শক্তি। বাংলাদেশে একমাত্র কীর্তনে পঠ-মঞ্জরী শোনা যায়। তবে, উচ্চাঙ্গের কীর্তনেই (গরাণহাটী ও মনোহর সাঁই-এ) ইহার সমধিক প্রচলন দেখা যায়। রেনেটী ঢং-এর কীর্তনে ইহার মিশ্রণ আভাস মাত্র শুনিয়াছি। গান্ধার ধৈবত দুর্বল হওয়ার আরোহণে ইহা কিঞ্চিৎ সারং-এর আভাস আনে। কিন্তু সারং-রাগে গান্ধার ধৈবত একেবারেই বিবাদী। ষড়্জ বাদী ও পঞ্চম ইহার সম্বাদী সুর। সারং-এর পর এই রাগিণী কেবল শুদ্ধ সুর দিয়া গীত হইয়া থাকে। কিন্তু অবিকৃত সুর দিয়া যে পঠ-মঞ্জরী গাওয়া হয়—তাহা বেলাবল ঠাটের এবং তাহার প্রকৃতিও কাফি ঠাটের পঠ-মঞ্জরী হইতে অনেকটা ভিন্ন। কাফি ঠাটের পঠ-মঞ্জরী গাহিবার সময় দিবা তৃতীয় প্রহর। এই রাগিণীর ষড়জ হইতে পঞ্চম পর্যন্ত বিন্যাসের কাজ অনেকটা দেশী টোড়ীর মত এবং পঞ্চম হইতে তারা গ্রামের গান্ধার পর্যন্ত প্রায় পঠ-দীপের মত। এইটুকু স্মরণ রাখিলে এই রাগিণী বিশুদ্ধ ভাবে গাওয়া যাইতে পারে। তবে কোমল নিখাদও ইহাতে লাগে-পঠ-দীপে কোমল নিখাদ লাগে না। কোমলে নিখাদ লাগাইবার ঢং ধানশ্রীর মত। দেশী হইতে ইহার পার্থক্য এই যে, দেশীতে কোমল ধৈবত বা কাহারও মতে দুই ধৈবত লাগে কিন্তু পঠ-মঞ্জরীতে কেবল তীব্র ধৈবত লাগে এবং এ ধৈবতও দুর্বল। এই রাগিণীতে বাড়তের কাজের সময় ধৈবত খুব কম ব্যবহার করিয়া কতকটা সারং-এর আভাস আনিয়া দেশী হইতে বাঁচাইতে হয়। ইহাতে দুই নিখাদই ব্যবহৃত হয়।

আরোহী :—সা রা মা পা না র্সা।

অবরোহী : র্সা না ধা পা মা ণা ধা পা রা মা পা রা মা রা জ্ঞা সা রা ন্‌া সা।

লক্ষণ-গীত—তেতালা

আস্থায়ী : কর হরপ্রিয়াকে মেল মু সা মা সম্বাদী সুর করে

অন্তরা : আরোহণ ধা গা মান বরজ সুর রাগ জানতে পঠমঞ্জরী বিচারি লিয়ে॥

আস্থায়ী

০	১	×	৩
জ্ঞা -া সা না	ম্‌া প্‌া ন্‌া সা	জ্ঞা -া রা -া	না -া রা -া
ক ০ র ০	হ র প্রি য়া	কে ০ মে ০	ল ০ মু ০
সা সা রা মা	রা মা মা পা	না পা রা জ্ঞা	রা -া ন্‌া সা
সা মা স ম	বা ০ দী ০	সু র ক ০	র ০ ল য়ে

অন্তরা

সা মা মা পা   ন্‌া না র্সা র্সা   না র্সা র্রা র্সা   ণা পা র্রজ্ঞর্রা নর্সা
আ রো হ ণ   ধা গা মা ০   ন ব র জ   স্ র রা ০

মসমা
র্সা র্রা ণা র্সা   না ধা পা মা   মা পা ণা পা   রা জ্ঞরা ন্‌া সা
গ জা ন ত   প ঠ ম ন   জ রী বি চা   রি ০ লি য়ে

বাংলা : আমি পথ-মঞ্জরী

প্রদীপ কি

প্রদীপ কি কাফি ঠাটের ওড়ব-সম্পূর্ণ জাতীয় রাগিণী ; ইহারও আরোহণে রেখাব ধৈবত বর্জ্জিত ও অবরোহণে সম্পূর্ণ জাতীয়। ষড়জ বাদী, পঞ্চম সম্বাদী। 'পঠ-মঞ্জরী' গাহিবার পর যখন এই রাগিণী গীত হয় তখন ইহা অত্যন্ত মধুর শোনায়। মন্দ্রস্থান ও মধ্যস্থানের সুরে ইহা গাহিলে ইহাকে ভীমপলশ্রী বলিয়া কতকটা সন্দেহ হয়, কিন্তু ভীমপলশ্রীর বাদী গ্রহ ও ন্যাস সুর মধ্যম, কিন্তু ইহার বাদী সুর ষড়জ। সঙ্গীত গ্রন্থে ইহার আরোহীতে রেখাব বর্জিত বলিয়া লিখিত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রেখাব বর্জিত নয়, অন্তত গীত হইতে শুনি নাই, তবে রেখাব দুর্বল। ধানশ্রীতে রেখাব যেমন পরিস্ফুট, ইহার রেখাব সেরূপভাবে লাগে না, একটু স্পর্শ করিয়াই অন্য সুরে চলিয়া যায়। ইহাতে দুই গান্ধার লাগে।

আরোহী : ণ্‌া সা মা গা—পা ণা র্সা।
অবরোহী : র্সা ণা ধা পা মা—জ্ঞা রা সা।

লক্ষণ-গীত—তেতালা

আস্থায়ী : প্রদীপ কি সুরত এয়সি বনি জব দোনো গান্ধার করত মনোরঞ্জন ধনাশী অঙ্গ সাজত ধানী।
অন্তরা : আরোহণ রে ধা বিন্ সব সম্মত রঞ্জনী রোহনী রে ধা কো ও সমজত মধ্যম বাদী শুনতে চমকত করত বচায়ে পলাশী গুণী পর॥

আস্থায়ী

০ ১ + ৩
পা পা জ্ঞা -া রা সা   -া সা সা রা   ণ্‌া -া সা সা   সা -া সা সা
প র দী ০ প কী   ০ সু র ত   এ য়্ সি ব   নি ০ জ ব

ণা সা গা মা	পা -া পা পা	ধা পা মা মা	মগা পা মা মা
দো ০ নো গান	ধা ০ র ক	র ত ম নো	র ন্ জ ন
র্সা -া র্সা -া	ধা -া পা পা	ধা পা মা গা	মগা মা পা পা
ধ না ০ ০	শী ০ অ ঙ্গ	স জ ত ধা	নি ০ প র

অন্তরা

পা -া পা -া	মা মা গা মা	পা পা ণা ণা	র্সা -া র্সা র্সা
আ ০ রো ০	হ ণ রে ধা	বি না স ব	স ন্ ম ত
র্সাণা -া ণা ণা	র্সা -া র্সা র্সা	র্সর্জ্ঞা র্জ্ঞা র্রা র্সা	ণা ধা পা পা
র ণ জ নী	রো ০ হ নী	রে ধা কো ০	স ম জ ত

প্রদীপকি

০	১	+	৩
ণা সা গা মা	পা -া পা -া	ধা পা মা মা	গা পা মা মা
ম ০ ধ্য ম	বা ০ দী ০	সু ০ নে ত	চ ম ক ত
র্সা র্সা র্সা র্সা	ধা -া পা পা	ধা পা মা গা	গা মা পা পা
ক র ত বা	চা ০ য়ে প	লা ০ শী ও	নী ০ প র

বাহার

বাহার কাফি ঠাটের খাড়ব জাতীয় রাগিণী। এ রাগিণী গ্রন্থোক্ত নয়, নব সৃষ্টি। ষড়জ বাদী ও মধ্যম সম্বাদী। ইহা বসন্ত ঋতুর রাগিণী। ধৈবত ও মধ্যমের সঙ্গত ইহার বিশেষত্ব। আরোহীতে রেখাব ও অবরোহণে ধৈবত বর্জিত করিয়া গাহিতে হয়। আরোহীর যেখানে মধ্যম ও ধৈবতের সঙ্গত হয় সেখানে খানিকটা বাগেশ্রীর মত শোনায়। তেমনি অবরোহণে যখন ধৈবত বর্জিত করা হয়, তখন অনেকটা আড়ানার মত শোনায়। কিন্তু আড়ানায় ধৈবত কোমল (আশাবরী ঠাটের)। বাহারের ধৈবত তীব্র। বহু রাগরাগিণীতে বাহার জুড়িয়া দেওয়া হয়। এর 'মেজাজ' বা স্বভাব চঞ্চল, এই জন্য এ রাগিণী মধ্যম বা দ্রুত লয়ে গাওয়া উচিত। লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে দুই ধৈবত দিয়া এই রাগিণী গাওয়া হয়। যেমন : র্রা র্সা দা ণা পা ধা পা ধা পা মা পা জ্ঞা মা রা সা।

আরোহী : ণা সা জ্ঞা মা পা—ধা ণা ধা না র্সা।

অবরোহী : র্সা ণা পা মা পা—জ্ঞা মা রা সা। এই রাগিণীতে দুই নিখাদ ব্যবহৃত হয়।

লক্ষণ গীত—তেওরা (দ্রুত লয়)

আস্থায়ী : কহত রাগ বাহার গুণী জন কোমল করত গা নি ধৈরজ কো খরজ মধ্যম অংশ সমজত মেল কর্ কর হার

অন্তরা : বাগেশ্রী মলার শুন মেলত নি সা রে নি পা গা গা মা রে রে সা সা সুর আড়ানা বিচ চমকত চতর কহে মন হার॥

আস্থায়ী

×			১		২		×			১		২	
							ণ						
ণা	ণা	পা	মা	পা	জ্ঞা	মা	ধা	-া	ধা	না	র্সা	র্রা	র্সা
ক	হ	ত	রা	০	গ	রা	হা	০	র	গু	ণী	জ	ন
							ম	ম					
র্সা	-া	র্সা	ণা	পা	মা	পা	জ্ঞা	জ্ঞা	মা	রা	রা	সা	-া
কো	০	ম	ল	ক	র	ত	গা	নি	সু	র	ন	কো	০
সা	মা	মা	মা	পা	জ্ঞা	মা	ধা	ধা	না	র্সা	না	র্সা	র্সা
খ	র	জ	ম	০	ধ	ম	অ	ন্	শ	স	ম	জ	ত
র্সা	-া	র্সা	র্রা	র্রা	র্সা	র্র্সা	র্সা	ণা	ধা	না	র্সা	র্রা	র্সা
মে	০	ল	ক	র	ক	র	হা	০	র	গু	ণী	জ	ন

অন্তরা

জ্ঞা	জ্ঞা	মা	ধা	ধা	না	না	র্সা	-া	না	র্সা	না	র্সা	র্সা
বা	০	গে	শে	স্রী	ম	০	লা	০	র	শুন্	মে	ল	ত
না	র্সা	র্রা	না	র্সা	ণা	পা	জ্ঞা	জ্ঞা	মা	রা	রা	সা	সা
নি	সা	রে	নি	সা	নি	পা	গা	গা	মা	রে	রে	সা	সা
মা	মা	মা	পা	-া	জ্ঞা	মা	ধা[ণি]	-া	না	র্সা	না	র্সা	র্সা
সু	র	সা	ড়া	০	না	০	বি	০	চ	চ	ম	জ	ত
র্সা	-া	র্সা	র্রা	-া	র্সা	র্সা	ণা[র্স]	-া	ধা	না	র্সা	র্রা	র্সা
চ	ত	র	কে	০	ম	ন	হা	০	র	গু	ণী	জ	ন

নীলাম্বরী

'নীলাম্বরী' কাফি ঠাটের খাড়ব-সম্পূর্ণ রাগিণী। পঞ্চম বাদী—এই রাগিণীতে ষড়্জ পঞ্চমের সঙ্গত থাকে। গান্ধার কম্পব—ইহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা কর্তব্য। পণ্ডিতগণ বলেন, ইহার আরোহীতে ধৈবত বর্জিত করিয়া গাহিতে হয়। ইহার আরোহীতে বহু গুণী গায়ক তীব্র গান্ধার লাগাইয়া থাকেন। যদি ঠিক ভাবে তীব্র গান্ধার লাগানো যায় তাহা হইলে ইহার রূপ বিকৃত হয় না। মধুমাত ও ভীমপলাশীর মিশ্রণে এই রাগিণীর উৎপত্তি। এ রাগিণী প্রায় অপ্রচলিত। আরোহী : সা রা জ্ঞা মা পা ণা র্সা। অবরোহী : র্সা ণা ধা পা মা জ্ঞা রা সা।

লক্ষণ গীত—তেওড়া (দ্রুত লয়)

আস্থায়ী : চতর গুণী বর রাগ বরণত নীলাম্বরী কো সম্পূরণ সুর সদা চপলা।
অন্তরা : ঠাট কর হর পাঁনশ মনহর তজত অনুলোম গাত ধৈবত সঙ্গত সা পা যুগল মত গা আহত সুখদা।

আস্থায়ী

×	১	২	×	১	২
পা পা পা	দা পা	মা গা	যা -া পা	মা পণা	জ্ঞা রা
চ ত র	গু ণী	ব র	রা ০ গ	ব র	ণ ত
রাজ্ঞা জ্ঞা মজ্ঞা	রা রা	সা -া	ণাঃ সা সা	গা মা	পা পা
নী লা ০	ম বরী	কো ০	স ০ ম্পূ	র ণ	সু র
পা পা -া	জ্ঞা জ্ঞা	মা -া,			
স দা ০	চ প	সা ০			

অন্তরা

মা -া মা	পা পা	না না	র্সা -া র্সা	না না	র্সা র্সা
ঠা ট	ক র	হ র	পাঁ সন্ স	স ন	হ র
র্সা রা র্সা	র্রা র্রা	র্সা -া	না না র্সা	ণা -া	পা পা
ত তা ত	স নু	লো ০	ম গা ত	ধৈ ০	ব ত

পা	ধ	পা	মা	জ্ঞা	মা	-া	পা	র্সা	র্সা	ণা	ধা	পা	-া
স	ং	গ	ত	সা	পা	০	যু	গ	ল	ম	ত	সা	০
পা	ধা	পা	সা	খা	মা	-া							
সা	হ	ত	সু	খ	দী	০							

হোসেনী কানাড়া

কাফি ঠাটের সম্পূর্ণ রাগিণী। এ রাগিণীও নূতন সৃষ্টি। কবি আমীর খসরু এই রাগিণীর স্রষ্টা বলিয়া কথিত আছে। এ রাগিণীও প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থে নাই। যেমন আড়ানা মধ্যম হইতে আরম্ভ করিয়া গাহিতে হয় তেমনি হোসেনী কানাড়ারও গ্রহ সুর মধ্যম। আড়ানা হইতে ইহাতে কানাড়ীর অঙ্গ বেশি। আড়ানা, মেঘ, হোসেনী, সাহানা, সুহা, সুখরাই, সুর মল্লার (এই সব)—রাগিণীতে সারঙ্গের অঙ্গ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ইহাতে কিন্তু কানাড়ার অঙ্গই প্রধান হইয়া উঠে। তারার ষড়জ ইহার চমৎকারিত্বের অন্যতম সহায়ক। ধৈবত গান্ধারের ব্যবহারের বিশেষ প্রণালীই। (অধিকত্ব বা স্বল্পত্ব) এই রাগিণীকে কানাড়া-জাতীয় অন্য রাগিণী হইতে পৃথক করে। 'রাগ-লক্ষণ' গ্রন্থে হোসেনী কানাড়ার আরোহী সম্পূর্ণ ও অবরোহীতে নিখাদ বর্জিত বলিয়া লিখিত হইয়াছে। অন্য এক গ্রন্থে ('সারামৃত') আরোহী অবরোহী দুই সম্পূর্ণ বলিয়া লিখিত হইয়াছে, ষড়জ, বাদী ও পঞ্চম সম্বাদী।

আরোহী : সা রা জ্ঞা মা পা ধা ণা র্সা। র্সা ণা ধা পা জ্ঞা মা রা সা।

নায়কী কানাড়া

কাফি ঠাটের খাড়ব রাগিণী। আরোহণ ও অবরোহণে ধৈবত বর্জিত। এই রাগের পূর্বাঙ্গ 'সুহা'র মত মনে হয়। উত্তর-অঙ্গ সারঙ্গের মত শোনায়। মধ্যম বাদী ও ষড়জ সম্বাদী। দেবশাখ, কৌশী, নায়কী, সুহা—রাগিণী সারং-অঙ্গের, কাজেই এইসব রাগিণীতে গান্ধার খুব কম ব্যবহৃত হয়। এই রাগিণী বাগেশ্রী ও কৌশী রাগিণীর সম্মিলনে উদ্ভূত হইয়াছে। গাহিবার সময় রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।

আরোহী : সা রা জ্ঞা মা পা না র্সা।

অবরোহী : র্সা ণা পা মা জ্ঞা মা রা সা।

লক্ষণগীত—তেতালা

আস্থায়ী : স্বজন বিনা ভয়ি নিরাশ হুঁ—কহো সখি কিস্ বিধা পাউঁ দরশ।

অন্তরা : কহত নায়কী আপনে জিয়া কি রোজ হারকে দরশ বিন্ নিশদিন তরস।

আস্থায়ী

´ ১	×	৩	০
$^{\text{প}}$ণা ণা পা পা মা	পা মা -া পা	$^{\text{ম}}$জ্ঞা $^{\text{ম}}$জ্ঞা মা পা	-া ণা মা পা
স জ ন বি ন	ভ য়ি ০ নি	রা ০ শ হুঁ	০ ক হো স
সা -া -া ণা	পা পা $^{\text{ম}}$জ্ঞা $^{\text{ম}}$জ্ঞা	-া $^{\text{ম}}$জ্ঞা -া মা	রা সা -া ণা
খি ০ ০ কি	স বি ধা পা	০ উ ০ দ	র শ ০ স

অন্তরা

মা র্সা র্সা না র্সা	না র্সা -া পা	ণা পা না র্সা	র্রা র্রা র্সা $^{\text{প}}$র্না
ক হ্ ত না ০	য় কী ০ আ	প নে জি য়া	কি রো জ হা
পা $^{\text{ম}}$জ্ঞা $^{\text{ম}}$জ্ঞা মা	পা $^{\text{প}}$ণা পা র্সা	$^{\text{প}}$ণা পা $^{\text{ম}}$জ্ঞা মা	রা রা সা $^{\text{প}}$না
র কে ০ দ	র শ বি না	নি শ দি ন	ত র স স্ব

কৌশী কানাড়া

কাফি ঠাটের সম্পূর্ণ রাগিণী। ইহার বাদী সুর মধ্যম ও সম্বাদী ষড়জ। এই রাগিণীতে মধ্যম ও ধৈবতের সঙ্গত মধুর শ্রবণ–সুখ দায়ী। আর এই দুই সুরের সঙ্গতের জন্যই মল্লার অঙ্গ হইতে ইহাকে পৃথকীকৃত করে। ইহাকেও কানাড়া জাতীয় একরূপ কানাড়া বলা হইয়া থাকে। ইহাকে কানাড়া অঙ্গ করিয়া গাহিতে হয়। কৌশী ও কানাড়া মিলিয়া এই রাগিণীর উৎপত্তি। আরোহী : সা রা জ্ঞা মা—পা ধা ণা র্সা। অবরোহী : র্সা ণা ধা পা মা—জ্ঞা রা সা।

লক্ষণগীত—চৌতাল

আস্থায়ী : হরপ্রিয়া কে মেল মুঁ চতর বর করত রাগ কৌশী সুদ্ধ গোপীজন পরম আনন্দ মেত্ উপজায়ে।

অন্তরা : সম্পূরণ সুর আত হুঁ সো হত জা মেঁ মধ্যম মুঁ মন কো হুলসায়ে।

আস্থায়ী

১	২	×	০	১	০
পা মা	পা ধা	$^{\text{ম}}$জ্ঞা $^{\text{ম}}$জ্ঞা	$^{\text{ম}}$জ্ঞা মা	পা $^{\text{ম}}$জ্ঞা	$^{\text{ম}}$জ্ঞা সা
হ র	প্রি য়া	কে ০	মে ০	ল মুঁ	০ চ

রা	রা	সা	সা	ণা	সা	রা	ণা	সা	সা	মজ্ঞা	মা
ত	র	ব	র	ক	র	ত	রা	০	গ	কৌ	০

রা	সা	ধণা	ণা	পা	ণধা	ণধা	-া	ধণা	পা	ধা	না
সি	০	শু	ধ	গো	০	পী	০	জ	ন	প	র

র্সা	না	র্সা	-া	পনা	পা	পা	মা	পা	মা	-া	মা
ম	আ	ন	ন্	দ	নে	ত	উ	প	জ্ঞা	০	য়ে

অন্তরা

না	র্সা	র্সা	-া	না	র্সা	র্সা	র্সা	না	র্সা	র্রা	না
সম্	০	পূ	০	র	ণ	সু	র	আ	ত	হুঁ	সো

র্সা	র্সা	র্সা	পণা	-া	পা	মা	-া	ধা	ধা	ণা	পা
০	হ্	ত	জা	০	মে	মস	০	ধ্য	ম	মূ	০

ধা	না	র্সা	ধণা	পা	মা	-া	মা
স	ন	কো	হো	না	সা	০	য়ে

সুহা

কাফি ঠাটের খাড়ব রাগিণী। ইহার আরোহণে ও অবরোহণে ধৈবত সুর বর্জিত বা বিবাদী। ইহারও বাদী মধ্যম ও সম্বাদী ষড়জ। গাহিবার সময় দিবা দ্বিপ্রহর। ইহার উত্তরাঙ্গে অর্থাৎ চড়ার দিকে সারঙ্গের স্বরূপ অনুভূত হয়। কিন্তু পূর্বাঙ্গে গান্ধার লাগানো হয় বলিয়া সারং হইতে আলাদা হইয়া যায়। মধ্যম সুর যেন পরিস্ফুট করিয়া লাগানো হয়—ইহাই সঙ্গীত গ্রন্থের উপদেশ। এই রাগিণীতে নিখাদ ও পঞ্চমের সঙ্গত ও মধ্যমে ন্যাশ অর্থাৎ (রাগিণী শেষ করা) মধুর শোনায়। দরবারী ও মেঘ হইতে ইহার উৎপত্তি। যেমন রাত্রে আড়ানা গাওয়া হয়, তেমনি দিনে সুহা গাহিতে হয়। রসিক গুণীগণ 'সুহা'কে দিনের আড়ানা বলিয়া থাকেন। এই দুই রাগিণীর মধ্যে পার্থক্য এইটুকু যে, 'সুহা'র উত্তরাঙ্গ সারং অর্থাৎ ধৈবত বিবাদী বলিয়া সারঙ্গের আবহাওয়ার সৃষ্টি করে—কিন্তু আড়ানায় ধৈবত পরিষ্কার ভাবে লাগানো হয়। ইহা ছাড়াও 'সুহা' পূর্বাঙ্গের রাগিণী অর্থাৎ ইহাতে চড়ার দিকের বেশি কাজ করা হয় না, আর আড়ানা উত্তরাঙ্গের রাগিণী।

আরোহী : সা রা জ্ঞা মা—পা ণা র্সা।

অবরোহী : র্সা ণা পা মা জ্ঞা রা সা।

লক্ষণ-গীত—ঝাঁপতাল

আস্থায়ী : কর হরপ্রিয়া ঠাট সুধ রাগ কর লিয়ে
সুহা চতর নামওয়া কো বিচারি লিয়ে।

অন্তরা : মধ্যম কহত অন্শ ধৈবত কো তজ লিয়ে
দরবার মেঘ যুতনীপা সঙ্গ কর লিয়ে
সুহা চতর নাম কো বিচার লিয়ে।

আস্থায়ী

×		৩			০		১		
সা	সা	জ্ঞা^ম	-া	মা	পা	পা	পণা	মপা	সা
ক	র	হ	০	র	প্রি	য়া	ঠা	০	ট
না	পা	পনা	মপা	র্সা	না	পা	জ্ঞা^ম	-া	মা
সু	ধ	রা	০	গ	ক	র	লি	০	য়ে
মা	পা	জ্ঞা^ম	-া	মা	রা	রা	সা	-া	সা
সু	০	হা	০	চ	ত	র	না	০	ম
ণা	সা	জ্ঞা^ম	-া	মা	রা	মা	রা	-া	সা
ওয়া	০	কো	০	বি	চা	রি	লি	০	য়ে

অন্তরা

মা	পা	^পণা	^পণা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	-া	র্সা
ম	০	ধ	ম	ক	হ	ত	অ	ন্	শ
র্সা	-া	র্সা	র্রা	র্সা	ণা	সা	ণা	-া	র্মা
ধৈ	০	ব	ত	কো	ত	জ	লি	০	য়ে
পা	পা	জ্ঞা^ম	-া	মা	পা	ৱা	ণা	পা	র্সা
দ	র	বা	০	র	মে	০	ঘ	যু	ত
ণা	পা	মা	-া	পা	মা	পা	জ্ঞা^ম	-া	মা
নি	পা	স	০	ঙ্গ	ক	রি	লি	০	য়ে
সা	পা	জ্ঞা^ম	-া	মা	রা	রা	সা	-া	সা
সু	০	হা	০	চ	ত	র	না	০	ম
না	সা	জ্ঞা^ম	মা	পা	রা	মা	রা^স	-া	সা
ওয়া	০	কো	০	বি	চা	রি	লি	০	য়ে

সুঘরাই

ইহা কাফি ঠাটের খাড়ব–সম্পূর্ণ রাগিণী। আরোহণে ধৈবত সুর বর্জিত হয়। ষড়জ বাদী ও পঞ্চম সম্বাদী। গাহিবার সময় দিবা দ্বিপ্রহর। এই রাগিণীতে ষড়জ পঞ্চমের সম্বাদ বা ঘনিষ্ঠতা থাকে। ইহা এক প্রকার কানাড়া নামে পরিচিত। এই রাগিণীতেও সারঙ্গের অঙ্গ দেখা যায়। রাত্রে যেমন সাহানা গাহিতে হয়, দিনে তেমনি সুঘরাই গীত হইয়া থাকে। (যেমন রাত্রে আড়ানা ও দিনে 'সুহা')। সুহা ও সুখরাই–এ ইহাই পার্থক্য যে, সুহাতে ধৈবত একেবারে বিবাদী আর সুঘরাই–এ কেবল আরোহীতে বিবাদী। কাহারও কাহারও অভিমতে বাগেশ্রী ও মধুমারর মিশ্রণের ফলে ইহার সৃষ্টি। আবার কাহারও কাহারও মতে এই রাগিণী আড়ানা, কানাড়া ও বৃন্দাবনী সারং–এর মিশ্রণে সৃষ্ট হইয়াছে। সুহারয় ধৈবত বর্জিত, বৃন্দাবনী সারং–এ গান্ধার বর্জিত, আড়ানায় ধৈবত কোমল, সাহানায় ধৈবত পরিষ্কার করিয়া দেখানো হয়—কিন্তু সুঘরাই–এ এসবের কিছু কিছু আভাস থাকিলেও ঐ সমস্ত রাগিণী হইতে স্বতন্ত্র। এই সব রাগিণীতে তারার র্সা অত্যন্ত শ্রবণ–সুখকর।

আরোহী : সা রা জ্ঞা মা পা—ণা র্সা।
অবরোহী : র্সা ণা ধা পা—মা জ্ঞা রা সা।

লক্ষণ-গীত—ঝাঁপতাল

আস্থায়ী : দীয়্যা পিয়া বিন্ ময়কা পল না সোহাওয়ে
আলি নিশদিন তড়া তড়া জিয়ারা উবলায়ে।
অন্তরা : হরপ্রিয়া চরণ পানশ কর লাবেঁগে সুখ্‌রা এত্‌নী কহা
হামরি তপত মিটারে।

আস্থায়ী

×		৩			০		১		
			প						
ধা	পা	–া	মা	ধা	পা	মা	রা	ণা	সা
দি	ই	০	য়া	পি	য়া	বি	ন	মেয়	কা
ণা	সা	জ্ঞা[ম]	–া	জ্ঞা[ম]	জ্ঞা[ম]	–া	মা	রা	সা
প	ল	না	০	সো	হা	০	ওয়ে	আ	লি
সা	সা	রা[ম]	মা	মা	পা	পা	ণা[ধ]	মা	পা
নি	শ	দি	ন	ত	ড়	প	ত	ড়	প
পা	র্ণা	র্সা	র্সর্রা	র্সর্রা	র্সা[ণ]	–া	পা	ণা[ধ]	পা
জি	য়া	রা	উ	কা	লা	০	য়ে	আ	লি

অন্তরা

মা	পা	ণা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	ণা	র্সা	র্সা
হ	র	প্রি	য়া	চ	র	ণ	প	০	নশ
ণা	র্সা	র্রা^ম	র্মা	র্রা	র্সা	-া	পা	ণা	পা
ক	ব	ল	০	বৈঁ	গে	০	সু	ঘ	রা
পধা	পমপা	জ্ঞা^ম	-া	মা	পা	-া	পা	ণা	পা
এ	ত	নী	০	ক	হো	০	হা	ম	রি
পা	র্রা	র্সা	-া	র্সর্রা	র্সা^ণ	-া	পা	পা^ধ	পা
ত	প	ত	০	মে	টা	০	য়ে	আ	লি

দেবশাখ

ইহা কাফি ঠাটের ওড়ব–সম্পূর্ণ রাগিণী। ইহার মধ্যম বাদী ও ষড়জ সম্বাদী। ধৈবত ও গান্ধার দুই দুর্বল। কাহারও মতে—এই রাগে কানাড়া ও মেঘ মিশ্রিত আছে। কোনো কোনো সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ ইহাতে ধৈবত বর্জিত করিতে বলেন। কিন্তু বিখ্যাত চতর্ পণ্ডিত বলেন, 'আমি এই সুর প্রচ্ছন্নভাবে অর্থাৎ খুব কম ব্যবহার করা পছন্দ করি।' ইহার গান্ধার আন্দোলিত করিয়া গাহিতে হয়। মধ্যম ইহার ন্যাস সুর। অর্থাৎ মধ্যমে ইহার পরিসমাপ্তি করিতে হয়। এই সুরে খানিকটা 'সুহা'র আভাস পাওয়া যায়। গাহিবার সময় সকাল। ইহাতেও সারঙ্গের অঙ্গ আছে। 'সঙ্গীত সারামৃত' গ্রন্থে এই রাগে দুই গান্ধার ব্যবহৃত হয় বলিয়া লিখিত আছে। রেখাবও বর্জিত করিতে বলিয়াছে ঐ গ্রন্থ। কিন্তু আজকাল এ মত প্রচলিত নাই।

আরোহী : সা রা মা পা ণা র্সা।

অবরোহী : র্সা ণা ধা পা মা—জ্ঞা রা সা।

লক্ষণগীত—ঝাঁপতাল

আস্থায়ী : লঘু দুরত লঘু লঘু ধুরওয়া কো কহত অঙ্গ লঘু দুরত লঘু সোমঠ দুবৃত লঘু রূপক।

অন্তরা : লঘু আনু দুরত ঝম্প লঘু দুরত দোয়া তের পোটপ লঘু লঘু দুরত দুরত দুর আটি এক লঘু এক॥

আস্থায়ী

×		৩			০		১		
	তীব্র	কো	কো					ম	
মা	ধনা	ধণা	ধণা	পা	পা	মা	পা	জ্ঞা	-া
ল	ঘু	দু	র	ত	ল	ঘু	ল	ঘু	০

ম	ম	ম							
জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	মা	মা	রা	রা	সা	-া	সা
ধুর	ওয়া	কো	০	ক	হ	ত	অ	ন্‌	গ

		ম	ম						
ণ্‌া	সা	রা	রা	মা	পা	পা	ধণা	মা	পা
ল	ঘু	দু	র	ত	ল	ঘু	সো	ম	ঠ

				স					
পা	না	র্সা	র্সা	র্রা	র্সা	ণা	পা	-া	মা
দু	র	ত	ল	ঘু	রু	০	প	০	ক

অন্তরা

×		৩			০		১		
মা	পা	ণা	ণা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	-া	র্সা
ল	ঘু	আ	নু	দু	র	ত	ঝ	ম্‌	প
ণা	র্সা	র্জ্ঞা^ম	র্জ্ঞা^ম	র্মা	র্রা	র্সা	ণা	ণা	পা
ল	ঘু	দু	র	ত	দো	যা	ত্রি	পু	ট
ণ্‌া	সা	রা	রা	মা	পা	পা	ধণা	মা	পা
ল	ঘু	ল	ঘু	দু	র	ত	দু	ব	ত
				স					
পা	র্সা	র্সা	-া	র্রা	র্সা	ণা	পা	-া	মা
আ	ঠ	এ	০	ক	ল	ঘু	এ	০	ক

সাহানা

সাহানা কাফি ঠাটের খাড়ব-সম্পূর্ণ রাগিণী। এই নূতন রাগিণী মুসলমান গায়কদের সৃষ্টি। প্রচলিত রীতি অনুসারে ইহা রাত্রে গীত হয়। বিবাহ বাড়িতে বা অন্যান্য আনন্দ-উৎসবে সানাইয়ার সানাই-এ এই রাগিণী প্রায়ই শোনা যায়। পঞ্চম ইহার বাদী সুর। ইহার রূপ আড়ানার সঙ্গে অনেকটা মিলে। সাহানার অবরোহীতে সামান্য ধৈবত লাগাইয়া আড়ানা হইতে পৃথক রূপ দিতে হয়। ইহাতেও গান্ধার থাকার জন্য সারং হইতে ইহার রূপ বিভিন্ন হইয়া থাকে। এই রাগিণীর আরোহীতে ধৈবত বর্জিত—এই জন্য কাফি ইত্যাদি রাগিণী হইতেও আলাদা হইয়া থাকে। দরবারী ও মেঘ হইতে ইহার সৃষ্টি বলিয়া গুণীরা মনে করেন।

আরোহী : সা রা মা পা না র্সা।

অবরোহী : র্সা ণা ধা পা-মা পা-জ্ঞা মা রা সা।

লক্ষণগীত—ঝাঁপতাল

আস্থায়ী : সাহানা দি বুধ পানশ আধুনক কহে রূপ কর্ণাট
কোয়ি শীশা গাওত সব নিশীথ।

অন্তরা : আড়ানা ধা গা মেরদুল সারং আধা গা মত সুধ রা প্রীত রূপ
দেনা গেলে চতর মত—কর্ণাট কোয়ি শীশ গাওত সব নিশীথ।

আস্থায়ী

×		৩			০		১		
ধা	ধা	পা	–া	পা	পা	মা	পা	–া	পা
সা	হা	না	০	দি	বু	ধ	পা	ন	শ
র্সা	–া	ণা	ণা	পা	পা	পা	জ্ঞা	মা	মা
আ	০	ধু	নি	ক	ক	হে	রূ	০	প
মা	পা	জ্ঞ	মা	মা	রা	রা	সা	–া	সা
ক	র	না	০	ট	কো	য়ি	শী	০	শ
সা	মা	মা	মা	মা	পা	পা	জ্ঞা	মা	মা
গা	০	ও	ত	স	ব	নি	শী	০	থ

অন্তরা

মা	পা	না	গ	র্সা	র্সা	বা	র্সা	র্সা	র্সা
আ	০	ড়া	০	না	ধা	গা	মৃ	দু	ল
না	র্সা	র্রা	–া	র্রা	র্সা	র্সা	ণা	ধা	পা
সা	০	র	ঙ্	গ	আ	ধা	গা	ম	ত
ধা	ধা	পা	–া	পা	পা	মা	পা	–া	পা
সু	ধ	রা	০	০	প্রী	তি	রূ	০	প
র্সা	র্সা	ণা	–া	পা	পা	মা	পা	জ্ঞা	মা
দে	না	গে	০	লে	চ	ত	র	ম	ত
মা	পা	জ্ঞা	–া	মা	রা	রা	সা	–া	সা
ক	র	না	০	ট	ক	বী	শী	০	শ
সা	মা	মা	মা	মা	ধা	পা	জ্ঞা	মা	মা
গা	০	ও	ত	স	ব	নি	শী	০	থ

বাগেশ্রী

বাগেশ্রী কাফি ঠাটের খাড়ব-সম্পূর্ণ রাগিণী। ইহার আরোহীতে পঞ্চম বর্জিত এবং অবরোহণে সম্পূর্ণ। কিন্তু অবরোহণে সম্পূর্ণ জাতীয় হইলেও পঞ্চম দুর্বল অর্থাৎ খুব কম লাগে। আবার কাহারও কাহারও মতে বাগেশ্রী পঞ্চম বর্জিত অর্থাৎ খাড়ব জাতীয়। কিন্তু পঞ্চম একেবারে বর্জিত করিলে শ্রীরঞ্জনী ও বাগেশ্রীতে বিশেষ কোনো পার্থক্য থাকে না। শুধু এইটুকু পার্থক্য থাকে যে, বাগেশ্রীর আরোহীতে ষড়জ হইতে মধ্যম যায় (রেখাব ও গান্ধার ডিঙাইয়া), শ্রীরঞ্জনীর আরোহীতে ষড়জ হইতে কোমল গান্ধারে যায় (মীড়ে)। বাগেশ্রীর বাদীসুর মধ্যম, সম্বাদী ষড়জ। ইহার অবরোহণে পঞ্চমে জোর দিলে ধানশ্রীর মত শুনাইবে, কাজেই পঞ্চম খুব সাবধানে লাগাইতে হয়। প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থে বাগেশ্রীতে দুই গান্ধারের কথা উল্লিখিত আছে। অর্থাৎ আরোহণে তীব্র ও অবরোহণে কোমল গান্ধার। বাহাদুর হোসেন খাঁর বাগেশ্রী তেলেনা যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই এই মতকে সমর্থন করিবেন। আজকালও কোনো কোনো অভিজ্ঞ গীত-শিল্পী অত্যন্ত মধুর করিয়া তীব্র গান্ধারের কৃণ্ দিয়া বাগেশ্রী গাহিয়া থাকেন শুনিয়াছি। 'রাগ তরঙ্গিনী' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, ধানশ্রী ও কানাড়া মিলিয়া এই রাগিণীর উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার চাল দেখিয়া ইহার যথার্থতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকে না। কানাড়ার বহুবিধ রূপ আছে এবং ইহা লইয়া গুণীগণের মধ্যে তর্কের আর অন্ত নাই। কানাড়ার তর্কের মূল গান্ধার ও ধৈবত—এবং এই দুই সুর তীব্র হইবে কি কোমল হইবে। এ তর্কের কখনো মীমাংসা হইবে না। এই সব ব্যাপারে চলতি রীতি বা 'রেওয়াজ' দেখিয়া চলাই ভাল।

আরোহী : সা ণ্া ধ্া—ণ্া সা—মা জ্ঞা—মা ধা—ণা র্সা।
অবরোহী : র্সা ণা ধা মা—পা মা জ্ঞা রা সা।

লক্ষণগীত—ঝাঁপতাল

আস্থায়ী : রাগ বাগেশ্রী বেকরত লাগত গা নি, কর হরপ্রিয়া ঠাট
তিওর করত ধা রি।
অন্তরা : মধম সুর পরধান অনুলোম আপমান রীত্ত
গোঁড় সম সব চতর মানত গুণী।

আস্থায়ী

×		৩			০		১		
মা	জ্ঞা	রা	সা	-া	ণ্া	ধ্া	ণ্া	সা	-া
রা	০	গ	বা	০	গে	০	শে	রী	০
ণ্া	সা	মা	মা	মা	মা	মা	পা	জ্ঞা	মা
বে	ক	র	ত	লা	গ	ত	গা	নি	০

জ্ঞা মা	ণা ধা ণা	র্সা র্সা	র্সা –া র্সা
ক র	হ ০ র	প্রি য়া	মে ০ ল
র্সা –া	ণা ধা ণা	ধা মা	পা জ্ঞা মজ্ঞা
তি ০	ও র ক	র ত	ধা রি ০

অন্তরা

মা –া	ধা ণা র্সা	র্সা র্সা	র্সা র্সা –া
ম ০	ধ ম সু	র পর্	ধা ০ ন
ণা র্সা	র্রা র্জ্ঞা র্রর্সা	ণা র্সা	ণা ধা ধা
অ নু	লো ০ ম	আ প	মা ০ ন
ধা ণা	র্সা র্সা র্জ্ঞা	রা র্মা	র্রা র্রা র্সা
রী ০	তা গোঁ ০	ড় স	ম স ব
র্সা র্সা	র্সা ধা ণা	ধা মা	পা জ্ঞা মজ্ঞা
চ ত	র মা ০	ন ত	গু ণী ০

আড়ানা

আড়ানা দুই প্রকার প্রণালীতে গাওয়া যাইতে পারে। প্রথম আশাবরী ঠাট ও দ্বিতীয় কাফি ঠাট অনুসারে। কাফি ঠাটে ইহা খাড়ব জাতীয় রাগিনী। তারার সা ইহার বাদী সুর। ধৈবত গান্ধার বর্জিত না হইলেও কম ব্যবহার করা হয় এবং সেইজন্য খানিকটা সারঙ্গের আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। এইজন্য আড়ানার আর এক নাম রাতের সারং। তবে সারদে ধৈবত গান্ধার একেবারে বর্জিত হয়, আর আড়ানায় স্বল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। যেখানে মধ্যম স্পষ্ট করিয়া লাগানো হয়, সেইখানে কতকটা 'সুহার' মত শোনায়। কিন্তু 'সুহায়' কানাড়ার অঙ্গ সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হয় কিন্তু আড়ানায় তাহা হয় না। গান্ধার লাগাইবার দরুণ সুরমল্লার হইতে ইহা পৃথক হইয়া যায়। মেঘ ও মধুমাত মিলিয়া ইহার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া গুণীগণের বিশ্বাস। হোসেনী কানাড়ার সঙ্গে ইহার অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। বিশেষ করিয়া কাফি ঠাটের আড়ানো ও হোসেনী কানাড়ায় খুব সুর অভিজ্ঞ সমঝদার ছাড়া কেহ কোনো পার্থক্য ধরিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। এই জন্যই অর্থাৎ হোসেনী কানাড়া হইতে পৃথকীকৃত করার জন্যই পণ্ডিতগণ আড়ানাকে আশাবরী ঠাট করিয়া গাহিয়া থাকেন। অর্থাৎ ইহার ধৈবত কোমল করিয়া গান।

আরোহী : সা রা মা পা—ধা ণা পা—ধা র্সা।

অবরোহী : র্সা ণা পা জ্ঞা মা—রা সা।

পিলু

পিলু কাফি ঠাটের সম্পূর্ণ জাতীয় রাগিণী। ইহা মিশ্র মেলের রাগিণী। অর্থাৎ ইহাতে দুই তিন ঠাটের সংমিশ্রণ আছে। গাহিবার কোন সময় নির্ধারিত নাই, তবে সাধারণতঃ ইহা বিকালে গীত হইয়া থাকে। গান্ধার বাদী সুর। এই রাগিনীতে তীব্র কোমল সকল সুরই লাগানো হইয়া থাকে। এইজন্য, ইহার রূপ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। একটু মনোনিবেশ করিলেই বোঝা যায়, এই রাগিণীতে গৌরী, ভীমপলাশী ও ভৈরবী এই তিন রাগের সংমিশ্রণ আছে। ইহার আরোহণে তীব্র ও অবরোহণে কোমল সুর ব্যবহার করিবার রীতি প্রায় সর্বস্থানে দেখা যায়। ইহাও গ্রন্থোক্ত রাগিণী নয়, মুসলমান ওস্তাদদের সৃষ্টি। ইহার স্বভাব অত্যন্ত লঘু ও চঞ্চল—তাই ইহাতে ছোট ছোট জিনিসই গাওয়া হয়।

আরোহী : ন্‌া সা রা জ্ঞা—মা পা ধা—ণা র্সা।
অবরোহী : র্সা ণা ধা পা মা জ্ঞা—রা সা ন্‌া সা।

লক্ষণগীত—তেতালা (মধ্য লয়)

আস্থায়ী : পিয়া তোয়ে পিলু কি চমক মন বস গয়ি।
গা নি সম্বাদী করত হর সুর বাঁশরী কি ধুন মোরে জিয়া মে বস্‌ গয়ি।
অন্তরা : সব সুর ঠিক্‌রত মন হরণ শুনত শুনত সুধ বুধ হুঁ বিসর গয়ি।

আস্থায়ী

৩				০				১				×			
না	সা	জ্ঞা	রা	সা	ন্‌া	সা	ন্‌া	দ্‌া	প্‌া	দ্‌া	দ্‌া	ন্‌া	ন্‌া	সা	সা
পি	য়া	তো	রে	পি	লু	কি	চ	ম	ক	ম	ন	ব	স	গ	য়ি
জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	-া	জ্ঞা	রা	জ্ঞা	মা	পা	মা	জ্ঞা	রা	ন্‌া	সা
গা	নি	স	ম	বা	০	দী	ক	র	ত	হ	র	প্রি	য়া	সু	০
গা	গা	গা	গা	মা	মা	মা	মা	রা^ম	মা	পা	-া	জ্ঞা	জ্ঞা	ন্‌া	সা
বাঁ	শ	রি	কি	ধু	ন	মো	রে	পি	য়া	মে	০	ব	ম	গ	য়ি

অন্তরা

ন্‌	সা	গা	মা	পা	পা	পা	পা	গা	গা	মা	পা	জ্ঞা	জ্ঞা	ন্‌া	সা
স	ব	সু	র	বি	ক	র	ত	ম	ন	হ	র	ণ	ক	র	ত
গা	গা	গা	গা	মা	পা	গা	মা	রা^ম	মা	পা	পা	জ্ঞা	জ্ঞা	ন্‌া	সা
শু	ন	ত	শু	ন	ত	সু	ধ	বু	ধ	হুঁ	বি	স	র	গ	য়ি

বারোয়াঁ

বারোয়াঁ কাফি ঠাটের ওড়ব সম্পূর্ণ জাতীয় রাগিণী। আরোহীতে গান্ধার ও ধৈবত বর্জিত। অবরোহণে সম্পূর্ণ। ষড়জবাদী ও পঞ্চম সম্বাদী। ইহাতে দুই নিখাদ লাগে। এই রাগিণী দুই প্রকারে গাওয়া যায়। প্রথম–শুধু-কোমল গান্ধার লাগাইয়া, দ্বিতীয়—দুই গান্ধার ব্যবহার করিয়া। শুধু কোমল গান্ধার দিয়া গাহিলে ইহা অনেকটা দেশীর মত শুনায়। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দেশীয় ধৈবত কোমল বা দুই ধৈবত, কিন্তু ইহার ধৈবত তীব্র। ইহাও গ্রন্থোক্ত রাগিণী নয়। ইহা মুসলমান ওস্তাদদের সৃষ্টি।

আরোহী : সা রা মা পা ধা না র্সা।

অবরোহী : র্সা ণা ধা পা—ধা মা জ্ঞা রা জ্ঞা সা।

খেয়াল—তেতালা

আস্থায়ী : এড়ি ময়কো নাহি পড়ে চয়ন্—তড়পত হুঁ মেয় পরি।

অন্তরা : তেয়-(বে মন রঙ্গ আজ হুঁ নহি আয়ে আঁশু হোয়ঁ লাগি ঝরি॥

আস্থায়ী

	১	×	৩	০
রা জ্ঞা	সা রা মা পা^ধ	জ্ঞা বা জ্ঞা রসা	মা রা সা রা	ণা সা সা সা
এ ০	রি মা কো ০	না ০ ০ হি	প ড়ে ০ চ	য় না ত ড়
	রা মা জ্ঞা রা	মা পা -া ণা	ধা পা মা জ্ঞা	রা -া রা জ্ঞা
	প ত হুঁ ০	সে ০ য় প	রি ০ ০ ০	০ ০ এ ০

অন্তরা

০	১	+
মা মা মা মা	মা মা পা না	র্সা র্সা র্সা র্রা
তেয় স ন রন্	গ আ জ হুঁ	০ ন হি ০
৩	০	১
র্সা র্সা নধপা মপা	মজ্ঞরা জ্ঞসা সা সা	রা মা রা মা
অ য়ে ০ ০	০ ০ আঁ শু	ওয়া ন্ লা ০
×	৩	০
মা পা ণা ধা	পা মা জ্ঞা রা	মা পা
গি ০ ঝ রি	০ ০ ০ ৫	০ ০

শ্রীরঞ্জনী

ইহা কাফি ঠাটের ওড়ব-খাড়ব জাতীয় রাগিণী। আরোহণে রেখাব পঞ্চম সুর বর্জ্জিত, অবরোহণে শুধু পঞ্চম বর্জ্জিত। মধ্যম বাদী ও ষড়জ সম্বাদী। বাগেশ্রীর সঙ্গে ইহার অত্যন্ত সাদৃশ্য আছে তবে বাগেশ্রীতে অবরোহণে পঞ্চম লাগে, ইহাতে পঞ্চম বিবাদী। গাহিবার সময় রাত্রি দ্বিপ্রহর।

আরোহী : সা জ্ঞা মা ধা ণা র্সা।

অবরোহী : র্সা ণা ধা মা জ্ঞা রা সা।

লক্ষণ গীত—একতালা

আস্থায়ী : গুণীজন করত মেল জব সুধ হরপ্রিয়া আত মনোহর শ্রীরঞ্জনী
রূপমধুর পঞ্চম বরজত নেত্ সুর।

অন্তরা : বিলাসত বাগেশ্রী সঙ্গ সা মা সুর সম্বাদ করত কোমল নি আত
সুন্দর বর্ণত নিপুণ গায়ে চতর।

আস্থায়ী

×		০		৪		০		১		২	
জ্ঞ											
মা	জ্ঞা	রা	সা	ধা	ণা	সা	ধা	-া	ণা	সা	সা
গু	ণী	জ	ন	ক	র	ত	মে		ল	জ	ব
ণা	সা	মা	মা	মা	মা	মা	মা	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা
সু	ধ	হ	র	প্রি	য়া	আ	ত	ম	নো	হ	র
জ্ঞা	জ্ঞা	মা	ধা	মা	ধা	র্সা	-া	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা
শি	রী	র	ন্	জ	নী	রূ	০	প	ম	ধু	র
র্সা	-া	ণা	ধা	ণা	ণা	ধা	মা	জ্ঞা	জ্ঞা	রা	সা
প	ন	চ	ম	ব	র	জ	ত	নে	ত	সু	র

অন্তরা

জ্ঞা	মা	ধা	ণা	র্সা	-া	র্সা	-া	র্রা	র্রা	র্সা	র্সা
বি	ল	স	ত	বা	০	গে	০	শে	রী	অঙ্	গ
ণা	র্সা	র্মা	র্জ্ঞা	র্রা	-া	র্সা	-া	ণা	ণা	ধা	ধা
সা	মা	সু	র	স	ম	বা	০	দ	ক	র	ত

র্জ্ঞা	–া	র্রা	র্সা	র্রা	–া	র্সা	র্সা	র্না	র্সা	ণা	ধা
কো	০	ম	ল	নি	০	আ	ত	সু	ন	দ	র

র্সা	র্সা	ধা	ণা	ধা	ধা	মা	মা	জ্ঞা	জ্ঞা	রা	র্সা
ষ	র	ণ	ত	বি	লু	ণ	গা	য়ে	চ	ত	র

মেঘ

মেঘ কাফি ঠাটের খাড়ব রাগ। আরোহী ও অবরোহীতে ধৈবত বর্জিত বা বিবাদী। ষড়জ বাদী পঞ্চম সম্বাদী। রেখাব আন্দোলিত ধরিয়া গাহিতে হয়, গান্ধার গুপ্ত—অর্থাৎ গান্ধারের শুধু কৃন বা ঈষৎ স্পষ্ট লাগে। একমতে গান্ধার ও ধৈবত দুই সুর মেঘ রাগে বিবাদী। যাঁহারা এই মতবাদী তাঁহারা বলেন গান্ধার একেবারে বর্জিত করিয়াই মেঘকে সুরদাসী মল্লার হইতে পৃথক করা সম্ভব হয়। নতুবা এই দুই রাগিণী প্রায় এক হইয়া যায়। তবে সুরদাসী মল্লারে সারঙের অঙ্গ বেলী ও ধৈবত আছে। চতর পণ্ডিতের মতেও মেঘে ধৈবত গান্ধার দুই বর্জন করা উচিত। প্রচলিত রীতি অনুসারেও প্রায়শ এই রূপেই গীত হইয়া থাকে। মেঘে ধৈবত লাগাইলে সুরদাসী মল্লার হইয়া যায়। এই রাগে মধ্যম ও রেখাবের সঙ্গত বা ঘনিষ্ঠতা থাকে। আর এই সঙ্গতেই এই রাগের রূপ পরিস্ফুট হইয়া থাকে। এই রাগের 'মেজাজ' বা প্রকৃতি অত্যন্ত ধীর শান্ত—এইজন্য এই বিলম্বিত লয়ে এবং তারা ও মধ্যস্থানের সুরে গাওয়া উচিত। সত্যকার গুণীগণ এইরূপেই এ রাগ গাহিয়া থাকেন। বর্ষা ঋতুতে এই রাগ অপূর্ব মাধুর্যের সৃষ্টি করে। দুই নিখাদ ব্যবহৃত হয়।
আরোহী—সা রা মা পা–ণা র্সা। অবরোহী—র্সা ণা পা—মা রা সা।

লক্ষণগীত—ঝাঁপতাল (মধ্য লয়)

আস্থায়ী : চতর নর গায়ে সব মেঘ মলার কো নি সা রে মা মা পা নি পা নি সা মেল কর হার কো।

অন্তরা : সারং ধরে অঙ্গ সা কো করত অনশ গমক যুত তার সু র মা মা রে —সা রে নি সা নি নি পা।

সঞ্চারী : মধম সুঁ সঞ্চার মা পা সা সুঁ নি পা করে ঝুলত রেখাব সুর ধৈবত ছিপায়ো

আভোগ : আড়ানা কো রূপ উতর ধরত অঙ্গ বরখা রেতু কহায়ে রাগ মল্লার কো।

আস্থায়ী

×		৩			০		১		
র্সা	র্সা	র্সা	ণা	পা	ম রা জ্ঞা	–া	রা জ্ঞা	রা	রা
চ	ত	র	ন	র	গা	০	য়ে	স	ব

রা –া | মা রা সা | রা –া | রা সা –া
মে ০ | ঘ ম ০ | লা ০ | র কো ০

ন্া সা | রা মা মা | মপা ণা | পা না র্সা
নি সা | রে মা মা | পা নি | পা নি সা

র্রা –া | র্মা র্রা র্সা | র্সা –া | পা পণা মপা
মে ০ | ল ক র | হা ০ | র কো ০

অন্তরা

মা পা | পণাপ –া ণা | র্সা র্সা | র্সা –া র্সা
সা ০ | র ং গ | ধ রে | অ ং গ

র্সা –া | র্রার্ম র্মা র্রা | র্সা র্সা | ণাপ –া পা
সা –া | কো ০ ক | র ত | অ ন্ শ

র্রার্জ্ঞ –া | –া –া র্মা | র্রা –া | র্রা র্সা র্সা
গ ম | ক মু ত | তা ০ | রা সু র

র্মা র্মা | র্রা র্সা র্রা | না র্সা | ণাপ ণাপ পা
মা মা | রে সা রে | নি সা | নি নি পা

সঞ্চারী

মা –া | মা মা মা | পা –া | পা –া পা
ম ০ | ধ ম সুঁন্ | স ন্ | চা ০ র

মা পা | মা মা মা | পা –া | রা –া মা
মা পা | সা ০ সুঁ | নি পা | ক ০ তে

রা –া | মা মা পা | রা মা | রা –া সা
ঝু ০ | ল ত রে | খা ব | সু ০ র

মা –া | পা পা পা | ণাপ –া | ণা মা পা
ধৈ ০ | ব ত হি | পা ০ | য়ো ০ ০

আভোগ অন্তরার ন্যায় গেয়

সুরদাসী মল্লার

এ রাগিণী গ্রন্থোক্ত নয়। সম্রাট আকবরের রাজত্বের সময় বাবা সুরদাস এই রাগিণীর সৃষ্টি করেন। ইহা কাফি ঠাটের ওড়ব খাড়ব জাতীয় রাগিণী। আরোহী ও অবরোহী দুয়েই ধৈবত গান্ধার গুপ্ত থাকে—কিন্তু ঐ দুই সুর সম্পূর্ণরূপে বর্জিত নহে মধ্যম বাদী, ষড়জ সম্বাদী। ধৈবত গান্ধার দুর্বল হওয়ার দরুণ সারং বলিয়া সন্দেহ নয়। কাজেই ধৈবতের কৃণ্ দিয়া সারং হইকে ইহাকে বাঁচানো হয়। মধ্যম রেখাবের সঙ্গত থাকার খানিকটা সুরটের মত শোনায় কিন্তু সুরটে ধৈবত পরিষ্কার রূপে বোঝা যায়—ইহাতে ধৈবত প্রায় গুপ্ত। শুধু এই কারণেই সুরট হইতে ইহার রূপ অন্যতর হয়। সুহা ও আড়ানায় গান্ধার স্পষ্ট করিয়া দেখানো হয়—সুরদাসী মল্লারে গান্ধার গুপ্ত। কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন, মধুমা ও মল্লারের সংমিশ্রণে এই রাগিণীর উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা ঠিক বলিয়াই মনে হয়। ইহাকে 'সুর-মল্লার'ও বলে।

আরোহী : সা রা মা পা ণা র্সা।
অবরোহী : র্সা ণা পা মা—ণা ধা পা—মা রা সা।

লক্ষণ গীত—তেতালা

আস্থায়ী : বরখা রুত বেরি হামারে মাস আখাদ ঘটা ঘন গরজত চতর বিদেশ হামায়ে
অন্তরা : মৌর পাপিহা দাদুরী চাতক হরপ্রিয়া করত পোকারে আবখা সহেত সখি সুর বিরহা দুখ নিকসত পরাণ হামারে॥

আস্থায়ী

	০	১	×	৩
মা পা	ণা[প] ণা[প] পা মা	পা মা রা সা	রা -া পা মা	মা -া -া -া
ব র	খা ০ রু ত	বে ০ রি হা	মা ০ ০ ০	রে ০ ০ ০
	মা -া পা পা	ণা[প] মা না না	র্সা -া র্সা র্সা	না না র্সা র্সা
	মা ০ স আ	খা ০ দ ঘ	টা ০ ঘ ন	গ র জ ত
	না -া র্সা র্সা	র্রা -া র্সা র্সা	র্সা[র্] -া না -া	মা -া -া পা
	চ ত র বি	দে ০ শ হা	মা ০ রে ০	০ ০ ব র

অন্তরা

	০	১	×	৩
	মা -া মা পা	ণা পা না -া	র্সা -া র্সা -া	না র্সা র্সা র্সা
	মো উ র পা	পি ০ হা ০	দা ০ দু র	চা ০ ত ক

ণা ণা পা মা   পা মা রা সা   রা -া র্পা -া   মা -া -া -া
হ্ র পের্ য়া   ক র ত পো   কা ০ রে ০   ০ ০ ০ ০

মা মা মা পা   পাণা পা না না   র্সা -া র্সা র্সা   না না র্সা র্সা
আ ব না স   হে ত স খি   সু ০ র বি   র হ দু খ

না না র্সা র্সা   র্মা র্মা র্রা র্সা   র্রাসা -া না -া   মা -া -া পা
নি ক স ত   প্ রা ণ হা   মা ০ রে ০   ০ ০ ব র

মিয়া কি মল্লার

সম্রাট আকবরের সময় মিঞা তানসেন এই রাগিণীর সৃষ্টি করেন—ইহা গ্রন্থোক্ত রাগিণী নয়। ইহা কাফি ঠাটের খাড়ব জাতীয় রাগিণী। বর্ষা ঋতুতে এই রাগিণী অত্যন্ত মধুর শোনায়। ইহার ষড়জ বাদী ও পঞ্চম সম্বাদী। (কোমল) গান্ধারে আন্দোলন ইহার মাধুর্যকে আরো বাড়াইয়া তুলে। নিখাদ ও ধৈবতের সংযোগে এই রাগিণীর স্বরূপ পরিপূর্ণ প্রকাশ লাভ করে। উদারা গ্রামে ইহার সুরের লীলা চমৎকার শোনায়। বিলম্বিত লয়ে ইহার আলাপ হৃদয়গ্রাহী হয়। ইহাতে দুই নিখাদ লাগে। কিন্তু এই দুই নিখাদ লাগানোর দরুণ খানিকটা বাহারের মত শোনায়। কিন্তু বাহারে তীব্র নিখাদ প্রায় দুর্বল কিন্তু ইহাতে তীব্র নিখাদ পরিস্কার রূপে দেখানো হয়। যেখানে গান্ধার (কোমল) আন্দোলিত হয়—সেখানে ইহা কানাড়ার রূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু মধ্যম ও রেখাব-এর সঙ্গত বা ঘনিষ্ঠতা থাকার জন্য মল্লার অঙ্গ স্থায়ী হয়। এই রাগিণীতে কর্ণাট ও গোঁড়-এর সংমিশ্রণ আছে বলিয়া অনেকে বলেন। ইহার মধ্যম সুস্পষ্ট করিয়া দেখানো হয়। পঞ্চম নিখাদেরও সঙ্গত আছে এই রাগিণীতে।

আরোহী : সা রা মা পা ণা ধা না র্সা।
অবরোহী : র্সা ণা পা-জ্ঞা মা রা সা।

লক্ষণগীত : তেতালা

আস্থায়ী : গাওত রাগ মলার গুণীন মিয়া সঙ্গত হরপ্রিয়া মেল সুঁ অঙ্গ করত দরবারী গুণীন।

অন্তরা : সম্বাদী সা পা—নি ধা সঙ্গত সোভ পরচ্ছা দেত ধৈবত আওর ঔহঁা দোলত গান্ধার লয় বিলম্পত চতর কহত মল্হার গুণী।

আস্থায়ী

নসা মা রা সা   ণা ধধা মা পা   ণা -া ধা না   সা সা রা সা
গা ০ ও ত   রা ০ গ ম   লা ০ ০ র   ও ণী ০ ন

না সা সা -া	রা -া সা সা	সা পা মা পা	মজ্ঞা মা রা সা
মি ০ যাঁ ০	স ং গ ত	হ র্ প্রি য়া	মে ০ ল সুঁ
মা -া মা মা	পা পা মা পণা	মপা মা জ্ঞা মা	রা রা সা সা
অ ং গ ক	র ত দ র্	বা ০ ০ র	গু ণী ০ ন্

অন্তরা

মা -া পা মপা	ধণা -া না ন্না	র্সা র্সা র্সা -া	ন র্সা র্সা র্সা
স ম ধা ০	দী ০ সা পা	নি ধা স ং	গ ত সো ভ
ধণা -া না না	র্সা র্সা র্সা -া	র্সা র্রা র্রা র্সা	ণা -া পা পা
পু আ ছা ০	দে ত ধৈ ০	ব ত আ ও	রো ও হাঁ ০
মা পা মপা ণা	মজ্ঞা -া মজ্ঞা -া	জ্ঞা মা পা পা	জ্ঞা মা রা সা
দো ০ ল ত	গা ন ধা ০	র ল য় বে	ল ম প ত
দা র্সা র্সা র্মা	র্রা র্সা পমা মপণা	পাম মা জ্ঞা মা	রা রা সা সা
চ ত র ক	হ ত ম ল	হা ০ ০ র	গু ণী ০ ন

মধুমাত (মধুমাধবী)

কাফি ঠাটের ইহা ওড়ব জাতীয় রাগিণী। প্রচলিত রীতি অনুসারে গান্ধার ও ধৈবত বর্জিত করিয়া গাওয়া হয়। ইহাকে একপ্রকার সারং বলা হইয়া থাকে। ইহা গাহিবার সময় দিবা দ্বিপ্রহর। রেখাব বাদী ও পঞ্চম সম্বাদী করিয়া গাহিবার রীতি। কিন্তু আহোবল পণ্ডিত নিখাদ বাদী বলিয়াছেন। আহোবল পণ্ডিতের মত অস্বীকার করা যায় না এই জন্য যে, দিনের বেলায় রেখাব বাদী রাগিণী ভাল শোনায় না—ইহাই পণ্ডিতগণের মত। উত্তরাঙ্গে অর্থাৎ চড়ার দিকে নিখাদ ও পঞ্চমের সঙ্গত বা মাখামাখিভাবে অত্যন্ত সুখশ্রাব্য হয়। আজকাল বহুজাতীয় সারং গীত হইতে শোনা যায়। পৃথক পৃথক বাদী সম্বাদীর জন্য প্রত্যেক সারং বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। চতর পণ্ডিতের ইহাই মত। দিবা দ্বিপ্রহর ও রাত্রি দ্বিপ্রহরের রাগ রাগিণীতে সারঙ্গের অঙ্গ আপনি পরিস্ফুট হইয়া থাকে। ইহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখার যোগ্য। যেমন সুহা সুঘরাই দিবা দ্বিপ্রহরের রাগিণী। এবং সাহানা আড়ানা রাত্রি দ্বিপ্রহরের রাগিণী। এই সকল রাগিণীতেই সারঙের অঙ্গ দিব্য দেখিতে পাওয়া যায়।

আরোহী : সা রা মা পা না র্সা।

অবরোহী : র্সা ণা পা মা রা সা।

লক্ষণ গীত : ঝাঁপতাল

আস্থায়ী : লেখত মধু মাধ বুধ ওড়ো ধা গা বে র হ্‌ ত

অন্তরা : কহ্‌ত সারং য়োভেদ গুণী লচ্ছ্ গত রেখাব সুর অন্‌শ
নি পা চতর সঙ্গত সুমত।

আস্থায়ী

×		৩			০		১		
[প]ণা	[প]ণা	পা	মা	পা	রা	রা	সা	রা	সা
লে	খ	ত	ম	ধ	মা	০	ধ	বু	ধ
ন্‌া	সা	সা	রা	পা	মা	রা	মা	পা	পা
ও	০	ড়ো	০	ধা	গা	বে	র	হ্‌	ত

অন্তরা

×		৩			০		১		
না	না	র্সা	র্সা	–া	না	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা
ক	হ্‌	ত	সা	০	র	ং	গ	য়ো	০
না	র্সা	র্সা	র্রা	র্মা	র্রা	–া	র্সা	ণা[প]	পা
ভে	০	দ	গু	ণী	লা	চ্‌	ছা	গ	ত
পা	পা	র্রা	র্সা	র্রা	না	র্সা	র্সা	ণা	প্‌া
রে	খা	ব	সু	র	অ	ন্‌	শ	নি	পা
মা	পা	র্সা	ণা	প্‌া	মা	বা	সা	রা	সা
চ	ত	র	স	ং	গ	ত	সু	ম	ত

শুধ্‌ সারং

ইহা কাফি ঠাটের ওড়ব-খাড়ব রাগিণী। গান্ধার বর্জিত বা বিবাদী সুর। রেখাব বাদী পঞ্চম সম্বাদী। শুধ্‌ সারঙের বিশেষত্ব এই যে ইহাতে ধৈবত স্পষ্ট করিয়া লাগানো হয়। এই ধৈবতেই ইহাকে মধুমাধবী হইতে পৃথক করিয়া থাকে। দক্ষিণ দেশের সঙ্গীত গ্রন্থে সারঙে তীব্র গান্ধার ও তীব্র মধ্যম লাগে লিখিত আছে—কিন্তু এদেশে এরূপ সারং প্রচলিত নাই। 'সঙ্গীত-পারিজাত' গ্রন্থে সারঙে দুই মধ্যম ও দুই নিখাদ লাগে বলিয়া লিখিত আছে—কিন্তু এ মতও আজকাল প্রচলিত নাই। কোনো কোনো গুণী পণ্ডিত সারঙে তীব্র

মধ্যম দিয়া তাহাকে কামোদ শ্রী নামে অভিহিত করেন। আবার কোন কোন পণ্ডিত বলেন, তীব্র মধ্যম লাগাইয়া ও গান্ধার ধৈবত বর্জিত করিয়া যে রাগিণী হয় তাহার নাম 'সুর সারং'। এইরূপ বহু মতভেদ দেখা যায় সারং রাগিণী সম্বন্ধে। গীত–শিল্পীগণ ইহার যে কোন মত নিজের পছন্দমত বাছিয়া লইতে পারেন। লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে 'শুধ্ সারং' গান্ধার বর্জিত করিয়া গাওয়া হয়। কিন্তু ধৈবত স্পষ্ট করিয়া লাগানো হয়, তাহা না হইলে মধু মাধবীর সাথে ইহার কোনো পার্থক্য থাকে না।

আরোহী : সা রা মা পা না র্সা।

অবরোহী : র্সা ধা ণা পা—মা র্া সা।

লক্ষণ গীত—একতালা

আস্থায়ী : মায়ি রি ময়্ কা সে কহুঁ পীর আপনে জিয়া কি ব্যাকুল হোওত শরীর।

অন্তরা : জা সু লাগি সো এক হি না জানে কহো ক্যায়সে রহে আব ধীর।

আস্থায়ী

১		২		×		০		১		০	
সা	রা	মা	রা	পা	-া	-া	জ্ঞা	পা	ধা	-া	পা
মা	ধা	রি	মেয়	কা	০	০	০	০	সে	০	ক
জ্ঞা	পা	-া	রা	ন্া	ন্া	সা	রা^ম	পা	পা	-া	রা
হুঁ	পি	০	র	আ	প	০	নে	০	জি	০	য়া
-া	র্সা	সা	ন্া	-া	প্া	-া	ন্া	সা	সা	-া	সা
০	কি	০	০	০	বিয়া	০	কু	০	ল	০	হো
রা	রা	-া	সা	পা	প্া	রা	মা	সা	রা	না	সা
০	ও	য়া	ত	শ	রী	০	০	০	০	০	র

অন্তরা

×		০		১		০		১		২	
-া	সা	-া	রা^ম	মা	মা	-া	মা^প	পা	পা	-া	-া
০	জা	০	সু	০	লা	০	গী	০	সো	০	০
পা	পা	জ্ঞপা	ধা	-া	পা	-া	পা	মা	রা	-া	সা
এ	ক	০	হি	০	না	০	জা	০	০	০	নে

ন্া	ন্া	সা	রা	পা	মা	রা	রা	-া	সা	ন্া	সা
ক	হো	০	ক্যা	য়	সে	০	র	০	হে	আ	ব

পা	রা	মা	সা	রা	-া	ন্া	সা
ধী	০	০	০	০	০	০	র
×		০		১		০	

তিলং

স্থায়ী খাম্বাজ ঠাটের পাঁচ সুরের অর্থাৎ ওড়ব তিলং রাগিণী। রেখাব ধৈবত বর্জিত। ইহার গান্ধার বাদী ও নিখাদ সম্বাদী। এই জন্যই ইহা অনেকটা খাম্বাজের সঙ্গে মিলে। নিখাদ ও পঞ্চমের সঙ্গীত ইহার বিশেষত্ব। ধৈবত বর্জিত বলিয়া ইহা খাম্বাজ হইতে পারেয়া—এবং রেখাব ও ধৈবত দুই বর্জিত বলিয়া ইহা ঝিঝোটীও হইয়া যায় না। দুর্গা রাগিণীতে পঞ্চম ও নিখাদ বর্জিত—কাজেই দুর্গার সঙ্গেও ইহা এক হইয়া যায় না। গাহিবার সময় রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।

আরোহী : সা গা মা পা না র্সা।

অবরোহী : র্সা ণা পা মা গা সা

(বাদল ায়ের শিষ্যেরা অবরোহীতে খামাবতীর গা মা সা ব্যবহার করেন অর্থাৎ খামাবতীর মত করিয়া গান)।

লক্ষণ গীত—ঢিমা তেতালা

আস্থায়ী : রে ধা বর্জত রূপ তিলং কহায়ে।
হরি কামভোজীকে সুর নি সা গা মা পা গা মা গা মা পা
নি নি সা গানেত সাঁচ লাগায়ে।

অন্তরা : রাগ্ খামারা রে ধা না কবহুঁ-তজত আশার ঝিঝোটী
চতর কহত রে পা দুরগা রে ধা বর্জেত রূপতী॥

আস্থায়ী

০				১				×				৩			
ধা	ধা	ধপা	মা	মা	ধপা	ধা	মা	গা	-া	-া	মা	গা	-া	রসা	না
ক	হ	ত	চ	ত	র	০	খা	মা	০	০	জ	রা	ঙ	গ	নী
ন্া	সা	গা	গা	মা	-া	ণা	ধা	গমা	ধা	না	র্সা	ধণা	ধা	র্সা	সা
ত	ব	হ	রি	কা	ম	ভো	জী	ঠা	০	ট	র	চ	ত	ত	..

মা গা মা ণধা   –া না র্সা –া   র্সধা না র্সা –া   র্ণর্মা র্গা র্রা র্সা
সু র গন্ ধা   ০ র চো ০   বা ০ দী ০   ব র ণ তৃ

র্গা র্মা র্পা র্গা   র্মা র্গা না র্সা   না না র্সা র্সা   ধণা পধা র্সা র্ণা
খা ০ ডো ০   সম পূ র ণ   ত জ ত রে   খা ০ ত ব

অন্তরা

মা গা মা ধাণা   .. না র্সা –া   র্সধা না র্সা –া   র্গর্মা র্গা র্রা র্সা
সু র গন্ ধা   ০ র কো ০   বা ০ দী ০   ক র ণ ত

র্গা র্মা র্পা র্গা   র্মা র্গা মা র্সা   না না র্সা র্সা   ধণা পধা র্সা র্ণা
খা ০ ডো ০   সম পূ র ণ   ত জ ত রে   খা ব ত এ

খাম্বাজ ঠাট বা কামভোজী মেল–এর রাগ রাগিণি

ঝিঁঝোটী (ঝিঁঝিট)

ইহা খাম্বাজ ঠাটের সম্পূর্ণ রাগিণী। ইহা গাহিবার সময়—রাত্রি। ইহার গান্ধার বাদী ও ধৈবত সম্বাদী সুর। ইহার স্বরূপ অত্যন্ত সরল ও সহজ। এইজন্য ইহাতে এখন সাধারণত ছোট ছোট বা টুটরী গাওয়া হইয়া থাকে। এই টুটুরী জাতীয় গানকে সংস্কৃতে 'শূদ্র–বাণী' বলে। অশিক্ষিত জনসাধারণ যাহা শুনিয়া মোহিত হয়—বা যে জাতীয় গানকে পছন্দ করে—তাহাতেই সংস্কৃত সঙ্গীত–গ্রন্থে 'শূদ্রবাণী' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কাজেই, মনে হয়, প্রাচীন যুগেও শুদ্ধ ধ্রুবপদ্ধতি সঙ্গীতের প্রচলন ছিল না—সে যুগেও টুট্কী গানের প্রচলন ছিল। সঙ্গীত–গুণীগণ বলেন যে, খাম্বাজ ঠাটের কোনো রাগ রাগিণি গাহিতে গাহিতে তাহার স্বরূপ ভুলিয়া গেলে ঝিঁঝোটীর শরণ লন বা ঝিঁঝোটী গাহিতে আরম্ভ করিয়া দেন—ইহা শুনিতে কৌতূহলোদ্দীপক মনে হইলেও নাকি সত্য। ইহার আরোহীতে রেখাব আছে—কাজেই ইহা খাম্বাজ হইতে আলাদা হইয়া থাকে। আজকালকার রীতি অনুসারে আরোহীতে গান্ধার ও নিখাদ ছাড়িয়া দেওয়া হয়। লক্ষ্ণৌ ও অন্যান্য অঞ্চলে সাধারণত দুই প্রকারের ঝিঁঝোটী বলিয়া মানা হয়।

আরোহী : ধ্া সা—রা মা গা—মা পা—ধা না র্সা।
অবরোহী : র্সা ণা ধা পা মা গা রা সা।

লক্ষণগীত—তেতালা

অস্থায়ী : আশ্‌রে রাগ কহত গুণী জান সব ঝিঁঝোটী সরল সুগত সুর
অন্তরা : বাদী খান্ধার নিশি দ্বিতীয়া জানক রাগ কহে চতর নিরন্তর॥

আস্থায়ী

১	×	৩	০
ধ্া সা রা মা	গা –া গা গা	মা রা গা সা	ধ্া ন্া ধ্া প্া
আ ০ শ রে	রা ০ গ ক	হ ত গু ণী	জা ন স ব
পা –া রা –া	গরা গা সা –া	পা মা গা রা	সা না ধা পা
তিন্ ০ ঝো ০	টি ০ কো ০	স র ল সু	গ ম সু র

অন্তরা

১	×	৩	০
সা –া গা মা	মা –া পা পা	গা গা মা ধা	পা মা গা গা
বা ০ দী গান	ধা ০ র বি	শ দু তি ০	য়া প হে র
ধা মা পা গা	মা রা গা সা	রা না সা ধ্া	ণ্া গ্া ধ্া প্া
জা ন ক রা	০ গ ক হে	চা ত র নি	র ন্ ত র

খাম্বাজ

খাম্বাজ ঠাটের ইহা খাড়ব সম্পূর্ণ রাগিণী। আরোহীতে রেখাব বর্জিত। অবরোহীতে সম্পূর্ণ। যখন এই রাগিণীতে ধৈবত দীর্ঘ করা হয় তখন ইহার সঙ্গত থাকে মধ্যমের সাথে। এই বাড়তের কাজ এইরূপ করা হইয়া থাকে—গা মা ধা –া –া মা না ধা না র্সা। আরোহীতে পঞ্চম কম লাগানো উচিত। এই সুরে নিখাদ মধুর শোনায়। আজকাল আরোহীতে তীব্র নিখাদ দিয়া গাওয়ারও রীতি দেখা যায়। ইহার বাদী গান্ধার ও সম্বাদী স্বর পঞ্চম। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে ইহা গায়। খাম্বাজ ধৈবত মধ্যমের সঙ্গত চমৎকার মিষ্টি শোনায়। যখন গান্ধারে আসিয়া এই রাগিণীর পরিসমাপ্তি হয় তখন খাম্বাজকে স্পষ্ট করিয়া চেনা যায়।

আরোহী : সা গা মা পা ণা ধা না র্সা।
অবরোহী : র্সা ণা ধা পা মা গা—রা সা

লক্ষণগীত—তেতালা

অস্থায়ী : কতে চতর খাম্বাজ রাগিণী জব হরি কামভোজী ঠাট্ রচত, তব।
অন্তরা : সুর গান্ধার কো বাদী বরণত। খাড়ো সম্পূরণ তজত রেখাব তব॥

সুর ও শ্রুতির শেষ চার পৃষ্ঠা জনাব জিয়াদ আলির সৌজন্যে প্রাপ্ত।

বৃন্দাবনী সারং

ইহা কাফি ঠাটের খাড়ব রাগিণী। ইহার আরোহীতে ধৈবত ও গান্ধার বর্জিত। অবরোহীতে কেবল গান্ধার বর্জিত। কিন্তু অবরোহণের ধৈবত দুর্বল বা ক্বচিৎ লাগে মাত্র। বাদী সুর রেখাব ও সম্বাদী পঞ্চম। মধুমাধবীয় নিখাদ সম্বাদী। কোনো কোনো সঙ্গীতগ্রন্থে লিখিত আছে, বৃন্দাবন সারং-এ শুধু তীব্র নিখাদ লাগাইলে মধুমাধবীর সঙ্গে মিলিয়া যাইবার কোনো ভয় থাকে না। অধিকাংশ গায়কই কিন্তু দুই নিখাদ লাগাইয়া থাকেন! অর্থাৎ আরোহণে তীব্র ও অবরোহণে কোমল নিখাদ। চতর পণ্ডিতও তাঁহার লক্ষণ সঙ্গীতে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। আরোহী : সা রা মা পা না র্সা। অবরোহী : র্সা ণা ধা পা মা রা সা।

লক্ষণগীত—ঝাঁপতাল

আস্থায়ী : করত হরপ্রিয়া মেল তজত সুর গান্ধার বিঁদ্রাবনী অধগ অনুলোম আগ বিলোম।

অন্তরা : সম্বাদীকহত রা পা মধুমাধ তজত ধা গা সারং ভেদ এক সব চতর কহত জান।

আস্থায়ী

×		৩			০		১		
রা	রা	রা	পা	মা	রা	রা	সা	–া	সা
ক	র	ত	হ্	র	প্রি	য়া	মে	০	ল
না̩	সা	রা	মা	রা	সা	–া	না	–া	সা
ত	জ	ত	সু	র	গা	ন	ধা	০	র
না̩	সা	রা	মা	মা	পা	–া	পা	ধা	পা
বেন্	দ	রা	০	ব	নী	০	আ	ধ	গ
পা	মা	পা	ধা	পা	মা	রা	না̩	সা	সা
অ	নু	লো	০	ম	আ	গ	বি	লো	ম
মা	পা	নর্সা	–া	র্সা	র্সা	র্সা	না	র্সা	র্সা
স	ম	বা	০	দী	ক	হ্	ত	রে	পা
না	র্সা	র্রা	–া	র্সা	না	র্সা	ণা	ণা	পা
ম	ধু	মা	০	ধ	ত	জ	ত	ধা	গা

মা পা	রা^ম মা মা	পা -া	পা ধা পা
সা ০	র ং গ	তে ০	দ এ ক
র্রা র্সা	পণা পা রা^ম	পা মা	রা না্ সা
স ব	চ ত র	ক হ	ত জা ন

মিয়া কা সারং

ইহাও কাফি ঠাটের অন্তর্গত। ইহাকে তানসেনের ঘরের রাগিণী বলে। ইহাও এক প্রকার সারং। ইহার রেখাব স্পষ্ট। উদারা ও মুদারা গ্রামে এই রাগিণী অত্যন্ত সুখশ্রাব্য হয়। উদারা গ্রামে যেখানে নিখাদ ও ধৈবতের সঙ্গীত হয় সেখানে কতকটা মিয়া কি মল্লারের মত শোনায়। গুণী মাত্রেই জানেন যে, তানসেনের আয়ত্বাধীন ও প্রিয় রাগিণী ছিল কানাড়া। এইজন্য অনেকের মতে এই সারঙেও কতকটা কানাড়ার ছায়া আসা উচিত এবং আসেও। যেসব রাগিনী মুসলমান রাজত্বের সময় গুণী ওস্তাদগণের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে—তাহা গ্রহোক্ত না—কাজেই প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থে এইসব রাগিণী সম্বন্ধে কিছু জানিবার উপায় নাই। কাজেই এইসব ব্যাপারে রেওয়াজ বা প্রচলিত রীতিকে মানিয়া চলাই উচিত। চতর পণ্ডিতও ইহাই বলেন। কোনো গুণী লিখিয়াছেন যে বৃন্দাবনী সারঙে কোমল নিখাদ একেবারে না লাগাইলে যে সারং হইবে—তাহা অন্যসকল সারং হইতে আলাদা হইবে। কিন্তু তাহা যে মিয়াকি সারং হইবে তাহাও স্পষ্ট করিয়া লিখেন নাই।

আরোহী : সা রা মা পা—ধা না র্সা।

অবরোহী : র্সা ণা ধা পা—ক্ষা পা—মা রা সা—না্ ধা্ না্ সা।

রেখাব বাদী–পঞ্চম সম্বাদী। গান্ধার বিবাদী। খড়বজাতীয় রাগিণী।

লক্ষদহন সারং

ইহা কাফি ঠাটের খাড়ব জাতীয় রাগ। আরোহী ও অবরোহী দুয়েই ধৈবত বর্জিত। ইহাও এক প্রকার সারং বলিয়া মানা হয়। ইহাতে, দুই নিখাদ লাগে। রেখাব বাদী ও পঞ্চম সম্বাদী সুর। ইহার রূপ অনেকটা দেশের মত। কিন্তু গান্ধার কোমল হওয়াতে ও ধৈবত বর্জিত হওয়ার জন্য দেশ হইতে অন্যরূপ শোনায়।

আরোহী : পা না্ সা রা জ্ঞা রা মা পা না র্সা।

অবরোহী : র্সা র্ণা র্পা জ্ঞা মা রা সা।

লক্ষণ গীত : ঝাঁপতাল

আস্থায়ী : রট হরপ্রিয়াকো নাম নেত্ মোরে রস নে তন মন দ্রুত ধান কর লে তু আপ্নে।

অন্তরা : জোয়ি জোয়ি ধাওত পরম কল পাওত সারং গা নি কো ভজ চতর আপনে।

আস্থায়ী

×	৩	০	১
পন্সরা রা	রা সা সা	সা সা[র]	না -া পা্
র ট	হ র্ প্রি	য়া কো	র্ন ০ ম
জ্ঞা[ম] জ্ঞা[ম]	জ্ঞা[ম] মা রা	সা সা	সা[র] না্ পা্
নে ত	মো রে	র স	নে ০ ০
মা্ পা্	না্ না্ সা	রা রা	সা রা সা
ত ন	ম ন দু	র ত	ধা ০ ন
জ্ঞা[ম] জ্ঞা[ম]	রা[ম] মা রা	সা সা[র]	না্ -া পা্
ক র	লে তু	আ প	নে ০ ০
মা পা	না র্সা র্সা	র্সা -া	না র্সা র্সা
জো য়ি	জো ০ য়ি	ধা ০	ও ০ ত
মা মা	র্মা র্রা র্সা	র্সা -া	র্সা ণা পা
প র	ম ক ল	পা ০	ও ০ ত
পা রা	রা[ম] মা রা	সা -া	না্ সা সা
সা ০	র ং গ	পা ০	নি ০ কো
জ্ঞা[য] জ্ঞা[য]	মা[জ্ঞ] রা সা	সা সা[র]	না্ -া পা্
ভ জ	চ ত র	আ প	নে ০ ০

শাওন্ত সারং

ইহা কাফি ঠাটের ওড়ব খাড়ব-রাগিণী। আরোহীতে গান্ধার ও ধৈবত সুর বর্জিত। অবরোহণে শুধু গান্ধার বর্জিত। রেখাব বাদী ও পঞ্চম সম্বাদী ইহাও এক প্রকার সারং। গাহিবার সময় দিবা দ্বিপ্রহরে। দুই নিখাদই ব্যবহৃত হয় ইহাতে।

আরোহী : সা রা মা পা না র্সা

অবরোহী : র্সা ণা ধা পা মা পা রা সা।

লক্ষণগীত—ঝাঁপতাল

আস্থায়ী : সাওন্ত সারং বিলাসত য়ভানীযুত জব উতর অঙ্গগত ধৈবত ছুওত ঈষত।

অন্তরা : রে পা করত সখাদ গান্ধার সুর তজত অবরোহ ক্রম ভবাত সুর ছায়া মি ধাপা।

আস্থায়ী

×		৩			০		১		
মা	পা	মা	ধণা	পা	রাম	–া	–া	সা	সা
সা	–া	ও	ন	ত	সা	০	র	ং	গ
মা	রা	মা	পা	পা	পা	মা	ণাম	ধা	পা
বি	লা	স	ত	য়	ভা	০	নি	যু	ত
মা	পা	না	র্সা	র্সা	র্সা	–া	না	র্সা	র্সা
জ	ব	উ	ত	র	অ	ং	গ	গ	ত
নর্সা	সর্রা	র্রা	র্সা	র্সা	ধণা	পমা	মণা	ধা	পা
ধ	ই	ব	ত	ছু	ও	এ	ঈ	ষ	ত
মা	পা	না	র্সা	র্সা	না	র্সা	র্সা	–া	র্সা
রে	পা	ক	র	ত	স	ম	বা	০	দ
না	র্সা	র্সা	–া	র্সা	না	র্সা	র্রা	র্রা	র্রা
গা	০	ন্ধা	০	র	সু	র	ত	জ	ত
মর্রা	মর্রা	র্রা	র্মা	র্রা	র্সা	র্সা	না	র্সা	র্সা
আ	ও	রো	০	হ	ক্র	ম	ভ	জ	ত
র্সানি	সর্রা	র্সা	ণা	পা	পা	মা	ণা	ধা	পা
সু	০	র	ছা	০	য়া	০	নি	ধা	পা

রামদাসী মল্লার

ইহা গ্রন্থোক্ত রাগিণী নয়। বাদশাহ্ আকবরের সময় রামদাস নামক একজন গুণী গায়ক ইহার সৃষ্টি করেন এবং তাঁহার নামেই এই রাগিণীর নামকরণ হয়। ইহা কাফি ঠাটের সম্পূর্ণ জাতীয় রাগিণী। ইহাতে দুই গান্ধার ও দুই নিখাদ ব্যবহৃত হয়। আরোহণে তীব্র গান্ধার ও তীব্র নিখাদ এবং অবরোহণে কোমল নিখাদ ও কোমল গান্ধার ব্যবহৃত হয়। ইহার বাদী সুর মধ্যম ও সম্বাদী ষড়জ। গাহিবার সময়ের উল্লেখ নাই, কিন্তু মল্লার হওয়ার দরুণ ইহা বর্ষাকালের রাগিণী বলিয়া ঐ ঋতুতে গাওয়া উচিত।

আরোহী : না্ সা রা গা মা—পা জ্ঞা মা—ণা পা না র্সা।

অবরোহী : র্সা ণা ধা ণা পা জ্ঞা মা রা সা।

লক্ষণ গীত—আড়াচৌতাল

আস্থায়ী : কহে হর্‌রঙ্গ রামদাসী কি শকল্ গুণী মত
অন্তরা : অনুলোম তাওর গাহত ধা গা সম্বাদী চতর অভিমত।

আস্থায়ী

	৪				×				২		৩			
ণা	পা	জ্ঞা^ম	জ্ঞা^ম	মা	রা	-া	-া	সা	-া	না	সা	সা	সা	না^স
ক	হে	০	হ	র	র	০	ঙ্	গ	০	রা	০	ম	০	দা
	সা	রা	গা	মা	পা	মা	পা	^মজ্ঞা	মা	পা	মা	^পণা	পা	^পণা
	০	সী	০	কি	শ	ক	০	ল	০	গু	ণী	ম	৩	(ক)

অন্তরা

পা	ধা	না	র্সা	র্সা	র্সা	র্রা	র্সা	র্রা	না	র্সা	র্সা	^পণা	পা	মা
অ	নু	লো	০	ম	তা	০	ও	র	গা	হ	ত	ধা	গা	স
	মা	মা	জ্ঞা	মা	পা	মা	পা	র্সা	মা	পা	মা	^পণা	পা	ণা
	ম	বা	০	দী	চ	ত	০	র	০	অ	ভি	ম	ত	(ক)

‘সুর ও শ্রুতি’
নজরুলের পাণ্ডুলিপি

৮৩

নীলাম্বরী

শুদ্ধ সারং

৪৪

'সুর ও শ্রুতি' নজরুলের পাণ্ডুলিপি

দ্রষ্টব্য : সুর ও শ্রুতির শেষ চার পৃষ্ঠা জনাব জিয়াদ আলির সৌজন্যে প্রাপ্ত।

অগ্রন্থিত গান

লাল নটের ক্ষেতে, লাল টুকটুকে বউ যায় গো
(তার)আল্‌তা পায়ের চিহ্ন এঁকে [illegible] গাঁয় গো ।।

লাল নটের ক্ষেতে মৌমাছি ওঠে মেতে
তার রূপের আঁচে পায়ের তলার মাটি ওঠে তেতে।
লাল পুঁইয়ের লতা নুয়ে [illegible] পায় গো ।।

কাঁকাল বাঁকা রাখাল ছোঁড়া আগলে দাঁড়ায় আল —
রাঙা বৌয়ের চোখে লাগে লাল লঙ্কার ঝাল।

বৌয়ের ঘেমে ওঠে গা
লাজে সরে না পা
সে মুখ ফিরিয়ে শাড়ির আঁচল আঙুলে জড়ায় গো ।।

২

আমি অগ্নি-শিখা, মোরে বাসিয়া ভালো
যদি চাও, তব অন্তরে প্রদীপ জ্বালো ।।

মোর দহন-জ্বালা রবে আমারি বুকে,
তব তিমির রাতে হব রঙিন আলো ।।
হব তোমার প্রেমে নব উদয়-রবি,
আমি মুছাব প্রাণের তব বিষাদ-কালো ।।
লয়ে বহ্নি-দাহ, প্রিয়, করো না খেলা,
কবে লাগিবে আগুন, হায় ভাঙিবে মেলা ;
শেষে আমার মতো কেন মরিবে জ্বলে ;
তুমি মেঘের মায়া, শুধু সলিল ঢালো ।।
মোরে আঁচলে ঢেকে তুমি বাঁচালে বঁধু
আজ তুমিই আমার দ্বারে নিভায়ো না গো ।।

৩

না মিটিতে সাধ মোর নিশি পোহায়।
গভীর আঁধার ছেয়ে
আজো হিয়ায়॥

আমার নয়ন ভরে
এখনো শিশির ঝরে,
এখনো বাহুর 'পরে
বধূ ঘুমায়॥

এখনো কবরী-মূলে
কুসুম পড়েনি ঢুলে,
এখনো পড়েনি খুলে
মালা খোঁপায়॥

নিভায়ে আমার বাতি
পোহাল সবার রাতি;
নিশি জেগে মালা গাঁথি,
প্রাতে শুকায়॥

৪

মাদল বাজিয়ে এল বাদ্‌লা মেঘ এলোমেলো
মাতলা হাওয়া এল বনে।
ময়ূর-ময়ূরী নাচে কালো জামের গাছে
পিয়া পিয়া বন-পাপিয়া ডাকে আপন মনে॥

বেত-বনের আড়ালে ডাহুকী ডাকে,
ডাকে না এমন দিনে কেহ আমাকে;
বেণীর বিনুনি খুলে খুলে পড়ে
একলা মন টেকে না ঘরের কোণে॥

জঙ্গল পাহাড় কাঁপে বাজের আওয়াজে,
বুকের মাঝে তবু নূপুর বাজে;
ঝিঁঝি তার ডাক ভুলে
ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ বৃষ্টির বাজনা শোনে॥

৫

ভুল করিলে বনমালী এসে বনে ফুল ফোটাতে।
বুলবুলি যে ফুলও ফোটায় বন-মাতানোর সাথে সাথে॥

আঘাত দিলে, দিলে বেদন,
রাঙাতে হায় পারলে না মন ;
প্রেমের কুঁড়ি ফুটল না তাই, পড়ল ঝরে নিরাশাতে॥

আমায় তুমি দেখলে না কো দেখলে আমার রূপের মেলা ;
হায় রে দেহের শ্মশান-চারী, শব নিয়ে মোর করলে খেলা।
শয়ন-সাথী হলে আমার, রইলে না কো নয়ন-প্যাতে॥

ফুল তুলে হায় ঘর সাজালে, করলে না কো গলার মালা ;
ত্যজি' সুধা পিয়ে সুরা হলে তুমি মাতোয়ালা।
নিশাস ফেলে নিভাইলে যে-দীপ আলো দিত রাতে॥

৬

গজল

দূর বনান্তের পথ ভুলি' কোন্ বুলবুলি
বুকে মোর আসিলি, হায় !
হায় আনন্দের দূত যে তুই, তবু তোর চোখে
কেন জল কি ব্যথায়॥

কোথা দিই ঠাঁই তোরে ওরে ভীরু পাখি,
বেদনাময় আমারো প্রাণ,
এ মরুতে নাই তরু, নাই তোর তৃষার তরে
জল যে হেথায়॥

নিকুঞ্জে কার গাইতে গেলি গান,
বিঁধিল বুক কন্টকে,
হায় পুড়িয়া বৈশাখে এলি ভিজিতে
অশ্রুর বরষায়॥

৭

ভেসে আসে সুদূর স্মৃতির সুরভি
হায় সন্ধ্যায়।
রহি রহি কাঁদি ওঠে সকরুণ পূরবী
আমারে কাঁদায়॥

কারা যেন এসেছিল,
এসে ভালোবেসেছিল,
ম্লান হয়ে আসে মনে তাহাদের সে ছবি
পথের ধূলায়॥

কেহ গেল দলি', কেহ ছলি', কেহ গলিয়া
নয়ন-নীরে;
যে গেল সে জনমের মত গেল চলিয়া,
এল না ফিরে'।
কেহ দুখ দিয়া গেল,
কেহ ব্যথা নিয়া গেল,
কেহ সুধা পিয়া গেল,
কেহ বিষ-করবী;
তাহারা কোথায়, হায় তাহারা কোথায়॥

৮

জানি আমার সাধনা নাই, আছে তবু সাধ,
তুমি আপনি এসে ধরা দেবে দূর-আকাশের চাঁদ॥
চকোর নহি মেঘও নহি,
আপন ঘরে বন্দী রহি'
আমি শুধু মনকে কহি—
'কাঁদ্ নিশিদিন কাঁদ্'॥

কূল-ডুবানো জোয়ার কোথায় পাব, হে সুন্দর?
হে চাঁদ, আমি সাগর নহি, পল্লী-সরোবর।
আমি পল্লী-সরোবর।

নিশীথ-রাতে আমার নীরে
প্রেমের কুমুদ ফোটে ধীরে,
মোর ভীরু প্রেম যেতে নারে
ছাপিয়ে লাজের বাঁধ॥

৯

সাঁওতালি সুর

তেপান্তরের মাঠে বঁধু হে একা বসে থাকি।
তুমি যে-পথ দিয়ে গেছ চলে, তারি ধূলা মাখি হে
একা বসে থাকি॥

যেমন পা ফেলেছ গেরি মাটির রাঙা পথের ধূলাতে
অমনি করে আমার বুকে চরণ যদি বুলাতে,
আমি খানিক জ্বালা ভুলতাম ঐ মানিক বুকে রাখি॥

আমার খাওয়া-পরার নাই রুচি আর ঘুম আসে না চোখে,
আমি আউরি হয়ে বেড়াই পথে, হাসে পাড়ার লোকে
দেখে হাসে পাড়ার লোকে।

আমি জল-পুকুরে যেতে নারি, এ কি তোমার মায়া হে,
আমি কালো জলে দেখি তোমার কালো-রূপের ছায়া হে!
আমার কলঙ্কিনী নাম রটিয়ে তুমি দিলে ফাঁকি॥

১০

আমার সুরের ঝর্না-ধারায় করবে তুমি স্নান।
ওগো বধূ, কণ্ঠে আমার তাই ঝরে এই গান॥

কেশে তোমার পরবে বালা
তাই গাঁথি এই গানের মালা,
তোমার টানে ভাব-যমুনায় বহিছে উজান॥

আমার সুরের ইন্দ্রাণী গো, উঠবে তুমি বলে
নিত্য বাণীর সিন্ধুতে মোর মন্থন তাই চলে।

সিংহাসনের সুর-সভাতে
বসবে রানীর মহিমাতে,
সৃজন করি সেই গরবে সুরের পরীস্থান ॥

১১'

ছাত্র-সঙ্গীত

জাগো রে তরুণ জাগো রে ছাত্রদল !
স্বতঃ-উৎসারিত ঝর্ণাধারার প্রায়
জাগো প্রাণ-চঞ্চল ॥

ভেদ-বিভেদের গ্লানির কারা-প্রাচীর
ধূলিসাৎ করি জাগো উন্নত শির
জবা-কুসুম-সঙ্কাশ জাগো বীর,
বিধি-নিষেধের ভাঙো ভাঙো অর্গল ॥

ধর্ম-বর্ণ-জাতির ঊর্ধ্বে জাগো রে নবীন প্রাণ !
তোমার অভ্যুদয়ে হোক সব বিরোধের অবসান।
সংকীর্ণতা ক্ষুদ্রতা ভোলো ভোলো,
সকল মানুষে ঊর্ধ্বে ধরিয়া তোলো !
তোমাদেরে চাহে আজ নিখিল জন-সমাজ
আনো জ্ঞান-দীপ এই তিমিরের মাঝ,
বিধাতার সম জাগো প্রেম-প্রোজ্জ্বল ॥

১২

এস ফিরে প্রিয়তম এস ফিরে।
আঁখির আলোক হায় জীবনের সন্ধ্যায়
ডুবে যায় নিরাশা-তিমিরে ॥

আসে যে-পথে প্রভাতী আলোর ধারা,
যে-পথে আসে চাঁদ, রাতের তারা
নিতি সেই পথে চাই,
যদি তব দেখা পাই,
শুধাই তোমার কথা দক্ষিণ সমীরে ॥

খুঁজে ফিরি ঝরা ফুলে নদীর স্রোতে,
ঘর-ছাড়া পথিক ধায় যে পথে,
তব পথ, হে সুদূর,
কত দূর, কত দূর,
কোথা পাব তব দেখা
(কোন) কালের তীরে॥

১৩

তোমার দেওয়া ব্যথা, সে যে
তোমার হাতের দান।
তাই ত সে-দান মাথায় তুলে
নিলাম, হে পাষাণ॥

তুমি কাঁদাও, তাই ত বঁধু,
বিরহ মোর হল মধু,
সে যে আমার গলার মালা
তোমার অপমান॥

আমি বেদীমূলে কাঁদি
তুমি পাষাণ অবিচল
জানি হে নাথ, সে যে তোমার
পূজা নেওয়ার ছল।

তোমার দেবালয়ে মোরে
রাখলে পূজারিণী করে,
সেই আনন্দে ভুলেছি নাথ
সকল অভিমান॥

১৪

আশাবরী মিশ্র-লাউনী

ঝরল যে-ফুল ফোটার আগেই
তারি তরে কাঁদি, হায়!

মুকুলে যার মুখের হাসি
চোখের জলে নিভে যায়॥
হায় যে বুলবুল গুল-বাগিচায়
গোলাপকুঁড়ির গাইত গান,
আকুল ঝড়ে আজ সে পড়ে
পথের ধূলায় মূরছায়॥

সুখ-নদীর উপকূলে
বাঁধিল সে সোনার ঘর।
আজ কাঁদে সে গৃহ-হারা
বালুচরে নিরাশায়॥

যাবার যারা, যায় না তারা
থাকে কাঁটা, ঝরে ফুল।
শুকায় নদী মরুর বুকে,
প্রভাত-আলো মেঘে ছায়॥

১৫

চমকে চপলা, মেঘে মগন গগন।
গরজিছে রহি রহি অশনি সঘন॥

লুকায়েছে গ্রহতারা, দিবসে ঘনায় রাতি,
শূন্য কুটিরে কাঁদি, কোথায় ব্যথার সাথী,
ভীত চমকিত চিত সচকিত শ্রবণ॥

অবিরত বাদল বরষিছে ঝরঝর
বহিছে তরলতর পুবালী পবন।
বিজলি-জ্বালার মালা পরিয়া কে মেঘবালা
কাঁদিছে আমারি মত বিষাদ-মগন॥

ভীরু এ মন-মৃগ আলয় খুঁজিছে ফিরে',
জড়ায়ে ধরিছে লতা সভয়ে বনস্পতিরে,
গগনে মেলিয়া শাখা বন-উপবন॥

১৬
খাম্বাজ–কাওয়ালি

হাওয়াতে নেচে নেচে যায় ঐ তটিনী
পাহাড়ের পথ–ভোলা কিশোরী নটিনী ॥
তরঙ্গ–আঁচল দুলায়ে,
বন–ভূমির মন ভুলায়ে,
চলেছে চপল পায়ে
একাকিনী উদাসিনী ॥

এঁকেবেঁকে থম্‌কে গিয়ে
হরিণীরে চম্‌কে দিয়ে
ছুটিয়া যায় সুদূরে ;
আয় আয় বলি' ডাকে কে কূলের বধূরে।

কূলে কূলে ফুটিয়ে ফুল
টগর জবা পলাশ শিমুল,
নেচে চলে পথ বেভুল
ঘর–ছাড়া বিবাগিনী ॥

১৭
কীর্তন

তব চরণ–প্রান্তে মরণ–বেলায় শরণ দিও, হে প্রিয়।
তুমি মুছায়ে ক্লান্তি, ঘুচায়ে শ্রান্তি (প্রাণে) শান্তি বিছায়ে দিও ॥

বরণের ডালা সাজায়ে, হে স্বামী,
সারাটি জীবন চেয়ে আছি আমি ;
তুমি নিমেষের তরে মোর দ্বারে থামি'
সে ডালা চরণে নিও ॥

তারপর আছে মোর চির–সাথী
অকূল আঁধার অনন্ত রাতি,
ক্ষোভ নাই, যদি নিভে যায় বাতি,—
তুমি এসে জ্বালাইও ॥

যে যাহা চেয়েছে, পেয়েছে সে কবে ;
আশা ঝরে যায় নিরাশে নীরবে,
আঘাত বেদনা বঁধু, সব স'বে (শুধু)
একবার দেখা দিও॥

১৮

চোখে চোখে চাহ যখন
তোমরা দুটি পাখি,
সেই চাহনি দেখি আমি
অন্তরালে থাকি'॥

মনে জাগে, অনেক আগে
এমনি গভীর অনুরাগে
আমার পানে চাইত কেহ
এমনি অরুণ-আঁখি॥

ঘুমাও যখন তোমরা দু'জন
পাখায় বেঁধে পাখা,
আমি দূরে জেগে থাকি,
যায় না কাঁদন রাখা।

পরশ যেন লেগে আছে
শূন্য আমার বুকের কাছে,
তোমার মতন ঘুমাত কেউ
এই বুকে মুখ রাখি'॥

১৯

সুরদাসী মল্লার-তেতালা

এল বরষা শ্যাম সরসা প্রিয়-দরশা।
দাদুরী পাপিয়া চাতকী বোলে
নব-জলধারা-হরষা॥

নাচে বন-কুন্তলা যামিনী উতলা,
খুলে পড়ে গগনে দামিনী মেখলা,

চলে যেতে ঢলে পড়ে অভিসারে
চপলা যৌবন-মদ-অলসা॥

একা কেতকী বনে কেকা কুহরে,
বহে পুব-হাওয়া কদম্ব শিহরে।

দুরন্ত ঝড়ে কোন্ অশান্ত চাহি রে
ঘরে নাহি রহে মন, যেতে চায় বাহিরে,
যত ভয় জাগে তত সুন্দর লাগে
শ্রাবণ-ঘন-তমসা॥

২০
গজল-গান

এলে কি স্বপন-মায়া আবার আমায় গান গাওয়াতে।
নিদাঘের দগ্ধ জ্বালা করলে শীতল পুব-হাওয়াতে॥

ছিল যে পাষাণ-চাপা আমার গানের উৎস-মুখে॥
তারে আজ মুক্তি দিলে ঐ রাঙা চরণ-আঘাতে॥

এলে কি বর্ষারানী নিরশ্রু মোর নয়ন-লোকে।
বহালে আবার সুরের সুরধুনী বেদনাতে॥

এসেছ ঘূর্ণি হাওয়া হয়ত বা ভুল এক নিমেষের।
এসেছ সঙ্গে নিয়ে বজ্র ভরা ঝঞ্ঝা-রাতে॥

তবু ঐ ভুল যে প্রিয় ফুল ফুটাল শুষ্ক শাখে।
আকাশের তপ্ত নয়ন জুড়িয়ে গেল ঐ চাওয়াতে॥

তোমার ঐ সোনার হাতের সোনার চুড়ির তালে তালে
নাচে মোর গানের শিখী মনের গহন মেঘলা রাতে॥

এলে কি তারার দেশের হারিয়ে যাওয়া সুরের পরী।
শ্রান্ত এ বাণ-বেঁধা মোর গানের পাখির ঘুম ভাঙাতে॥

এলে আজ বাদলা-শেষে ইন্দ্রধনুর রঙিন মায়া।
ছোটে সুর উজান স্রোতে, চোখ জুড়াল রূপ-শোভাতে॥

দার্জিলিং
২০শে জুন, ১৯৩১

২১

মার্চের সুর

কল-কল্লোলে ত্রিংশ কোটি-কণ্ঠে উঠেছে গান।
জয় আর্যাবর্ত, জয় ভারত, জয় হিন্দুস্থান॥

শিরে হিমালয় প্রহরী, পদ বন্দে সাগর যাঁর,
শ্যামল বনানী কুন্তলা-রানী জন্মভূমি আমার।
ধূসর কভু উষর মরুতে,
কখনো কোমল লতায় তরুতে,
কখনো ঈশানে জলদ-মন্দ্রে বাজে মেঘ-বিষাণ॥

সকল জাতি সকল ধর্ম পেয়েছে হেথায় ঠাঁই,
এসেছিল যারা শত্রুর রূপে, আজ সে স্বজন ভাই।
বিজয়ীর বেশে আসিল যাহারা,
আজ মা-র কোলে সন্তান তারা,
তাই মা'র কোল নিয়ে করি কাড়াকাড়ি হিন্দু-মুসলমান॥

জৈন পার্শি বৌদ্ধ শাক্ত খ্রিস্টান বৈষ্ণব
মা'র মমতায় ভুলিয়া বিরোধ এক হয়ে গেছে সব।
ভুলি' বিভিন্ন ভাষা আর বেশ !
গাহিছে সকলে ; আমার স্বদেশ !
শত দলে মিলি' শতদল হয়ে করিছে অর্ঘ্য দান॥

২২

গজল নাতিয়া

তোমার নামে এ কী নেশা
হে প্রিয় হজরত !
যত ডাকি তত কাঁদি
মেটে না হস্‌রত॥

কোথায় আরব, কোথায় এ হিন্দ্,
নয়নে মোর নাই তবু নিন্দ্,
আমার প্রাণে শুধু জাগে তোমার
মদিনার ঐ পথ॥

কে বলে তুমি গেছ চলে হাজার বছর আগে,
আছ লুকিয়ে তুমি প্রিয়তম আমার অনুরাগে।
মোর অন্তরের হেরা গুহায়
আজও তোমার ডাক শোনা যায়,
জাগে আমার প্রেমের 'কাবা'–ঘরে হজরত
তোমারি সুরত॥

যারা দোজখ হতে ত্রাণের তরে তোমায় ভালোবাসে,
আমার এ প্রেম দেখে তারা কেউ কাঁদে কেউ হাসে।
তুমি জান, হে মোর স্বামী,
শাফায়ৎ চাহি না আমি,
আমি শুধু তোমায় চাহি হজরত
তোমার মহব্বত্॥

২৩
ইসলামী গান

আমি যদি আরব হতাম, মদিনারই পথ।
এই পথে মোর চলে যেতেন নূর–নবী হজরত॥

পয়জার তাঁর লাগ্‌ত এসে আমার কঠিন বুকে,
আমি ঝর্ণা হয়ে গলে যেতাম অম্‌নি পরম সুখে।
সেই চিহ্ন বুকে পুরে
পালিয়ে যেতাম কোহ্–ই–তুরে,
(সেথা) দিবানিশি কর্‌তাম তাঁর কদ্‌ম জিয়ারত॥

মা ফাতেমা খেল্‌ত এসে আমার ধূলি লয়ে,
আমি পড়তাম তাঁর পা'য় লুটিয়ে ফুলের রেণু হয়ে।
হাসান হোসেন হেসে হেসে
নাচ্‌ত আমার বক্ষে এসে,
চক্ষে আমার বইত নদী পেয়ে সে ন্যামত্॥

আমার বুকে পা ফেলে রে বীর আস্‌হাব যত
রণে যেতেন দেহে আমার 'আঁকি' মধুর ক্ষত।
কুল্ মুসলিম আস্‌ত কাবায়,
চলতে পায়ে দল্‌ত আমায়,
আমি চাইতাম খোদার দিদার শাফায়াৎ জিন্নত॥

২৪

গজল

ওগো মুর্শিদ পীর। বলো বলো
রসুল কোথায় থাকে?
কোথায় গেলে কেমন করে
দেখতে পাব তাঁকে?

বেহেশ্‌ত্‌-পারে দূর আকাশে
তাঁহার আসন খোদার পাশে,
সে এতই প্রিয়, আপনি খোদা
লুকিয়ে তারে রাখে॥

কোরান পড়ি, হাদিস শুনি,
সাধ মেটে না তাহে,
আতর পেয়ে মন যে আমার
ফুল দেখতে চাহে।
সবাই খুশি ঈদের চাঁদে,
আমার কেন পরান কাঁদে?
দেখ্‌ব কখন, আমার ঈদের
চাঁদ-মোস্তফাকে॥

২৫

মোনাজাত

শোনো শোনো য়্যা ইলাহি
আমার মোনাজাত।
তোমারি নাম জপে যেন
আমার হৃদয় দিবস-রাত॥

যেন কানে শুনি সদা
তোমারি কালাম, হে খোদা,
চোখে যেন দেখি শুধু
কোরআনের আয়াত॥

মুখে যেন জপি আমি
কল্‌মা তোমার দিবস-যামী,

তোমার মসজিদেরই ঝাড়ু-বর্দার
হোক্ আমার এ হাত॥

সুখে তুমি, দুখে তুমি,
চোখে তুমি, বুকে তুমি,
এই পিয়াসী প্রাণের খোদা
তুমিই আব্-হায়াত্॥

২৬

মোনাজাত

আমারে সকল ক্ষুদ্রতা হতে
বাঁচাও প্রভু উদার !
হে প্রভু, শেখাও — নীচতার চেয়ে
নীচ পাপ নাহি আর॥

যদি শতেক জন্ম পাপে হই পাপী,
যুগ-যুগান্ত নরকেও যাপি,
জানি জানি প্রভু, তারও আছে ক্ষমা-
ক্ষমা নাই নীচতার॥

ক্ষুদ্র করো না, হে প্রভু, আমার
হৃদয়ের পরিসর,
যেন হৃদয়ে আমার সম ঠাঁই পায়
শত্রু-মিত্র-পর।

নিন্দা না করি ঈর্ষায় কারো
অন্যের সুখে সুখ পাই আরো,
কাঁদি তারি তরে অশেষ দুঃখী
ক্ষুদ্র আত্মা যার॥

২৭

ইসলামী

নবীর মাঝে রবির সময়
আমার মোহাম্মদ রসুল।

খোদার হবিব দীনের নকিব
বিশ্বে নাই যার সমতুল ॥

পাক আরশে পাশে খোদার
গৌরবময় আসন যাঁহার,
খোশ-নসিব উম্মত আমি তাঁর
পেয়েছি অকূলে কূল ॥

আনিলেন যিনি খোদার কালাম,
তাঁর কদমে হাজার সালাম ;
ফকীর দরবেশ জপি' সেই নাম
ঘর ছেড়ে হল বাউল ॥

জানি, উম্মত আমি গুনাহ্গার,
হব তবু পুল্‌সরাত পার ;
আমার নবী হজরত আমার
কর মোনাজাত্‌ কবুল ॥

এন্‌ ৭১৯১

২৮
হাম্‌দ

তুমি আশা পুরাও খোদা,
সবাই যখন নিরাশ করে।
সবাই যখন পায়ে ঠেলে,
সান্ত্বনা পাই তোমায় ধরে ॥

দ্বারে দ্বারে হাত পাতিয়া
ফিরি যখন শূন্য হাতে,
তোমার দানের শিরনি তখন
আসে আমায় পথ দেখাতে।
দেখি হঠাৎ শূন্য
তোমার দানে গেছে ভরে ॥

খোদা তোমার ভরসা করি'
নামি যখন কোনো কাজে,
সে কাজ হাসিল্ হয় সহজে
শত বিপদ–বাধার মাঝে।
(খোদা) তোমায় ছেড়ে অন্য জনে
শরণ নিলে, যায় সে সরে॥

মাঝ–দরিয়ায় ডুব্‌লে জাহাজ
তোমায় যদি ডাকি,
তোমার রহম কোলে করি'
তীরেতে যায় রাখি'।
দুখের অনল কুসুম হয়ে
ফুটে ওঠে থরে থরে॥

এফ্. টি. ১৩৩৩৩

২৯

মা গো আমায় শিখাইলি কেন আল্লা নাম
নাম জপিলে আর হুঁশ থাকে না, ভুলি সকল কাম॥
লোকে বলে, আল্লাতা'লায় যায় না না–কি পাওয়া ;
ও– নাম জপিলে প্রাণে কেন বহে দখিন হাওয়া !
ও–নাম জপিলে হিয়ার মাঝে
কেন এত ব্যথা বাজে,
কে তবে মা আমার বুকে কাঁদে অবিরাম॥

পুরুষরা সব মস্‌জিদে যায়
আমি ঘরে কাঁদি ;
কে যেন কয় কানের কাছে —
তুই যে আমার বাঁদী
তাই ঘরে রাখি বাঁধি'।

মা গো আমার নামাজ রোজা খোদায় ভালোবাসা,
ঐ নাম জপিলেই মিটে আমার বেহেশ্‌তের পিয়াসা !
শত ঈদের চাঁদও দিতে নারে আল্লাহ্ নামের দাম॥

কিউ. এস. ৫২১

৩০

যে পেয়েছে আল্লার নাম সোনার কাঠি
তার কাছে ভাই এই দুনিয়া দুধের বাটি ॥

দ্বীন্ দুনিয়া দুই-ই পায় সে মজা লোটে,
রোজা রেখে সন্ধ্যাবেলা শির্‌নি জোটে।
সে সদাই বিভোর পিয়ে খোদার এশ্‌ক খাঁটি ॥

সে গৃহী, তবু ঘরে তাহার মন থাকে না ;
হাঁসের মতন জলে থেকেও জল মাখে না।
তার সবই সমান খাঁটি সোনা, এঁটেল মাটি ॥

সবই খোদার দান ভেবে সে গ্রহণ করে,
দুঃখ-অভাব সুখের মতোই জড়িয়ে ধরে
ভোগ করে সে নিত্য বেহেশ্‌ত্ পরিপাটী ॥

এফ্. টি. ১৩২১৭

৩১

আল্লাজী গো আমি বুঝি না রে তোমার খেলা।
তাই দুঃখ পেলে ভাবি বুঝি হানিলে হেলা ॥

কুমার যখন হাঁড়ি গড়ে, কাঁদে মাটি,
ভাবে, কেন পোড়ায় আমায় চড়িয়ে ভাটি।
ফলদানি হয় পোড় খেয়ে সেই মাটির ঢেলা ॥

মা শিশুরে ধোয়ায় মোছায়, শিশু ভাবে —
ছাড়া পেলে মা ফেলে সে পালিয়ে যাবে
মোরা দোষ করে তাই দুষি তোমায় সারা বেলা ॥

আমরা তোমার বান্দা খোদা তুমি জানো,
কেন হাসাও কেন কাঁদাও, আঘাত হানো।
যে গড়তে জানে, তারি সাজে ভেঙে ফেলা ॥

এফ্. টি. ১৩২১৭

৩২

আল্লাহ্ নামের নায়ে চড়ে যাব মদিনায়।
মোহাম্মদের নাম হবে মোর
(ও ভাই) নদী-পথে পুবান বায়॥

চার ইয়ারের নাম হবে মোর সেই তরণীর দাঁড়;
কল্‌মা শাহাদতের বাণী হাল ধরিবে তার।
খোদার শত নামের গুন্ টানিব
(ও ভাই) নাও যদি না যেতে চায়॥

মোর নাও যদি না চলিতে দেয় সাহারার বালি,
মরুভূমে বান ডাকাব, পানি দিব ঢালি'
চোখের পানি দিব ঢালি'।
তাবিজ হয়ে দুল্‌বে বুকে কোরান, খোদার বাণী;
আঁধার রাতে ঝড়-তুফানে আমি কি ভয় মানি!
আমি তরে যাব রে
তরী যদি ডুবে তারে না পায়॥

কিউ. এস্. ৫২১

৩৩

যেদিন রোজ হাশরে করতে বিচার
তুমি হবে কাজী,
সেদিন তোমার দিদার আমি
পাব কি আল্লাজী॥

সেদিন না-কি তোমার ভীষণ কাহ্‌হার-রূপ দেখে
পীর পয়গাম্বর কাঁদবে ভয়ে 'ইয়া নফ্‌সি' ডেকে।
সেই সুদিনের আশায় আমি নাচি এখন থেকে
আমি তোমায় দেখে হাজার বার দোজখ যেতে রাজি (আল্লা)॥

যে রূপে হোক বারেক যদি দেখে তোমায় কেহ,
দোজখ কি আর ছুঁতে পারে পবিত্র তার দেহ।
সে হোক না কেন হাজার পাপী, হোক্ না বে-নামাজি॥

ইয়া আল্লাহ্, তোমার দয়া কত, তাই দেখাবে বলে
রোজ হাশরে দেখা দিবে বিচার করার ছলে।
প্রেমিক বিনে কে বুঝিবে তোমার এ কার্‌সাজি॥

কে. ডি. বি. ১৫.৪৮

৩৪

আবে-হায়াতের পানি দাও, মরি পিপাসায়।
শরণ নিলাম নবীজীর মোবারক পা'য়॥

ভিখারিরে ফিরাবে কি শূন্য হাতে,
দয়ার সাগর তুমি যে মরু সাহারায়॥
অন্ধ আমি আঁধারে মরি ঘুরিয়া,
দেখাবে না-কি মোরে পথ, এই নিরাশায়॥

যে-মধু পিয়ে রহে না ক্ষুধা তৃষ্ণা,
মরার আগে সেই মধু দিও গো আমায়॥

এফ্, টি. ১৩৪৫৪

৩৫

আমি বাণিজ্যেতে যাব এবার মদিনা শহর।
আমি এদেশে হায় গুনাহ্‌গারি দিলাম জীবন ভর্॥

পাঞ্জেগানার বাজার যেথা বসে দিনে রাতে,
দুটি টাকা 'আল্লাহ্' 'রসুল্' পুঁজি নিয়ে হাতে
কত পথের ফকির সওদা করে হল সওদাগর॥

সেথা আজান দিয়ে কোরান পড়ে ফেরিওয়ালা হাঁকে,
বোঝাই করে দৌলত দেয়, যে সাড়া দেয় ডাকে।
ওগো জানেন তাহার পাকে কাবা খোদার আফিস্-ঘর॥

বেহেশ্‌তে রোজগারের পরে ছাড়পত্র পায়,
পায় সে সাহস ঈমান–জাহাজ যদি ডুবে যায়।
ওগো যেতে খোদার খাস্‌–মহলে পায় সে সীল্‌মোহর॥

এফ. টি. ১৩৯৩৭

৩৬

আমার ধ্যানের ছবি আমারি হজরত।
ও–নাম প্রাণে মিটায় পিয়াসা
আমার তামান্না আমারি আশা
আমার গৌরব আমার ভরসা
এ দীন গুনাহ্‌গার তাঁহারই উম্মত॥
ও–নামে রওশন জমিন আস্‌মান
ও–নামে মাখা তামাম জাহান
ও–নাম দরিয়ায় বহায় উজান
ও–নাম খেয়ায় মরু ও পর্বত॥

আমার নবীর নাম জপে নিশিদিন
ফেরেশ্‌তা আর হুর পরী জিন্‌,
ও–নাম যদি আমার ধ্যানে রয়
পাব কিয়ামতে তাঁহার শাফায়ত্‌॥

এন্‌. ৭৪৭৮

৩৭

ঐ হের রসুলে–খোদা এল ঐ।
গেলেন মদিনা যবে হিজরতে হজরত
মদিনা হল যেন খুশিতে জিন্নত,
ছুটিয়া আসিল পথে মর্দ ও আওরত
লুটায়ে পায়ে নবীর, গাহে সব
(মোর) ঐ হের রসুলে–খোদা এল ঐ॥

হাজার সে কাফের সেনা বদরে,
তিন শত তের মোমিন এধারে ;
হজরতে দেখিল যেই, কাঁপিয়া ডরে
কহিল কাফের সব তাজিমের ভরে
ঐ হের রসুলে-খোদা এল ঐ ॥

কাঁদিবে কেয়ামতে গুনাহ্‌গার সব,
নবীর কাছে শাফায়তি করিবেন তলব,
আসিবেন কাঁদন শুনি' সেই শাহে-আরব
অমনি উঠিবে সেথা খুশির কলরব
ঐ হের রসুলে-খোদা এল ঐ ॥

এন্‌. ৭৪৯৯

৩৮

আমি যেতে নারি মদিনায়, আমি নারী হে প্রিয় নবী !
আমারই ধ্যানে এস প্রাণে এস আল্‌-আরবী ॥

তপ্ত যে নিদারুণ আরবের সাহারা গো
শীতল হৃদে মম রাখিব তোমারই ছবি ॥

ভালোবাস যদি সে মরুভূ ধূসর গো
জ্বালায়ে হৃদি মম করিব সাহারা গোবি ॥

হে প্রিয়তম, গোপনে তব তরে আমি কাঁদি
তোমারে দিয়াছি মম দুনিয়া আখের সবই ॥

এন্‌. ৯৭৬১

৩৯

পুবান হাওয়া পশ্চিমে যাও কাবার পথে বইয়া।
যাও রে বইয়া এই গরিবের সালাম খানি লইয়া ॥

কাবার জিয়ারতের আমার নাই সম্বল ভাই,
সারা জনম সাধ ছিল যে মদিনাতে যাই (রে ভাই!)
মিট্‌ল না সাধ, দিন গেল মোর দুনিয়ার বোঝা বইয়া॥

তোমার পানির সাথে লইয়া যাও রে আমার চোখের পানি,
লইয়া যাও রে এই নিরাশের দীর্ঘ নিশাস খানি।
নবীজীর রওজায় কাঁদিও ভাই রে আমার হইয়া॥

মা ফাতেমা হজরত আলীর মাজার যেথায় আছে,
আমার সালাম দিয়া আইস (রে ভাই) তাদের পায়ের কাছে।
কাবায় মোনাজাত করিও আমার কথা কইয়া॥

এন্. ১৯৭০৭

৪০

রসুল নামের ফুল এনেছি রে
আয় গাঁথবি মালা কে?
এই মালা নিয়ে রাখবি বেঁধে
আল্লাতা'লাকে॥

অতি অল্প ইহার দাম
শুধু আল্লা রসুল নাম,
এই মালা প'রে দুঃখ–শোকের
ভুলবি জ্বালাকে॥

এই ফুল ফোটে ভাই দিনে রাতে
(ভাই, রে ভাই!) হাতের কাছে তোর,
ও তুই কাঁটা নিয়ে দিন কাটালি রে
তাই রাত হলো না ভোর।

এর সুগন্ধ আর রূপ বয়ে যায়
নিত্য এসে তোর দরজায় রে,
পেয়ে ভাতের থালা ভুল্‌লি রে তুই
চাঁদের থালাকে॥

৪১

আমিনা-দুলাল এস মদিনায় ফিরিয়া আবার
ডাকে ভুবন-বাসী।
হে মদিনার চাঁদ, জ্যোতিতে তোমার, আঁধার ধরার
মুখে ফোটাও হাসি॥

নয়নেরই পিয়ালায় আনো হজরত
তরাইতে পাপীরে খোদার রহমত ;
আবার কাবার পানে ডাকো সকলে
বাজায়ে মধুর কোরানের বাঁশি॥

শোকে বেদনার পাপের জ্বালায় হের প্রায় আজি বিশ্ব-নিখিল
খোদার হাবিব এসে বাঁচাও বাঁচাও, বসাও খুশীর হাট
তাজা কর দীল
প্রেম-কওসর দিয়ে বেহেশ্‌ত হতে
মেহ্‌বুব পাঠাও দুঃখের জগতে,
দুনিয়া ভাসুক পুন পুণ্য-স্রোতে
শোনাও আজান পাপ-তাপ-বিনাশী॥

এফ্‌. টি. ২৩০৫

৪২

ওরে ও নতুন ঈদের চাঁদ !
তোমায় হেরে হৃদয়-সাগর আনন্দে উন্মাদ॥

তোমার রাঙা তশতরিতে ফিরদৌসেরই পরী
খুশির শিরনি বিলায় রে ভাই নিখিল ভুবন ভরি' ;
খোদার রহম পড়িছে তোমার চাঁদিনী রূপে ঝরি',
দুঃখ-শোক সব ভুলিয়ে দিতে তুমি মায়ার ফাঁদ॥

তুমি আসমানে কালাম
ইশরাতে লেখা যেন মোহাম্মদের নাম।

খোদার আদেশ তুমি জান, স্মরণ করাও এসে
জাকাত দিতে দৌলত সব দরিদ্রেরে হেসে ;
শত্রুরে আজি ধরিতে বুকে শেখাও ভালবেসে ;
তোমায় দেখে টুটে গেছে অসীম প্রেমের বাঁধ॥

এফ. টি. ৪১৭৬

৪৩

মস্‌জিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই।
যেন গোরে থেকেও মোয়াজ্জিনের আজান শুন্‌তে পাই॥

আমার গোরের পাশ দিয়ে ভাই নামাজিরা যাবে,
পবিত্র সেই পায়ের ধ্বনি এ বান্দা শুনতে পাবে।
গোর-আজাব থেকে এ গুনাহ্‌গার পাইবে রেহাই॥

কত পরহেজ্‌গার খোদার ভক্ত নবীজীর উম্মত
ঐ মস্‌জিদে করে রে ভাই কোরান তেলাওত্‌,
সেই কোরান শুনে যেন আমি পরান জুড়াই॥

কত দরবেশ ফকির রে ভাই মস্‌জিদের আঙিনাতে
আল্লার নাম জিকির করে লুকিয়ে গভীর রাতে ;
আমি তাদের সাথে কেঁদে কেঁদে
আল্লার নাম জপিতে চাই॥

কে. ডি. বি. ১৫০৪৮

৪৪

ইসলামী/কোরাস্‌

ইয়া আল্লাহ্‌, তুমি রক্ষা করো দুনিয়া ও দ্বীন্‌।
শান-শওকতে হউক পূর্ণ আবার নিখিল মুস্‌লেমিন।
আমিন আল্লাহুম্মা আমিন॥

খোদা, মুষ্টিমেয় আরববাসী যে ঈমানের জোরে
তোমার নামের ডঙ্কা বাজিয়েছিল দুনিয়াকে জয় করে,
খোদা, দাও সে ঈমান, সেই তরক্কী, দাও সে একিন্।
আমিন আল্লাহুম্মা আমিন॥

হায়! যে-জাতির খলিফা ওমর শাহান্‌শাহ্ হয়ে
ছেঁড়া কাপড় পরে গেলেন উপবাসী রয়ে,
আবার মোদের সেই ত্যাগ দাও, খোদা
ভোগ-বিলাসে মোদের জীবন করো না মলিন।
আমিন আল্লাহুম্মা আমিন॥

খোদা, তুমি ছাড়া বিশ্বে কারেও করতাম না ভয়,
তাই এ বিশ্বে হয় নি মোদের কভু পরাজয়;
দাও সেই দীক্ষা শক্তি সেই ভক্তি দ্বিধাহীন।
আমিন আল্লাহুম্মা আমিন॥

এফ. টি. ১৩২৬১

৪৫

চীন আরব হিন্দুস্থান নিখিল ধরাধাম
জানে আমায়, চেনে আমায়, মুসলিম আমার নাম॥

অন্ধকারে আজান দিয়ে ভাঙনু ঘুমঘোর,
আলোর অভিযান এনেছি, রাত করেছি ভোর;
এক সমান করেছি ভেঙে উচ্চ-নীচ তামাম॥

চেনে মোরে সাহারা গোবি দুর্গম পর্বত,
মন্থন করেছে সাগর আমার সিন্ধু রথ;
বয়েছে আফ্রিকা ইউরোপে আমারই তাঞ্জাম॥

পাক্ মুলুকে বসিয়েছি খোদার মস্‌জিদ,
জগৎ-সাক্ষী পাপীদেরকে পিইয়েছি তৌহিদ;
বিরান-বনে রচেছি যে হাজার নগর-গ্রাম॥

এন. ৭৪৮৭

৪৬

ইসলামী

তুমি রহিমুর্ রহমান আমি গুনাহ্‌গার বান্দা।
হাত ধরে মোর পথ দেখাও, য়্যা আল্লাহ্
আমি আন্ধা॥

(মোর) সারা জীবন গেল কেটে
পাঁচ ভূতেরই বেগার খেটে
(এখন) শেষের বেলা ঘুচাও আল্লা
এই দুনিয়ার ধান্দা

(আল্লা !) আমি তোমার বনের পাখি,
কেন আমায় ধরে
রাখ্‌লে মায়ার শিক্‌লি বেঁধে
এই দেহ–পিঞ্জরে।

বলে এদের বাঁধা বুলি
আল্লা তোমায় গেছি ভুলি,
(এবার) শিক্‌লি কেটে কাছে ডাকো,
শেষ করো এই কান্দা॥

৪৭

এল আবার ঈদ ফিরে এল আবার ঈদ —
চলো ঈদ্‌গাহে।
যাহার আশায় চোখে মোদের ছিল না রে নিঁদ।
চলো ঈদ্‌গাহে॥

শিয়া–সুন্নি লা–মজহাবি একই জামায়াতে
এই ঈদ মোবারকে মিলিবে এক সাথে,
ভাই পাবে ভাইকে বুকে, হাত মিলাবে হাতে ;
আজ এক আকাশের নীচে মোদের একই সে মস্‌জিদ।
চলো ঈদ্‌গাহে॥

ঈদ এনেছে দুনিয়াতে শিরনি বেহেশ্‌তি,
দুশমনে আজ গলায় ধরে পাতাব ভাই দোস্তি,
জাকাত দেবো ভোগ-বিলাস আজ গোস্বা বদমস্তি,
প্রাণের তশ্‌তরিতে ভরে বিলাব তৌহিদ।
চলো ঈদ্‌গাহে॥

আজিকার এ ঈদের খুশি বিলাব সকলে,
আজের মতো সবার সাথে মিল্‌ব গলে গলে,
আজের মতো জীবন পথে চলব দলে দলে
প্রীতি দিয়ে বিশ্ব-নিখিল কর্‌ব রে মুরিদ।
চলো ঈদ্‌গাহে॥

৪৮

ওগো মা ফাতেমা ছুটে আয় —
তোর দুলালের বুকে হানে ছুরি।
দিনের শেষ বাতি নিভিয়া যায় মা গো
বুঝি আঁধার হলো মদিনা-পুরী॥

কোথায় শেরে-খোদা, জুলফিকার কোথা —
কবর ছেড়ে এস কারবালা যথা ;
তোমার আউলাদ বিরান হল আজি,
নিখিল শোকে মরে ঝুরি॥

কোথা আখেরী নবী, চুমা খেতে তুমি
যে গলে হোসেনের —
সহিছ কেমনে, সে গলে দুশমন
হানিছে শমসের !
রোজ হাশরে না-কি কওসরের পানি
পিয়াবে তোমার গো গুনাহ্‌গারে আনি,
দেখ না কি চেয়ে দুখের ছেলে-মেয়
পানি বিহনে মরে পুড়ি॥

৪৯

তুমি অনেক দিলে খোদা
দিলে অশেষ নিয়ামত।
আমি লোভী, তাইতে আমার
মিটে না হসরত॥

কেবলই পাপ করি আমি,
মাফ করিতে তাই, হে স্বামী!
দয়া করে শ্রেষ্ঠ নবীর করিলে উম্মত।
তুমি নানান ছলে করছ পূরণ ক্ষতির খেসারত॥

মায়ের বুকে স্তন্য দিলে, পিতার বুকে স্নেহ;
মাঠে শস্য-ফসল দিলে, আরাম লাগি' গেহ।

কোরান দিলে পথ দেখাতে,
পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ শেখাতে;
নামাজ দিয়ে দেখাইলে মস্‌জিদেরই পথ।
তুমি কেয়ামতের শেষে দিবে বেহেশ্‌তি দৌলত॥

৫০

নামাজ রোজা হজ্ব জাকাতের পসারিণী আমি।
নবীর কল্‌মা হেঁকে ফিরি পথে দিবস-যামী॥

আমার নবীজীর পিয়ারী
আয় রে ছুটে মুস্‌লিম নারী,
দ্বীনের সওদা করিবি কে আয় রে মুক্তিকামী॥
জন্ম আমার হাজার বছর আগে আরব দেশে,
সারা ভুবন ঠাঁই দিয়েছে আমায় ভালবেসে।

আমার আজান-ধ্বনি বাজে
কুল মুমিনের বুকের মাঝে;
আমি নবীর মানস-কন্যা, আল্লাহ্ আমার স্বামী॥

৫১

ফোরাতের পানিতে নেমে ফাতেমা-দুলাল কাঁদে
অঝোর নয়নে রে।
দু'হাতে তুলিয়া পানি ফেলিয়া দিলেন অমনি
পড়িল কি মনে রে॥

দুধের ছাওয়াল আস্‌গর এই পানি চাহিয়ে রে
দুশমনের তীর খেয়ে বুকে ঘুমাল খুন পিয়ে রে ;
শাদীর নওশা কাসেম শহীদ এই পানি বিহনে রে॥

এই পানিতে মুছিল রে হাতের মেহেদী সকিনার,
এই পানিতে ঢেউয়ে ওঠে তারি মাতম্ হাহাকার ;
শহীদানের খুন মিশে আছে এই পানিরই সনে রে॥

বীর আব্বাসের বাজু শহীদ হলো এরি তরে রে,
এই পানি বিহনে জয়নাল খিমায় তৃষ্ণায় মরে রে ;
শোকে শহীদ হলেন হোসেন জয়ী হয়েও রণে রে॥

৫২

মেষ চারণে যায় নবী কিশোর রাখাল-বেশে॥
নীল রেশ্‌মি রুমাল বেঁধে চারু চাঁচর কেশে॥

তাঁর রাঙা পদতলে পুলকে ধরা টলে,
তাঁর রূপ-লাবণির ঢলে মরুভূমি গেল ভেসে॥

তাঁর মুখে রহে চাহি' মেষ-শিশু তৃণ ভুলি',
বিশ্বের শাহানশাহ্ আজ মাখে গোঠের ধূলি'।
তাঁর চরণ-নখরে কোটি চাঁদ কেঁদে মরে,
তাঁরে ছায়া করে চলে আকাশের মেঘ এসে॥
কিশোর নবী গোঠে চলে —
তাঁর চরণ-ছোঁয়ায় পথের পাথর
মোম হয়ে যায় গলে।

তস্‌লিম জানায় পাহাড়
চরণে ঝুঁকে তাঁহার,
নারঙ্গী আঙুর খর্জুর পায়ে নজ্‌রানা দেয় হেসে॥

৫৩

যাবার বেলায় সালাম লহ, হে পাক্ রমজান।
তব বিদায়–ব্যথায় কাঁদিছে নিখিল মুস্‌লিম জাহান॥

পাপীর তরে তুমি প্যারের তরী ছিলে দুনিয়ায়,
তোমারি গুণে দোজখের আগুন নিভে যায় ;
তোমারি ভয়ে লুকিয়ে ছিল শয়তান।

ওগো রমজান, তোমারি তরে মুস্‌লিম যত
রাখিয়া রোজা ছিল জাগিয়া চাহি' তব পথ ;
আনিয়াছিলে দুনিয়াতে তুমি পবিত্র কোরআন॥

পরহেজ্‌গারের তুমি যে প্রিয় প্রাণের সাথী,
মস্‌জিদে প্রাণের তুমি যে জ্বালাও দ্বীনের বাতি ;
উড়িয়ে গেলে যাবার বেলায় নূতন ঈদের চাঁদের নিশান॥

৫৪

সোজা পথে চল্ রে ভাই, ঈমান থেকো ধরে।
খোদার রহম মেঘের মতো ছায়া দেবে তোরে॥

তুমি বিচার করো না, কেউ করলে তোমার ক্ষতি ;
এক সে বিচার–করনেওয়ালা ত্রিভুবনের পতি।
তোর ক্ষতির ভালে ধর্‌বে মোতি তাঁর বিচারের জোরে॥

সকল সময় ধরে থেকো আল্লাহ্ নামের খুঁটি,
তিনি তোমার হেফাজতে দিবেন ক্ষুধার রুটি ;
ইয়াকিন্ দীলে থেকো তুমি, দিবেন তোমায় তরে॥

৫৫

আমার মোহাম্মদের নামে ধেয়ান হৃদয়ে যার রয়,
ওগো হৃদয়ে যার রয়
খোদার সাথে হয়েছে তার গোপন পরিচয়॥

ঐ নামে যে ডুবে আছে,
নাই দুঃখ-শোক তাহার কাছে;
ঐ নামের প্রেমে দুনিয়াকে সে দেখে প্রেমময়॥

যে খোশ্-নসিব গিয়াছে ঐ নামের স্রোতে ভেসে,
জেনেছে সে কোরান হাদিস্ ফেকা এক নিমেষে।

মোর নবীজীর বর-মালা
করেছে যার হৃদয় আলা,
বেহেশ্‌তের সে আশ রাখে না,
তার নাই দোজখের ভয়॥

৫৬

ইস্‌লামের ঐ বাগিচাতে ফুট্‌লো দুটি ফুল।
শোভায় অতুল সে ফুল আমার আল্লাহ ও রসুল॥

যুগল কুসুম উজল রঙে
হৃদয় আমার ওঠ্‌লো রেঙে,
খোশবুতে তার মাতোয়ারা মনের বুলবুল॥
ফুট্‌লো যদি সে ফুল আমার খোশ্-নসিবের ফলে,
জিন্দেগি ভর্ তারি মালা পরবো আমার গলে।

দুই বাজুতে তাবিজ করে
খাড়া হব রোজ হাশরে,
বরকতে তার হব রে পার পুলসেরাতের পুল॥

৫৭

কল্‌মা শাহাদাতে আছে খোদার জ্যোতি।
ঝিনুকের বুকে লুকিয়ে থাকে যেমন মোতি॥
ঐ কল্‌মা জপে যে ঘুমের আগে,
ঐ কল্‌মা জপিয়া যে প্রভাতে জাগে,
দুখের সংসার সুখময় হয় তার —
তার মুসিবত্‌ আসে না কো, হয় না ক্ষতি॥

হর্‌দম জপে মনে কল্‌মা যে জন
খোদায়ী তত্ত্ব তার রহে না গোপন,
দীলের আয়না তার হয়ে যায় পাক সাফ,
সদা আল্লার রাহে তার রহে মতি॥

এস্‌মে আজম হতে কদর ইহার
পায় ঘরে বসে খোদা আর রসুলের দীদার,
তাহারি হৃদয়াকাশে সাত বেহেশ্‌ত নাচে,
তার আল্লার আরশে হয় আখেরে গতি॥

৫৮

চল্‌ রে কাবার জেয়ারতে, চল্‌ নবীজীর দেশ।
দুনিয়াদারির লেবাস্‌ খুলে পর্‌ রে হাজীর বেশ॥

আওকাতে তোর থাকে যদি আরফাতের ময়দান —
চল্‌ আরফাতের ময়দান;
এক জামাত হয় সেখানে ভাই নিখিল মুসলমান —
মুস্‌লিম গৌরব দেখার যদি থাকে তোর খাহেশ্‌॥

যেথায় হজরত হলেন নাজেল মা আমিনার ঘরে,
খেলেছেন যার পথে ঘাটে মক্কার শহরে —
চল্‌ সেই মক্কার শহরে;
সেই মাঠের ধূলা মাখবি যেথা নবী চরাতেন মেষ॥

করে হিজরত কায়েম হলেন মদিনায় হজরত —
যে মদিনায় হজরত,
সেই মদিনা দেখবি রে চল্, মিটবে রে তোর প্রাণের হসরত ;
সেথা নবীজীর ঐ রওজাতে তোর আরজি করবি পেশ ॥

৫৯

দে জাকাত, দে জাকাত, তোরা দে রে জাকাত।
তোর দীল্ খুলবে পরে, ওরে আগে খুলুক হাত ॥

দেখ্ পাক কোরআন, শোন্ নবীজীর ফরমান —
ভোগের তরে আসেনিরে দুনিয়ায় মুসলমান
তোর একার তরে দেন্ নি খোদা দৌলতের খেলাত ॥

তোর দর্‌দালানে কাঁদে ভুখা হাজারো মুস্‌লিম,
আছে দৌলতে তোর তাদেরও ভাগ — বলেছেন রহিম,
বলেছেন রহমানুর রহিম, বলেছেন রসুলে-করীম ;
সঞ্চয় তোর সফল হবে, পাবি রে নাজাত ॥

এই দৌলত বিভব-রতন যাবে না তোর সাথে,
হয়ত চেরাগ জ্বল্‌বে না তোর গোরে শবে-রাতে ;
এই জাকাতের বদ্‌লাতে পাবি বেহেশ্‌তি সওগাত ॥

৬০

ফুলে পুছিনু, "বলো, বলো ওরে ফুল !
কোথা পেলি এ সুরভি, রূপ এ অতুল ?"
"যাঁর রূপে উজালা দুনিয়া", কহে গুল্,
"দিল সেই মোরে এই রূপ এই খোশ্‌বু।
আল্লাহু আল্লাহু ॥"

"ওরে কোকিল, কে তোরে দিল এ সুর,
কোথা পেলি পাপিয়া এ কণ্ঠ মধুর ?"
কহে কোকিল ও পাপিয়া, "আল্লাহ্ গফুর,

তাঁরি নাম গাহি 'পিউ পিউ, কুহু কুহু' —
আল্লাহু আল্লাহু॥"

"ওরে ও রবি–শশী, ওরে ও গ্রহ–তারা,
কোথা পেলি এ রওশ্‌নী জ্যোতিঃধারা?"
কহে, "আমরা তাঁহারি রূপের ইশারা —
মুসা বেহুঁশ হলো হেরি যে খুবরু।
আল্লাহু আল্লাহু॥"

যাঁরে আউলিয়া আম্বিয়া ধ্যানে না পায়,
কুল–মখলুক যাঁহারি মহিমা গায়,
যে–নাম নিয়ে এসেছি এই দুনিয়ায়,
সেই নাম নিতে নিতে মরি — এই আর্‌জু।
আল্লাহু আল্লাহু॥

৬১

ভেসে যায় হৃদয় আমার মদিনা–পানে।
আসিলেন রসূলে–খোদা প্রথম যেখানে॥

উঠল যেখানে রণি'
প্রথম তকবীর–ধ্বনি,
লভিনু মণির খনি যথায় কোরানে।

যথা হেরা গুহার আঁধারে প্রথম
ইসলামের জ্যোতি লভিল জনম,
ঝরে অঝোর ধারায় যথা খোদার রহম,
ভাসিল নিখিল ভুবন যাহার তুফানে॥

লাখো আউলিয়া আম্বিয়া বাদ্‌শা ফকির
যথা যুগে যুগে আসি' করিল ভিড়,
তার ধূলাতে লুটাবো আমি নোয়াব শির;
নিশিদিন শুনি তারি ডাক আমার পরাণে॥

৬২

যে আল্লার কথা শোনে
তারি কথা শোনে লোকে।
আল্লার নূর যে দেখেছে
পথ পায় লোক তার আলোকে॥

যে আপনার হাত দেয় আল্লায়,
জুল্‌ফিকারের তেজ সেই পায় ;
যার চোখে আছে খোদার জ্যোতি'
রাত্রি পোহায় তারি চোখে॥

ভোগের তৃষ্ণা মিটেছে যার
খোদার প্রেমের শির্‌নি পেয়ে,
যায় বাদ্‌শা-নবাব গোলাম হয়ে
সেই ফকিরের কাছে যেয়ে।

আসে সেই কওমের ইমাম সেজে
কওম্‌কে পেয়েছে যে,
তারি কাছে খোদার দেওয়া
শান্তি আছে দুখে-সুখে॥

৬৩

লহ সালাম লহ, দ্বীনের বাদ্‌শাহ্‌,
জয় আখেরি নবী।
পীড়িত জনগণে মুক্তি দিতে এলে
হে নবীকুলের রবি॥

তুমি আসার আগে ধরার মজলুম
করিত ফরিয়াদ, চোখে ছিল না ঘুম ;
ধরার জিন্দানে বন্দী ইন্‌সানে
আজাদী দিতে এলে, হে প্রিয় আল্‌-আরবি॥

তব দামন ধরি' যত গুনাহ্‌গার
মাগিল আশ্রয়,
তুমিই করিবে পার।

মানুষ ছিল আগে বন্য পশু প্রায়
কাঁদিত পাপে-তাপে অভাবে-বেদনায়,
শান্তিদাতা-রূপে সহসা এলে তুমি
ফুটিল দুনিয়াতে নব বেহেশ্‌তের ছবি ॥

৬৪

আল্লাহ্ থাকেন দূর আরশে —
নবীজী রয় প্রাণের কাছে।
প্রাণের কাছে রয় যে প্রিয়
সেই নবীরে পরাণ যাচে ॥

পয়গাম্বরও পায় না খোদায়,
মোর নবীরে সকলে পায় ;
নবীজী মোর তাবিজ হয়ে
আমার বুকে জড়িয়ে আছে ॥

খোদার নামে সেজ্‌দা করি,
নবীরে মোর ভালবাসি ;
খোদা যেন নূরের সুরুয,
নবী যেন চাঁদের হাসি।

নবীরে মোর কাছে পেতে
হয় না পাহাড় বনে যেতে ;
বৃথা ফকির দরবেশ মরে
পুড়ে খোদার আগুন-আঁচে ॥

৬৫

আসিছেন হাবিবে-খোদা, আরশ পাকে তাই ওঠেছে শোর ;
চাঁদ পিয়াসে ছুটে আসে আকাশ-পানে যেমন চকোর,
কোকিল যেমন গেয়ে ওঠে ফাগুন আসার আভাস পেয়ে,
তেমনি করে হরষিত ফেরেশ্‌তা সব উঠ্‌লো গেয়ে, —

'হের আজ আরশে আসেন মোদের নবী কমলীওয়ালা ;
দেখ সেই খুশিতে চাঁদ-সুরুয আজ হল দ্বিগুণ আলা॥

ফকির দরবেশ আউলিয়া যাঁরে
ধ্যানে জ্ঞানে ধরতে নারে ;
যাঁর মহিমা বুঝতে পারে
এক সে আল্লাহ্ তায়ালা॥
বারেক মুখে নিলে যাঁর নাম
চিরতরে হয় দোজখ হারাম,
পাপীর তরে দস্তে যাঁহার
কওসরের পেয়ালা॥

মিম হরফ না থাকলে যে আহাদ,
নামে মাখা যাঁর শিরিন শহদ,
নিখিল প্রেমাস্পদ আমার মোহাম্মদ
ত্রিভুবন-উজালা॥

৬৬

উঠুক তুফান পাপ-দরিয়ায় —
ও ভাই আমি কি তায় ভয় করি।
পাক্কা ঈমান তক্তা দিয়ে
গড়া যে আমার তরী॥

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুর পাল তুলে
ঘোর তুফানকে জয় করে ভাই যাবই কূলে
আমার মোহাম্মদ মোস্তফা নামের
গুণের রশি ধরি॥

খোদার রাহে সঁপে দেওয়া ডুববে না মোর এ তরী,
সওদা করে ফিরবে তীরে সওয়ার-মানিক ভরি'।

দাঁড় এ তরীর নামাজ রোজা হজ্জ্ব ও জাকাত ;
উঠুক না মেঘ, আসুক বিপদ — যত বজ্রপাত,
আমি যাব বেহেশ্‌ত-বন্দরেতে রে
এই সে কিশ্‌তিতে চড়ি'॥

৬৭

খাতুনে-জান্নাত ফাতেমা জননী
বিশ্ব-দুলালী নবী-নন্দিনী ॥
মদিনা-বাসিনী পাপ-তাপ-নাশিনী
উম্মত-তারিণী আনন্দিনী ॥

সাহারার বুকে মা গো তুমি মেঘমায়া,
তপ্ত মরুর প্রাণে স্নেহ-তরুছায়া ;
মুক্তি লভিল মা গো তব শুভ পরশে
বিশ্বের যত নারী বন্দিনী ॥

হাসান হোসেনে তব উম্মত তরে, মা গো !
কারবালা-প্রান্তরে দিলে বলিদান ;
বদ্‌লাতে তার রোজ হাশরের দিনে
চাহিবে মা মোর মতো পাপীদের ত্রাণ।

এলে পাষাণের বুক চিরে নির্ঝর-সম
করুণার ক্ষীর-ধারা আবে-জমজম ;
ফেরদৌস হতে রহমত-বারি ঢালো
সাধ্বী মুসলিম গরবিনী ॥

৬৮

দুখের সাহারা পার হয়ে আমি
চলেছি কাবার পানে।
পড়িব নামাজ মারেফাতের
আরাফাত ময়দানে ॥

খোদার ঘরের দীদার পাইব,
হজ্বের পথে জ্বালা জুড়াইব ;
মোর মুর্শিদ হয়ে হজরত পথ
দেখান সুদূর পানে ॥

রোজা রাখা মোর সফল হইবে,
পাব পিয়াসার পানি ;

আবে-জমজম তৌহিদ পিয়ে
ঘুচাব পথের গ্লানি।
আল্লার ঘর তওয়াফ করিয়া
কাঁদিব সেথায় পরাণ ভরিয়া ;
ফিরিব না আর, কোরবানী দেবো
এই জান্ সেইখানে॥

৬৯

যে রসুল বলতে নয়ন ঝরে,
সেই রসুলের প্রেমিক আমি।
চাহে আমার হৃদয়-লায়লী
সে মজনুরে দিবস-যামী॥

ফরহাদ সে, আমি শিরী
ওই নামের প্রেমে পথে ফিঁরি ;
ঈমান আমার রইল কি না
জানেন তিনি অন্তর্যামী॥

প্রেমে তাঁহার দীওয়ানা হয়ে
গেল দুনিয়া আখের সবই ;
কোথায় রোজা, কোথায় নামাজ,
কেবল কাঁদি : 'নবী নবী।'

রোজ-কেয়ামত আস্‌বে কবে ;
কখন তাঁহার দীদার হবে ;
নিত্য আমার রোজ-কেয়ামত
বিনে আমার জীবন-স্বামী॥

৭০

হে মদিনাবাসী প্রেমিক, ধরো হাত মম।
জ্বল্‌ওয়া দেখায়ে দীল্ হরিলে শুধু হলে বেগানা ;
হেসে হেসে সংসার কহে — দীওয়ানা এ দীওয়ানা !
হে মদিনাবাসী প্রেমিক, ধরো হাত মম॥

দুখের দোসর কেউ নাহি মোর—ব্যথিত ব্যথার,
তোমায় ভুলে ভাসি অকূলে, পার করো সরকার।
হে মদিনাবাসী প্রেমিক, ধরো হাত মম॥

বিরহের রাত একেলা কেঁদে হল্ ভোর ;
হৃদয়ে মোর শান্তি নাই, কাঁদে পরাণ মোর।
হে মদিনাবাসী প্রেমিক, ধরো হাত মম।

৭১

আঁধার মনের মিনারে মোর
হে মুয়াজ্জিন, দাও আজান !
গাফেলতির ঘুম ভেঙে দাও,
হউক নিশি অবসান॥

আল্লাহ্ নামের যে তক্‌বীরে
ঝর্ণা বহে পাষাণ চিরে,
শুনি' সে তকবীরের ধ্বনি
জাগুক আমার পাষাণ প্রাণ॥

জামাত ভারী জমবে এবার
এই দুনিয়ার ঈদ্‌গাহে ;
মেহেদী হবেন ইমাম সেথায়,
রাহ্ দেখাবেন গুম্‌রাহে।
আমি যেন সেই জামাতে
শামিল হতে পারি প্রাতে ;
ডাকে আমায় শহীদ হতে
সেথায় যত নওজোয়ান॥

৭২

আমার প্রিয় হজরত নবী কম্‌লিওয়ালা !
যাঁহার রওশনীতে দ্বীন–দুনিয়া উজালা॥
যাঁরে খুঁজে ফেরে কোটি গ্রহ তারা,

ঈদের চাঁদ যাঁহার নামের ইশারা ;
বাগিচায় গোলাব গুল গাঁথে যাঁর মালা ॥

আউলিয়া আম্বিয়া দরবেশ যাঁর নাম
খোদার নামের পরে জপে অবিরাম,
কেয়ামতে যাঁর হাতে কওসর-পিয়ালা ॥

পাপে মগ্ন ধরা যাঁর ফজিলতে
ভাসিল সুমধুর তৌহিদ-স্রোতে,
মহিমা যাঁহার জানেন এক আল্লাহ্‌তায়ালা ॥

৭৩

আমি গরবিনী মুসলিম বালা।
সংসার সাহারাতে আমি গুলে লালা ॥

জ্বালায়েছি বাতি আমি আঁধার কাবায়,
এনেছি খুশির ঈদে শির্‌নির থালা ॥

আনিয়াছি ঈমান প্রথম আমি,
আমি দিয়াছি সবার আগে মোহাম্মদে মালা ॥
কত শত কারবালা বদরের রণে
বিলায়ে দিয়াছি স্বামী-পুত্র স্বজনে ;
জানে গ্রহ-তারা জানে আল্লাহ্‌তালা ॥

৭৪

আল্লাহ্‌তে যাঁর পূর্ণ ঈমান, কোথা সে মুসলমান।
কোথা সে আরিফ, অভেদ যাঁহার জীবন-মৃত্যু-জ্ঞান ॥

যাঁর মুখে শুনি তওহিদের কালাম
ভয়ে মৃত্যুও করিত সালাম ;
যাঁর দ্বীন্ দ্বীন্ রবে কাঁপিত দুনিয়া জ্বীন-পরী ইন্‌সান ॥

স্ত্রী-পুত্রে আল্লারে সপি জেহাদে যে নির্ভীক
হেসে কোরবানী দিত প্রাণ, হায় ! আজ তারা মাগে ভিখ্।

কোথা সে শিক্ষা — আল্লাহ্ ছাড়া
ত্রিভুবনে ভয় করিত না যারা,
আজাদ করিতে এসেছিল যারা সাথে লয়ে কোরআন॥

৭৫

ইয়া রসুলুল্লাহ্ ! মোরে রাহা দেখাও সেই কাবার —
যে কাবা মস্‌জিদে গেলে পাব আল্লার দীদার॥

দ্বীন-দুনিয়া এক হয়ে যায় যে কাবার ফজিলতে,
যে কাবাতে হাজী হলে রাজি হন পরওয়ারদিগার॥

যে কাবার দুয়ারে জামে তৌহিদ দেন হজরত আলী,
যে কাবায় কুল্-মগফেরাতে কর তুমি ইন্তেজার॥

যে কাবাতে গেলে দেখি আরশ কুর্সি লওহ্ কালাম;
মরণে আর ভয় থাকে না, হাসিয়া হয় বেড়া পার॥

৭৬

ওরে ও দরিয়ার মাঝি ! মোরে
নিয়ে যা রে মদিনা।
তুমি মুর্শিদ হয়ে পথ দেখাও ভাই
আমি যে পথ চিনি না॥

আমার প্রিয় হজরত সেথায়
আছেন না-কি ঘুমিয়ে, ভাই !
আমি প্রাণে যে আর বাঁচি না রে
আমার হজরতের দরশ বিনা।

নদী নাকি নাই ও-দেশে,
নাও না চলে যদি
আমি চোখের সাঁতার-পানি দিয়ে
বইয়ে দেবো নদী।

ঐ মদিনার ধূলি মেখে
কাঁদবো 'ইয়া মোহাম্মদ' ডেকে ডেকে রে,
কেঁদেছিল কারবালাতে
যেমন বিবি সকিনা॥

৭৭

ওরে কে বলে আরবে নদী নাই।
যথা রহ্মতের ঢল বহে অবিরল
দেখি প্রেম-দরিয়ার পানি যেদিকে চাই॥

যার কাবা ঘরের পাশে আবে-জমজম,
যথা আল্লা নামের বাদল ঝরে হরদম,
যার জোয়ার এসে দুনিয়ার দেশে দেশে
পুণ্যের গুলিস্তান রচিল দেখিতে পাই॥

যার ফোরাতের পানি আজও ধরার পরে
নিখিল নরনারীর চোখে ঝরে
ওরে শুকায় না যে নদী দুনিয়ায়।

যার শক্তির বন্যার তরঙ্গ-বেগে,
যত বিষণ্ন প্রাণ ওরে আনন্দে উঠ্লো জেগে,
যার প্রেম-নদীতে যার পুণ্য-তরীতে
মোরা তরে যাই॥

৭৮

খোদায় পাইয়া বিশ্ববিজয়ী ছিল একদিন যারা।
খোদায় ভুলিয়া ভীত পরাজিত আজ দুনিয়ায় তারা॥

খোদার নামের আশ্রয় ছেড়ে
ভিখারির বেশে দেশে দেশে ফেরে,
ভোগ-বিলাসের মোহে ভুলে, হায়, নিল বন্ধন-কারা॥

খোদার সঙ্গে যুক্ত সদাই ছিল যাহাদের মন
দুখে রোগে শোকে অটল যাহারা রহিত সর্বক্ষণ —

এসে শয়তান ভোগ-বিলাসের
কাড়িয়া লয়েছে ঈমান তাদের ;
খোদায় হারায়ে মুস্‌লিম আজ হয়েছে সর্বহারা ॥

৭৯

দিন গেল মোর মায়ায় ভুলে মাটির পৃথিবীতে।
কে জানে কখন নিয়ে যাবে গোরে মাটি দিতে রে ॥

পাঁচ ভূতে আর চোরে মিলে
রোজগার মোর কেড়ে নিলে ;
এখন কেউ নাই রে পারে যাবার দুটো কড়ি দিতে রে ॥

রাত্রে শুয়ে আবার যে ভাই উঠব সকাল বেলা
বল্‌তে কি কেউ পারি, তবু খেলি মোহের খেলা।

বাদশা আমীর ফকির কত
এল আবার হল গত রে, —
দেখেও বারেক আল্লাহ্‌র নাম জাগে নাকো চিতে।
এবার বস্‌বি কবে, ও ভোলা মন, আল্লাহ্‌র তস্‌বিতে রে ॥

৮০

মরু সাহারা আজি মাতোয়ারা।
হলেন নাজেল্‌ তাহার দেশে খোদার রসুল —
যাঁহার নামে যাঁহার ধ্যানে
সারা দুনিয়া দীওয়ানা প্রেমে মশ্‌গুল ॥

যাঁহারা আসার আশাতে অনুরাগে
নীরস খর্জুর তরুতে রস জাগে,
তপ্ত মরু, 'পরে খোদার রহম ঝরে,
হাসে আকাশ পরিয়া চাঁদের দুল ॥

ছিল ত্রিভুবন যাঁহার পথ চাহি'
এল রে সে নবী 'ইয়া উম্মতি' গাহি'
যতেক গুমরাহে   নিতে খোদার রাহে
এল ফুটাতে দুনিয়াতে ইস্‌লামী ফুল॥

৮১

হায় হায় উঠিছে মাতম্‌
আকাশ পবন ভুবন ভরি'।
আখেরি নবী দ্বীনের রবি নিল বিদায়
বিশ্ব-নিখিল আঁধার করি॥

অসীম তিমিরে পুণ্যের আলো
আনিল যে চাঁদ, সে কোথায় লুকালো ;
আকাশে ললাট হানি' কাঁদিছে মরুভূমি'
শোকে গ্রহ-তারকা পড়িছে ঝরি॥

তৃণ নাহি খায় উট, মেষ নাহি মাঠে যায় ;
বিহগ-শাবক কাঁদে জননীরে ভুলি হায় !

বন্ধুর বিরহ কি সহিল না আল্লার,
তাই তাঁরে ডাকিয়া নিল কাছে আপনার ;
হায়   কাণ্ডারি গেল চলে' রাখিয়া পারের তরী॥

৮২

আল্লাকে যে পাইতে চায় হজরতকে ভালবেসে —
আরশ কুর্সি লওহ্‌ কালাম না চাইতেই পেয়েছে সে॥

রসুল নামের রশি ধরে
যেতে হবে খোদার ঘরে,

নদী-তরঙ্গে যে পড়েছে ভাই,
দরিয়াতে সে আপনি মেশে॥

তর্ক করে দুঃখ ছাড়া কী পেয়েছিস্ অবিশ্বাসী,
কী পাওয়া যায় দেখ্ না বারেক হজরতে মোর ভালবাসি?

এই দুনিয়ায় দিবা-রাতি
ঈদ হবে তোর নিত্য সাথী;
তুই যা চাস্ তাই পাবি হেথায়
আহমদ চান যদি হেসে॥

৮৩

আহার দিবেন তিনি, রে মন,
জীব দিয়াছেন যিনি।
তোরে সৃষ্টি করে তোর কাছে যে
আছেন তিনি ঋণী॥

সারা জীবন চেষ্টা করে
ভিক্ষা-মুষ্টি আন্লি ঘরে;
ও মন, তাঁর কাছে তুই হাত পেতে দেখ্
কী দান দেন তিনি॥

না চাইতে ক্ষেতের ফসল
পায় বৃষ্টির জল;
তুই যে পেলি পুত্র-কন্যা
তোরে কে দিল তা বল্।

যার করুণায় এত পেলি,
তাঁরেই কেবল ভুলে গেলি;
তোর ভাবনার ভার দিয়ে তাঁকে
ডাক্ রে নিশিদিনই॥

৮৪

ইয়া মোহাম্মদ, বেহেশ্‌ত হতে
খোদার পাওয়ার পথ দেখাও।
এই দুনিয়ার দুঃখ থেকে
এবার আমায় নাজাত দাও॥

পীর-মুর্শিদ পাইনি আমি,
তাই তোমায় ডাকি দিবস-যামী,
তোমারই নাম হউক হজরত
আমার পর-পারের নাও॥

অর্থ-বিভব যশ-সম্মান
চেয়ে চেয়ে নিশিদিন
দুঃখ-শোকে জ্বলে মরি,
পরান কাঁদে শান্তিহীন।

আল্লাহ্ ছাড়া ত্রিভুবনে
শান্তি পাওয়া যায় না মনে;
কোথায় পাবো সে আবেহায়াত —
ইয়া নবীজী, রাহ্ বাতাও॥

৮৫

এ কোন্ মধুর শারাব দিলে আল্-আরাবী সাকি।
নেশায় হলাম দীওয়ানা যে, রঙিন হল আঁখি॥

তৌহিদের শিরাজী নিয়ে
ডাকলে সবায়ঃ 'যা রে পি'য়ে!'
নিখিল জগৎ ছুটে এল,
রইলো না কেউ বাকি॥

বস্‌লো তোমার মহ্‌ফিল দূর মক্কা-মদিনাতে,
আল্-কোরানের গাইলে গজল শবে-কদর রাতে।

নরনারী বাদ্‌শা ফকির
তোমার রূপে হয়ে অধীর
যা ছিল নজ্‌রানা দিল
রাঙা পায়ে রাখি'॥

৮৬

ওরে ও মদিনা, বলতে পারিস কোন্‌ সে পথে তোর
খেলতো ধূলা–মাটি নিয়ে মা ফাতেমা মোর॥

হাসান হোসেন খেলতো কোথায় কোন্‌ সে খেজুর–বনে —
পাথর–কুচি কাঁকর লয়ে দুম্বা শিশুর সনে,
সেই মুখকে চাঁদ ভেবে যে উড়িত চকোর॥

মা আয়েশা মোর নবীজীর পা ধোয়াতেন যথা —
দেখিয়ে দে সেই বেহেশ্‌ত্‌ আমায়, রাখ্‌রে আমার কথা ;
তোর প্রথম কোথায় আজান–ধ্বনি ভাঙলো ঘুমের ঘোর॥

কোন্‌ পাহাড়ের ঝর্ণা–তীরে মেষ চরাতেন নবী,
কোন্‌ পথ দিয়ে রে যেতেন হেরায় আমার আল্‌–আরবি,
তুই কাঁদিস্‌ কোথায় বুকে ধরে সেই নবীজীর গোর॥

৮৭

খয়বর–জয়ী আলী হায়দর,
জাগো জাগো আরবার !
দাও দুশমন–দুর্গ–বিদারী
দু'ধারী জুল্‌ফিকার॥
এস শেরে–খোদা ফিরিয়া আরবে —
ডাকে মুস্‌লিম 'ইয়া আলী' রবে ;
হায়দরি–হাঁকে তন্দ্রা–মগনে
করো করো হুঁশিয়ার॥

আল্‌বোর্জের চূড়া গুঁড়া-করা
গোর্জ আবার হানো ;
বেহেশ্‌তি সাকি, মৃত এ জাতিরে
আবে-কওসর দানো।

আজি বিশ্ব-বিজয়ী জাতি যে বেহুঁশ,
দাও তারে নব কূয়ত ও জোশ্‌ ;
এস নিরাশার মরু-ধূলি উড়ায়ে
দুল্‌দুল্‌-আস্‌ওয়ার ॥

৮৮

জরিন হরফে লেখা, রুপালি হরফে লেখা
আস্‌মানের কোরআন —
নীল আস্‌মানের কোরআন।
সেথা তারায় তারায় খোদার কালাম
তোরা পড়রে মুসলমান ॥

সেথা ঈদের চাঁদে লেখা
মোহাম্মদের 'মীম'-এর রেখা,
সুরুযেরই বাতি জ্বেলে' পড়ে রেজোয়ান ॥

খোদার আরশ লুকিয়ে আছে ঐ কোরানের মাঝে,
খোঁজে ফকির-দরবেশ সেই আরশ সকাল সাঁঝে।

খোদার দীদার চাস্‌ রে যদি,
পর্‌ এ কোরান নিরবধি ;
খোদার নূরের রওশনীতে রাঙ্‌ রে দেহ-প্রাণ ॥

৮৯

ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ
এল রে দুনিয়ায়।
আয় রে সাগর আকাশ বাতাস, দেখবি যদি আয় ॥

ধূলির ধরা বেহেশ্‌তে আজ
জয় করিল, দিল রে লাজ ;
আজ্‌কে খুশির ঢল নেমেছে ধূসর সাহারায়॥

দেখ্ আমিনা মায়ের কোলে
দোলে শিশু ইস্‌লাম দোলে,
কচি মুখে শাহাদতের বাণী সে শোনায়॥

আজকে যত পাপী ও তাপী
সব গুনাহের পেল মাফি,
দুনিয়া হতে বে-ইন্‌সাফি
জুলুম নিল বিদায়॥

নিখিল দরুদ পড়ে লয়ে ও-নাম —
'সাল্লাল্লাহু আলায়হি অ-সাল্লাম ;
জীন্ পরী ফেরেশ্‌তা সালাম
জানায় নবীর পায়॥

৯০

দেশে দেশে গেয়ে বেড়াই তোমার নামের গান।
হে খোদা, এ যে তোমার হুকুম, তোমারই ফরমান॥

এম্‌নি তোমার নামের আছর —
নামাজ রোজার নাই অবসর,
তোমার নামের নেশায় সদা মশ্‌গুল মোর প্রাণ।
তক্‌দিরে মোর এই লিখেছে —
হাজার গানের সুরে
নিত্য দিব তোমরা আজান
আঁধার মিনার-চূড়ে।

কাজের মাঝে হাটের পথে
রণ-ভূমে এবাদতে
আমি তোমার নাম শোনাব, করব শক্তি দান॥

৯১

মস্‌জিদে ঐ শোন রে আজান, চল্ নামাজে চল্।
দুঃখে পাবি সান্ত্বনা তুই বক্ষে পাবি বল।
ওরে চল্ নামাজে চল্॥

ময়লা-মাটি লাগলো যা তোর দেহ-মনের মাঝে —
সাফ হবে সব, দাঁড়াবি তুই যেম্‌নি জায়নামাজে ;
রোজগার তুই করবি যদি আখেরের ফসল।
ওরে চল্ নামাজে চল্॥

তুই হাজার কাজের অছিলাতে নামাজ করিস্ কাজা,
খাজনা তারি দিলি না, যে দ্বীন-দুনিয়ার রাজা ;
তারে পাঁচ বার তুই করবি মনে, তাতেও এত ছল !
ওরে চল্ নামাজে চল্॥

কার তরে তুই মরিস্ খেটে', কে হবে তোর সাথী ;
বে-নামাজির আঁধার গোরে কে জ্বালাবে বাতি ;
খোদার নামে শির লুটায়ে জীবন কর্ সফল।
ওরে চল্ নামাজে চল্॥

৯২

হেরেমের বন্দিনী কাঁদিয়া ডাকে —
তুমি শুনিতে কি পাও?
আখেরি নবী প্রিয় আল্-আরাবি,
বারেক ফিরে চাও॥

পিঞ্জরার পাখি সম অন্ধকারায়
বন্ধ থাকি এ জীবন কেটে যায় ;
চাহে প্রাণ ছুটে যেতে তব মদিনায়,
চরণের এই জিঞ্জির খুলে দাও॥

ফাতেমার মেয়েদের হেরি' আঁখি-নীর
বেহেশ্‌তে কেমনে আছ তুমি স্থির !

যেতে নারে মস্‌জিদে শুনিয়া আজান,
বাহিরে ওয়াজ হয়, ঘরে কাঁদে প্রাণ ;
ঝুটা এই বোরখার হোক অবসান —
আঁধার হেরেম আশা-আলোক দেখাও॥

৯৩

হে প্রিয় নবী, রসুল আমার !
পরেছি আভরণ নামেরই তোমার॥

নয়নের কাজলে তব নাম,
ললাটের টিপে জ্বলে তব নাম ;
গাঁথা মোর কুন্তলে আহমদ —
বাঁধা মোর অঞ্চলে তব নাম।
দুলিছে গলে মোর তব নাম মণি-হার॥

তাবিজ অঙ্গুরী তব নাম,
বাজু ও পৈঁচি চুড়ি তব নাম ;
ভয়ে ভয়ে পথে পথে ঘুরি যে —
পাছে কেউ করে চুরি তব নাম
ঐ নাম রূপ মোর ঐ নাম আঁখি-ধার॥
বুকের বেদনা ঢাকা তব নাম,
প্রাণের পরতে আঁকা তব নাম ;
ধ্যানে মোর জ্ঞানে মোর তুমি যে —
প্রেম ও ভক্তি মাখা তব নাম।
প্রিয় নাম আহমদ জপি আমি অনিবার॥

৯৪

নিখিল ঘুমে অচেতন সহসা শুনিনু আজান ;
শুনি' সে তকবীরের ধ্বনি আকুল হল মন-প্রাণ ;
বাহিরে হেরিনু আসি : বেহেশতী রৌশনীতে রে
ছেয়েছে জমিন ও আসমান ;

আনন্দে গাহিয়া ফেরে ফেরেশ্‌তা হুর গেলেমান —
এল কে, কে এল ভুলোকে !
দুনিয়া দুলিয়া উঠিল পুলকে ॥

তাপীর বন্ধু, পাপীর ত্রাতা,
ভয়-ভীত পীড়িতের শরণ-দাতা,
মূকের ভাষা নিরাশের আশা,
ব্যথার শান্তি, সান্ত্বনা শোকে
এল কে ভোরের আলোকে ॥

দরূদ পড় সবে : সাল্লে আলা,
মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লে আলা।
কেহ বলে, এল মোর কম্‌লীওয়ালা —
মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লে আলা !
কেহ বলে, আহমদ নাম মধু ঢালা —
মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লে আলা !
মজনূঁরও চেয়ে হল দীওয়ানা সবে,
নাচে গায় নামের নেশার ঝোঁকে ॥

৯৫

প্রিয় মুহ্‌রে-নবুয়ত-ধারী হে হজরত,
তরিতে উম্মতে এলে ধরায়।
মোহাম্মদ মোস্তফা, আহমদ মুজতবা —
নাম জপিতে নয়নে আঁসু ঝরায় ॥

দিলে মুখে তক্‌বীর, দিলে বুকে তৌহিদ,
দিলে দুঃখের সান্ত্বনা খুশির ঈদ ;
দিলে প্রাণে ঈমান, দিলে হাতে কোরআন,
দিলে শিরে শিরতাজ নাম মুসলিম আমায় ॥

তব সব নসিহত মোরা গিয়েছি ভুলে,
শুধু নাম তব আছে জেগে প্রাণের কূলে ;
ও-নামে এ প্রাণ-সিন্ধু দোলে ;
আমি ঐ নামে তরে যাব, আছি আশায় ॥

৯৬

বহে শোকের পাথার আজি সাহারায়।
"নবীজী নাই" — উঠ্‌লো মাতম্‌ মদিনায়॥

আঁখি-প্রদীপ এই ধরণীর
গেল নিভে', ঘিরিল তিমির ;
দ্বীনের রবি মোদের নবী চায় বিদায়।
সইলো না রে বেহেশ্‌তি দান দুনিয়ায়॥

না পুরিতে সাধ আশা,
না মিটিতে তৌহিদ-পিপাসা,
যায় চলে দ্বীনের শাহান্‌শাহ্‌, হায় রে হায় !
সেই শোকেরই তুফান বহে 'লু'-হাওয়ায়॥

বেড়েছে আজ দ্বিগুণ পানি
দজ্‌লা ফোরাত নদীতে,
তুর ও হেরা পাহাড় ফেটে
অশ্রু-নির্ঝর বয়ে যায়॥

ধরার জ্যোতি হরণ করে
উজল হল ফের বেহেশ্‌ত ;
কাঁদে পশু-পাখি ও তরু-লতায়,
সেই কাঁদনের স্মৃতি দোলে দরিয়ায়॥

৯৭

জাগো অমৃত-পিয়াসী চিত
আত্মা অনিরুদ্ধ
কল্যাণ-প্রবুদ্ধ।
জাগো শুভ্র জ্ঞান পরম
নব-প্রভাত পুষ্প-সম
আলোক-স্নান-শুদ্ধ॥

সকল পাপ কলুষ তাপ
দুঃখ গ্লানি ভোলো,
পুণ্য প্রাণ-প্রদীপ-শিখা
স্বর্গ-পানে তোলো।
বাহিরে আলো ডাকিছে জাগো
তিমির-কারারুদ্ধ॥

ফুলের সম আলোর সম
ফুটিয়া ওঠ হৃদয়ে মম
রূপ-রস-গন্ধে
অনায়াস আনন্দে।
জাগো মায়া-বিমুগ্ধ॥

৯৮

বন-কুন্তলা — তেতালা

বন-কুন্তল এলায়ে
বন-শবরী ঝুরে
সকরুণ সুরে।
বিষাদিত ছায়া তার
চৈতালি সন্ধ্যার
চাঁদের মুকুরে॥

চপলতা বিসরি' যেন বন-যৌবন
বিরহ-ক্ষীণ আজি উদাস উন্মন,
তোলে না ঝঙ্কার আর
ঝরা পাতার
মর্মর নূপুরে॥

যে কুহু কুহরিত মধুর পঞ্চমে
বিভোর ভাবে,
ভগ্ন কণ্ঠে তার থেমে যায় সুর
করুণ রেখাবে।

কোন্ বন-শিকারির অকরুণ তীর
আলো হ'রে নিল ওই উজল আঁখির ;
ফেলে-যাওয়া বাঁশি তার অঞ্চলে লুকায়ে —
গিরি-দরী-প্রান্তরে খোঁজে সে নিঠুরে॥

৯৯

রূপমঞ্জরী তেতালা

পায়েলা বোলে রিনিঝিনি।
নাচে রূপমঞ্জরী শ্রীরাধার সঙ্গিনী॥

ভাব-বিলাসে
চাঁদের পাশে
ছড়ায়ে চাঁদের ফুল নাচে যেন নিশীথিনী॥
নাচে উড়ায়ে নীলাম্বরী অঞ্চল ;
মৃদু মৃদু হাসে
আনন্দ-রাসে
শ্যামল চঞ্চল।
কভু মৃদু মন্দ
কভু ঝরে দ্রুত তালে সুমধুর ছন্দ ;
বিরহের বেদনা মিলন-আনন্দ
ফোটায় তনুর ভঙ্গিমাতে
ছন্দ-বিলাসিনী॥

১০০

মডার্ন

দীপ নিভিয়াছে ঝড়ে
কে যেন কহিছে কেঁদে

জেগে আছে মোর আঁখি
মোর বুকে মুখ রাখি'
পথিক এসেছ না কি॥

হারায়ে গিয়াছে চাঁদ
আঁচলে লুকায়ে ফুল

জল-ভরা কালো মেঘে,
বাতায়নে আছি জেগে,

শূন্য গগনে দেয়া কহিতেছে যেন ডাকি'
পথিক এসেছ না কি॥

ভাঙিয়া দুয়ার মম কাড়িয়া লইতে মোরে —
এলে কি ভিখারি ওগো প্রলয়ের রূপ ধরে?

ফুরাইয়া যায় বধূ শুভ লগনের বেলা
আনো আনো ত্বরা করি' ওপারে যাবার ভেলা।
'পিয়া পিয়া' বলে বনে ঝুরিছে পাপিয়া পাখি
পথিক এসেছ নাকি॥

১০১

আধুনিক

তোমারি আঁখির মত আকাশের দু'টি তারা
চেয়ে থাকে মোর পানে নিশীথে তন্দ্রাহারা
সে কি তুমি, সে কি তুমি?
ক্ষীণ আঁখি-দীপ জ্বালি বাতায়নে জাগি একা
অসীম অন্ধকারে খুঁজি তব পথ-রেখা
সহসা দখিনা বায়ে চাঁপা-বনে জাগে সাড়া
সে কি তুমি? সে কি তুমি?

তব স্মৃতি যদি ভুলি ক্ষণ-তরে আন্-কাজে
কে যেন কাঁদিয়া ওঠে আমার বুকের মাঝে
সে কি তুমি, সে কি তুমি?

বৈশাখী ঝড়ে রাতে চমকিয়া উঠি জেগে
বুঝি অশান্ত মম আসিলে ঝড়ের বেগে
ঝড় চলে যায় কেঁদে ঢালিয়া শ্রাবণ-ধারা
সে কি তুমি, সে কি তুমি?

১০২

মম তনুর ময়ূর-সিংহাসনে
এস রূপ-কুমার ফরহাদ।
মোর ঘুম যবে ভাঙিল প্রিয়
গগনে ঢলিয়া পড়িল চাঁদ॥

আমি শিরী — হেরেমের নন্দিনী গো।
ছিনু অন্ধকারের কারা-বন্দিনী গো
ভেবেছিনু তুমি শুধু রূপের পাগল,
বুঝি নাই কারে বলে প্রেম-উন্মাদ॥

গিরি-পাষাণে আঁকিলে তুমি যে ছবি মম
দিলে যে মধু
সেই মধু চেয়ে, সেই শিলা বুকে লয়ে
কাঁদি, ফিরে এস ফিরে' এস বঁধু॥

মোরে লয়ে যাও সেই প্রেম-লোকে
বিরহী
কাঁদিছে যেথায় 'শিরী শিরী' কহি;
আজ ভরিয়াছে বিষাদের বিলাপে
গোলাপের সাধ॥

১০৩

আমি যার নূপুরের ছন্দ
বেণুকার সুর —
কে সেই সুন্দর কে

আমি যার বিলাস-যমুনা
বিরহ-বিধুর —
কে সেই সুন্দর কে॥

যাহার গানের আমি বনমালা,
আমি যার কথার কুসুম-ডালা,
না-দেখা সুদূর —
কে সেই সুন্দর কে॥

যার শিখী-পাখা লেখনী হয়ে
গোপনে মোরে কবিতা লেখায় —
সে রহে কোথায়, হায়।

আমি যার বরষার আনন্দ-কেকা
নৃত্যের সঙ্গিনী দামিনী-রেখা,
যে মম অঙ্গে কাঁকন কেয়ূর —
কে সেই সুন্দর কে॥

১০৪

কুহু কুহু কুহু বলে মহুয়া-বনে।
মাধবী চাঁদ এলে পূব-গগনে।

দুলে ওঠে বনান্ত,
আসিলে কে পান্থ,
তব পদধ্বনি অশান্ত হে
শুনি মম মনে॥
বাতায়নে প্রদীপ জ্বালি'
আসা-পথ চাহি,
প্রহর গণি, গান গাহি।

এলে আজি নিশীথে
দেখা দিতে তৃষিতে,
শুনি দশদিশিতে
বাঁশি তব ক্ষণে ক্ষণে॥

১০৫

নিশীথ রাতে ডাক্‌লে আমায়
কে গো তুমি কে?
কাঁদিয়ে গেলে আমার মনের
বনভূমিকে॥
কে গো তুমি?

তোমার আকুল করুণ স্বরে
আজ্‌কে তারেই মনে পড়ে —

এম্‌নি রাতে হারিয়েছি যে
হৃদয়-মণিকে ॥

দুয়ার খুলে চেয়ে আছি
তারার পানে দূরে ;
আর একটি বার ডাকো ডাকো
তেম্‌নি করুণ সুরে।

একটি কথা শুন্‌বো বলে
রাত কেটে যায় চোখের জলে ;
দাও সাড়া দাও, জাগিয়ে তোলো
আঁধার-পুরীকে ॥

১০৬

নিম ফুলের মউ পিয়ে
ঝিম হয়েছে ভোমরা।
মিঠে হাসির নূপুর বাজাও
ঝুমুর নাচো তোমরা ॥

কভু কেয়া-কাঁটায়
কভু বাব্‌লা-আঠায়
বারো বারে ভোমরার পাখা জড়ায় গো —পাখা জড়ায়
দেখে হেসে লুটিয়ে পড়ে
ফুলের দেশের বউরা ॥

১০৭
হোরী — লাউনী

আবীর-রাঙা আভীরা নারী সনে
কৃষ্ণ কানাই খেলে হোলি।
হোরির মাতনে চুড়ি ও কাঁকনে
উঠিছে কল-কাকলি ॥

শ্যামল তনু হল রাঙা আবীরে রেঙে,
ইন্দ্রধনু-ছটা যেন কাজল মেঘে,
রাঙিল রঙে নীল চোলি॥

লহু লহু হাসে মুহু মুহু ভাসে
রাঙা কুঙ্কুম ফাগের রাগে,
দোঁহে দুহু ধরি' মারে পিচকারি
চাঁদ-মুখে কলঙ্ক জাগে
রাঙা কুঙ্কুম ফাগের রাগে।
অঙ্গে অপাঙ্গে অনঙ্গ-রঙ্গিমা
ইঙ্গিতে উঠিছে উছলি'॥

১০৮

ভীম পলশ্রী — দাদ্‌রা

ফুটল সন্ধ্যামণির ফুল
আমার মনের আঙিনায়।
ফুল ফোটাতে কে এলে
ফুল-ঝরানো সাঁঝ-বেলায়॥

আজ কি মোর দিনের শেষে
উঠল চাঁদ মধুর হেসে,
কৃষ্ণা-তিথির তৃষ্ণা মোর
মিটিল এ জোছনায়॥

আজ যে আঁখি অশ্রু-হীন,
কি দিয়ে ধোওয়াই চরণ,
সুন্দর বরের বেশে
এলে কি আমার মরণ।
দেখ বসন্তের পাখি
কোয়েলা গেছে ডাকি,
আনন্দের দূত তুমি
ডাকিয়া ফুল ফোটায়॥

১০৯

মিটিল না সাধ ভালোবাসিয়া তোমায়।
তাই আবার বাসিতে ভালো আসিব ধরায়॥

আবার বিরহে তব কাঁদিব,
আবার প্রণয়-ডোরে বাঁধিব
শুধু নিমেষেরি তরে আঁখি দুটি জলে ভরে
ঝরে যাব অবেলায়॥
যে গোধূলি-লগ্নে নববধূ হয় নারী,
(সেই) গোধূলি-লগ্ন বঁধু দিল আমারে
গেরুয়া শাড়ি।

বঁধু আমার বিরহ তব গানে
সুর হয়ে কাঁদে প্রাণে প্রাণে
আমি নিজে নাহি ধরা দিয়ে সকলের প্রেম নিয়ে
দিনু তব পায়॥

১১০

মেঘ-বরণ কন্যা থাকে
মেঘলামতীর দেশে।
সেই দেশে মেঘ জল ঢালিও
তাহার আকুল কেশে॥

তাহার কালো চোখের কাজল
শাওন-মেঘের চেয়েও শ্যামল,
চাউনিতে তার বিজলি ছড়ায়,
চমক বেড়ায় ভেসে॥

সে বসে থাকে পা ডুবিয়ে
ঘুমতী নদীর জলে;
সে দাঁড়িয়ে থাকে ছবির মত
একলা তরু-তলে।

কদম-ফুলের মালা গেঁথে
ছড়িয়ে সে দেয় ধানের ক্ষেতে ;
তারে দেখ্‌তে পেলে আমার কথা
কইও ভালবোসে ॥

সি. ই. ২৭৩৫

১১১

কে হেলে দুলে চলে এলোচুলে,
হেসে নদীকূলে এল হেলে দুলে ;
নূপুর রিনিকি ঝিনি বাজে রে
পথ-মাঝে রে, বাজেরে ॥
দূরে মন উদাসী
বাজে বাঁশের বাঁশি,
বকুল-শাখে পাপিয়া ডাকে
হেরিয়া বুঝি বন-বালিকায়
রঙিন সাজে রে, বাজেরে ॥

এ বুঝি নদীর কেউ
তাই অধীর হল জলে ঢেউ ;
চন্দন-মাখা যেন চাঁদের পুতলি
যত চলে তত রূপে ওঠে উথলি',
মেঘে লুকালো পরী লাজে রে, বাজেরে
পথ মাঝে রে, বাজে রে ॥

এফ. টি. ১২৫৩২

১১২

মোর না মিটিতে আশা, ভাঙিল খেলা।
জীবন-প্রভাতে এল বিদায়-বেলা ॥
আঁচলের ফুলগুলি করুণ নয়ানে
নিরাশায় চেয়ে আছে মোর মুখ-পানে,
বাজিয়াছে বুকে যেন কার অবহেলা ॥

আঁধারের এলোকেশ দু'হাতে জড়ায়ে
যেতে যেতে নিশীথিনী কাঁদে বন-ছায়ে!

বুঝি দুখ-নিশি মোর
হবে না হবে না ভোর;
ভিড়িবে না কূলে মোর বিরহের ভেলা॥

১১৩

নাচের নেশার ঘোর লেগেছে
নয়ন পড়ে ঢুলে লো —
নয়ন পড়ে ঢুলে।
বুনোফুল পড়ল ঝরে নাচের ঘোরে
দোলন খোঁপা খুলে লো —
দোলন খোঁপা খুলে॥

শুনে এই মাদল-বাজা
নাচে চাঁদ রাতের রাজা, নাচে লো নাচে
শালুকের কাঁকাল ধরে
তালপুকুরের জলে হেলে দুলে লো —
জলে হেলে দুলে॥

আঁউরে গেল ঝুমকো জবা
লেগে গরম গালের ছোঁয়া,
বাঁশি শুনে ঘুলায় মনে কয়লা-খাদের ধোঁওয়া।

সই নাচ ফুরালে ফিরে ঘরে
রাত কাটাব কেমন করে,
পড়বে মনে বাঁশুরিয়ার
চোখ দুটি টুলটুলে লো —
চোখ দুটি টুলটুলে॥

১১৪

খেলা শেষ হল, শেষ হয় নাই বেলা।
কাঁদিও না, কাঁদিও না —
তব তরে রেখে গেনু প্রেম-আনন্দ মেলা॥

খেলো খেলো তুমি আজো বেলা আছে,
খেলা শেষ হল এস মোর কাছে ;
প্রেম-যমুনার তীরে বসে রব
লইয়া শূন্য ভেলা ॥

যাহারা আমার বিচার করেছে —
ভুল করিয়াছে জানি ;
তাহাদের তরে রেখে গেনু মোর
বিদায়ের গানখানি।

হই কলঙ্কী, হোক মোর ভুল,
বালুকার বুকে ফুটায়েছি ফুল ;
তুমিও ভুলিতে নারিবে সে কথা —
হানো যত অবহেলা ॥

১১৫

ওর নিশীথ-সমাধি ভাঙিও না।
মরা ফুলের সাথে ঝরিল সে ধূলি-পথে
সে আর জাগিবে না, তারে ডাকিও না ॥

তাপসিনী-সম তোমারি ধ্যানে
সে চেয়েছিল তব পথের পানে ;
জীবনে যাহার মুছিলে না আঁখি-ধার
আজি তাহার পাশে কাঁদিও না ॥

মরণের কোলে সে গভীর শান্তিতে
পড়েছে ঘুমায়ে,
তোমারই তরে গাঁথা শুক্‌নো মালিকা
বক্ষে জড়ায়ে।
যে মরিয়া জুড়ায়েছে —
ঘুমাইতে দাও তারে জাগিও না ॥

১১৬

গগনে খেলায় সাপ বরষা-বেদিনী।
দূরে দাঁড়ায়ে দেখে ভয়-ভীতা মেদিনী॥

দেখায় মেঘের ঝাঁপি তুলিয়া,
ফণা তুলি' বিদ্যুৎ-ফণী ওঠে দুলিয়া,
ঝড়ের বাঁশিতে বাজে তার
অশান্ত রাগিণী॥

মহাসাগরে লুটায় তার সর্পিল অঞ্চল,
দিগন্তে দুলে তার এলোকেশ পিঙ্গল,
ছিটায় মন্ত্রপূত ধারাজল অবিরল
তন্বী মোহিনী॥

অশনি-ডমরু ওঠে দমকি'
পাতালে বাসুকি ওঠে চমকি'
তার ডাক শুনে ছুটে আসে নদীজল
(যেন) পাহাড়িয়া নাগিনী॥

১১৭

খেলে চঞ্চলা বরষা-বালিকা
মেঘের এলোকেশ ওড়ে পুবালী বায়
দোলে গলায় বলাকার মালিকা॥

চপল বিদ্যুতে হেরি সে চপলার
ঝিলিক হানে কণ্ঠের মণিহার,
নীল আঁচল হতে তৃষিত ধরার পথে
ছুঁড়ে ফেলে মুঠি মুঠি বৃষ্টি-শেফালিকা॥

কেয়া পাতার তরী ভাসায় কমল ঝিলে
তরুলতার শাখা সাজায় হরিৎ-নীলে।

ছিটিয়ে মেঠোজল খেলে সে অবিরল
কাজলা দীঘির জলে ঢেউ তোলে
আন্‌মনে ভসায় পদ্ম-পাতার থালিকা ॥

১১৮

বর্ষা ঋতু এল এল বিজয়ীর সাজে।
বাজে গুরু গুরু আনন্দ-ডমরু অম্বর মাঝে ॥
(বাঁকা) বিদ্যুৎ তরবারি ঘন ঘন চমকায়,
হানে তীর-বৃষ্টির অবিরল ধারায়,—
শুনি রথচক্রের ধ্বনি অশনির রোল,
সিন্ধু-তরঙ্গে মঞ্জীর বাজে ॥

ভীত বন উপবন লুটায়ে লুটায়ে
প্রণতি জানায় সেই বিজয়ীর পায়ে ;
(তার) অশান্ত গতিবেগ শুনি পূব-হাওয়াতে
চলে মেঘ-কুঞ্জর-সেনা তার সাথে,
তূণীর কেতকী জল-ধনু হাতে
হের চঞ্চল দুরন্ত গগনে বিরাজে ॥

১১৯

রুম ঝুম ঝুম বাদল-নূপুর বোলে।
তমাল-বরণী কে নাচে গগন-কোলে ॥

তার অঙ্গের লাবণি যেন ঝরে অবিরল
হয়ে শীতল মেঘলামতীর ধারাজল ;
কদম-ফুলের পীত উত্তরী তার
পূব হাওয়াতে দোলে ॥

বিজলি ঝিলিকে তার বনমালার
আভাস জাগে,

বন-কুন্তলা ধরা হল শ্যাম মনোহরা
তাহারই অনুরাগে।

তারে হেরি পাপিয়া পিয়া পিয়া কহে,
সাগর কাঁদে, নদীজল বহে ;
ময়ূর-ময়ূরী বন-শর্বরী
নাচে টলে টলে॥

১২০

(মিশ্র) গান্ধারী—ত্রিতাল

বরণ করে নিও না গো
(আমারে) নিও হরণ করে।
ভীরু আমায় জয় কর গো
তোমার মনের জোরে॥

পরাণ ব্যাকুল তোমার তরে
চরণ শুধু বারণ করে।
লুকিয়ে থাকি তোমার আশায়
রঙিন বসন প'রে॥

লজ্জা আমার ননদিনী লতিকার-ই প্রায়
যখনই যাই শ্যামের কাছে দাঁড়িয়ে আছে ঠায়।

চাইতে নারি চোখে চোখে
দেখে পাছে কোনো লোকে,
নয়নকে তাই শাসন করি
অশ্রুজলে ভরে॥

রচনা-কাল—১৯৩৫

১২১

মালা গাঁথা শেষ না হতে তুমি এলে ঘরে,
শূন্য হাতে তোমায় বরণ করব কেমন করে?

লজ্জা পাবার অবসর মোর
দিলে না হে চঞ্চল চোর,
সজ্জা-বিহীন মলিন তনু দেখলে নয়ন ভরে॥

বিফল মালার ফুলগুলি হায় কোথায় এখন রাখি,
ক্ষণিক দাঁড়াও, ঐ কুসুমে চরণ দুটি ঢাকি।
(তোমার) চরণ দু'টি ঢাকি।

আকুল কেশে পা মুছিয়ে
করবো বাতাস আঁচল দিয়ে,
মোর নয়ন হবে আরতি–দীপ তোমার পূজার তরে॥

১২২

যখন আমার কুসুম ঝরার বেলা,
তখন তুমি এলে।
ভাটির স্রোতে ভাসল যখন ভেলা
পারের পথিক এলে॥

আঁধার যখন ছাইল বনতল,
পথ হারিয়ে এলে হে চঞ্চল,
দীপ নিভাতে এলে কি বাদল
ঝড়ের পাখা মেলে॥

শূন্য যখন নিবেদনের থালা
তখন তুমি এলে,
শুকিয়ে যখন ঝরল বরণ–মালা
তখন তুমি এলে॥

নিরশ্রু এই নয়ন–পাতে
শেষ পূজা মোর আজকে রাতে
নিবু নিবু প্রাণ–শিখাতে
আরতি–দীপ জ্বেলে॥

১২৩

সজল হাওয়া কেঁদে বেড়ায়
কাজল আকাশ ঘিরে',
তুমি এস ফিরে।
উঠ্ছে কাঁদন ভাঙন-ধরা
নদীর তীরে তীরে।
তুমি এস ফিরে॥

বন্ধু তব বিরহেরি
অশ্রু ঝরে গগন ঘেরি',
লুটিয়ে কাঁদে বনভূমি
অশান্ত সমীরে॥

আকাশ কাঁদে, আমি কাঁদি,
বাতাস কেঁদে সারা ;
তুমি কোথায়, কোথায় তুমি
পথিক পথহারা।

দুয়ার খুলে নিরুদ্দেশে
চেয়ে আছি অনিমিষে,—
আঁচল ঢেকে রাখবো কত
আশার প্রদীপটিরে॥

'ভারতবর্ষ'
শ্রাবণ ১৩৪৩

১২৪

সেদিন অভাব ঘুচবে কি মোর
যেদিন তুমি আমার হবে ?
আমার ধ্যানে আমার জ্ঞানে
প্রাণ মন মোর ঘিরে রবে॥

রইবে তুমি প্রিয়তম
আমার দেহে আত্মা-সম,

জানি না সাধ মিটবে কি না
তেমন করেও পাব যবে ॥
পাওয়ার আমার শেষ হবে না
পেয়েও তোমায় বক্ষতলে,
সাগর মাঝে মিশে গিয়েও
নদী যেমন বয়ে চলে।

চাঁদকে দেখে পরান জুড়ায়,
তবু দেখার সাধ কি ফুরায়,
মিটেছিল সাধ কি রাধার
নিত্য পেয়েও নীল মাধবে ॥

১২৫

ওরে শুভ্রবসনা রজনীগন্ধা
বনের বিধবা মেয়ে,
হারানো কাহারে খুঁজিস নিশীথ–
আকাশের পানে চেয়ে ॥

ক্ষীণ তনু-লতা বেদনা-মলিন
উদাস মূরতি ভূষণ-বিহীন,
তোরে হেরি ঝরে কুসুম-অশ্রু
বনের কপোল বেয়ে ॥

তুই লুকায়ে কাঁদিস, রজনী জাগিস
সবাই ঘুমায় যবে,
বিধাতারে যেন বলিস, 'দেবতা
আমারে লইবে কবে।'

করুণ-শুভ্র-ভালোবাসা তোর
সুরভি ছড়ায় সারা নিশি ভোর,
প্রভাত বেলায় লুটাস ধুলায়
যেন কারে নাহি পেয়ে ॥

১২৬

দোলা লাগিল দখিনার বনে বনে,
বাঁশরি বাজিল ছায়ানটে মনে মনে॥
চিত্তে চপল নৃত্যে কে
ছন্দে ছন্দে যায় ডেকে ;
যৌবনের বিহঙ্গ ঐ
ডেকে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে॥

বাজে বিজয়-ডঙ্কা তার এল তরুণ ফাল্গুনী,
জাগো ঘুমন্ত—দিকে দিকে ঐ গান শুনি'।

টুটিল সব অন্ধকার,—
খোল খোল বন্ধ দ্বার ;
বাহিরে কে যাবি আয়—
কে শুধায় জনে জনে॥

১২৭

সখি আর অভিমান জানাবো না,
বাসবো ভালো নীরবে।
যে চোখের জলে গললো না
তার মুখের কথায় কি হবে॥

অন্তর্যামী হয়ে অন্তরে মোর
দিবা-নিশি রহে যে চিত-চোর
অন্তরে মোর কোন্ সে ব্যথা—
বোঝে না সে, কে ক'বে॥

সখি, এবার আমার প্রেম-নিবেদন গোপনে—
সূর্যমুখী চাহে যেমন তপনে।
কুমুদিনী চাঁদে ভালোবাসে
তাই চিরদিন অশ্রুর সায়রে ভাসে,
চিরজীবন জানি কাঁদিতে হবে
তাহারে চেয়েছি যবে॥

১২৮

প্রিয়তম হে, বিদায় !
আর রাখিতে নারি, আশা-দীপ নিভে যায়
দুরন্ত বায় ॥
কত ছিল বলিবার, হায় ! হল না বলা,
ঝুরিতেছে চামেলির বন উতলা ;
যেন অনন্ত দিনের বিরহিণী কে
কাঁদে দিকে দিকে, হায় ! হায় ॥

রহিল ছড়ানো মোর প্রাণের তিয়াস
হুতাশ পবনে ;
জড়ানো রহিল মোর করুণ স্মৃতি
ধূসর গগনে।

তুমি মোরে স্মরিও
যদি এই পথে কোনদিন চলিতে প্রিয়
নিশিভোরে ঝরাফুল দলে যাও পায় ॥

১২৯

তব গানের ভাষায় সুরে
বুঝেছি।
এতদিনে পেয়েছি তারে
আমি, যারে খুঁজেছি ॥

ছিল, পাষাণ হয়ে গভীর অভিমান,
এলো সহসা আনন্দ-অশ্রুর বান ;
বিরহ-সুন্দর হয়ে সেই এলো
দেবতা বলে যারে পূজেছি ॥

তোমার দেওয়া বিদায়ের মালা
পুনঃ প্রাণ পেল প্রিয়,
হয়ে শুভদৃষ্টির মিলন-মালিকা
বুকে ফিরে এলো প্রিয় ॥

যাহারে নিষ্ঠুর বলেছি,
নিশীথে গোপনে কেঁদেছি;
নয়নের বারি হাসি দিয়ে মুছেছি।

১৩০

কেন মনোবনে মালতী-বল্লরী দোলে—
জানি না, জানি না, জানি না।
কেন মুকুলিকা ফুটে ওঠে পল্লব-তলে—
জানি না, জানি না, জানি না॥

কেন ঊর্মিলা-ঝর্ণার পাশে
সে আপন মঞ্জরি-ছায়া দেখে হাসে;
কেন পাপিয়া কুহু মুহু মুহু বোলে—
জানি না, জানি না, জানি না॥

চৈতালী চাঁপা কয়—'মালতী শোন্,
শুনেছিস্ বুঝি মধুকর-গুঞ্জন,
তাই বুঝি এত মধু সুরভি উথলে—,
মধুমালতী বলে, 'জানি না, জানিনা, জানিনা॥

১৩১

এখনো ওঠেনি চাঁদ, এখনো ফোটেনি তারা,
এখনো দিনের কাজ হয়নি যে মোর সারা।
হে পথিক, যাও ফিরে॥

এখনো বাঁধিনি বেণী, তুলিনি এখনো ফুল,
জ্বালি নাই মণিদীপ মম মন-মন্দিরে।
হে পথিক, যাও ফিরে॥

পল্লব-গুণ্ঠনে নিশিগন্ধার কলি
চাহিতে পারে না লাজে দিবস যায়নি বলি
এখনো ওঠেনি ঢেউ থির সরসীর নীরে।
হে পথিক, যাও ফিরে॥

যবে ঝিমাইবে চাঁদ ঘুমে তখন তোমার লাগি
রব একা পথ চেয়ে, বাতায়ন পাশে জাগি'
কবরীর মালা খুলে
ফেলে দেবো ধীরে ধীরে।
হে পথিক, যাও ফিরে॥

১৩২

আবার ফাগুন এসেছে ফিরিয়া
তুমি তো এলে না, হায়!
শূন্য দেউল নাহি জ্বলে ধূপ
প্রদীপ নিভিয়া যায়॥

দিনশেষে যবে ঘনায় সন্ধ্যা,
জাগে চাঁদ জাগে রজনীগন্ধা,
চঞ্চল আঁখি জাগে কার লাগি
নিভৃত বনছায়॥

শাখে গাহে পাখি মুঞ্জরে শাখী
বন-বীণে ওঠে সুর,
উন্মাদ বায়ু গুঞ্জরি' ফেরে
প্রাণ করে দুরু দুর॥

আসিয়াছে পুন মাধবী রাতি,
আসিলে না হায় জাগার সাথী;
পিঞ্জরে কাঁদে জীবন-পাপিয়া
বন্ধন-বেদনায়॥

১৩৩

পথিক বন্ধু, এস এস
পাপড়ি-ছাওয়া পথ বেয়ে।
মন হয়েছে উতলা গো
তোমার আসার-পথ চেয়ে॥

আকাশ জুড়ে আলোর খেলা,
বসুন্ধরায় ফুলের মেলা ;
রঙিন মেঘের ভাসলো ভেলা
তোমারই আসার আভাস পেয়ে ৷৷

সাধ জাগে ঐ পথে তোমার
পেতে রাখি মন-প্রাণ,
চলতে গিয়ে দল্‌বে তারে
চরণ-ছোঁওয়া করবে দান ৷৷

তোমার ধ্যানে—হে রাজাধিরাজ,
সাজ ভুলেছি, ভুলেছি কাজ ;
আসবে তুমি সেই খুশিতে
আছে আমার মন ছেয়ে ৷৷

১৩৪

তোমায় যদি পেয়ে হারাই
নাই বা পেলাম তবে—
নেই কো আশা সারা জনম
তুমি আমার হবে ৷৷

তাই তো তোমায় মালার ডোরে
বাঁধিনি কো নিবিড় করে,
দূর আকাশের চাঁদকে বলো
কে পেয়েছে কবে ৷৷

শুক্লা রাতির চেয়ে আমার
কৃষ্ণাতিথি ভালো,
চাঁদের চেয়ে ভালো আমার
মাটির দীপের আলো।

তুমি হয়ো প্রদীপ-শিখা—
চিরকালের বাসন্তিকা,
মোর ফুলের বনে চাই না তোমায়,
মনের বনেই রবে ৷৷

১৩৫

তুমি আর একটি দিন থাকো।
হে চঞ্চল, যাবার আগে
মোর মিনতি রাখো॥
আমি ভালো ছিলাম ভুলে একা
কেন নিঠুর দিলে দেখা,
তুমি ঝরা ফুলের গাঁথলে মালা
গলায় দিলে না কো॥

তোমার কাজের মাঝে আমায় ভোলা
সহজ হবে, স্বামী!
কেমন করে একলা ঘরে
থাকবো ভুলে আমি।

নিভু নিভু প্রদীপ আশার
তুমি জ্বালিয়ে দিলে যদি আবার—
প্রিয় নিভ্‌তে তারে দিও না কো,
আদর দিয়ে রাখো॥

১৩৬

জাগো কৃষ্ণকলি জাগো কৃষ্ণকলি।
মধুকরের মিনতি মানো
ডাকে জাগো বলি বিহগ-কাকলি॥

তব দ্বারে বারেবারে মন-উদাসী
ভোরের হাওয়া এসে বাজায় বাঁশি,
ফিরে গেল ভ্রমরা মউ-পিয়াসী
অযথা বিতানে কানে কথা বলি'॥

হের হাতের তার ফুলঝুরি ফেলে ধুলায়
উদাসী বসন্ত মাগে বিদায়
দীরঘ শ্বাস ফেলি ঝরা পাতায়।

চাহে রঙিন ঊষা তব রঙের আভাস
তব লাল আভায় লজ্জা পায় হিঙুল পলাশ।
এলো কোকিল তোমার রঙে খেলতে হোলি॥

১৩৭

কন্যার পায়ের নূপুর বাজে রে! বাজে রে!
রুমু ঝুমু রুমু ঝুমু বাজে রে। বাজে রে!
যেন ভোমরারি ঝাঁক গেল উড়ে
ফুল–বনের মাঝে রে॥

সায়র–জলে নামলো যেন বুনো হাঁসের দল,
যেন পাহাড় বেয়ে ছুটে এল ঝর্ণা ছলছল্;
থির সায়রে টাপুর–টুপুর ঝরে মেঘের জল
যেন বাদল–সাঁঝে রে॥

যেন আচম্‌কা নিঝুম রাতে গাঙে জোয়ার এলো,
ঝরা পাতায় চৈতী বাতাস বইলো এলোমেলো॥

সে সুর ওঠে রিম্‌ঝিমিয়ে
আমার বুকে চমক দিয়ে,
মহুয়া–ডালে গানের পাখি
নীরব হল লাজে রে॥

১৩৮

কে ডাকিলে আমারে আঁখি তুলে
এই প্রভাত তটিনী–কূলে কূলে॥

ঐ ঘুমায়ে সকলি, জাগেনি কেউ,
জল নিতে এখনো আসেনি বউ;
শুধু তব নদীতে জেগেছে ঢেউ,
মেলেছে নয়ন কানন–ফুলে॥

যে সুবাস ঝরে ও-এলোকেশে
কমলে তা দিলে নাহিতে এসে ;
তব তনু-বাস দীঘিতে ভেসে
মাতাইছে মধুপ পথ ভুলে ॥
ও শিশির-কপোল-স্বেদ-বারি
পড়িল ঝরি নয়নে আমারি ;
জাগিয়া হেরি রূপ মনোহারী
দাঁড়ায়ে উষসী তোরণ-মূলে ॥

১৩৯

কঠিন ধরায় ফোটাতে ফসল-ফুল—
কে জানে মহা-সিন্ধু কেন গো
হইয়া ওঠে ব্যাকুল ॥
মেঘ হয়ে কেন আকাশ ভরিয়া
বারিধারা রূপে পড়ে গো ঝরিয়া,
কত লোক ভাবে উৎপাত এল,
কত লোক ভাবে ভুল ॥

কার বাঁধা-ঘর ভেঙে গেল, হায় !
বোঝে না কো তাহা মেঘ,
কূলে কূলে আনে ফুলের বন্যা
তাহার প্রেমের বেগ।

জানে না কাহার করিল সে ক্ষতি,
সে জানে স্নিগ্ধ হল বসুমতী ;
যে অকূলের পথে টানে, সে বোঝে না
ভাসিল কাহার কূল ॥

১৪০

আমি পথভোলা ভিনদেশী গানের পাখি।
তোমাদের সুরের সভায়
এই অজানায় লহ গো ডাকি' ॥

তোমরা বেঁধেছ বাসা যে তরু-শাখায়
আমারে বসিতে দিও তাহারি ছায়ায় ;
গাহিবার আছে আশা,
জানি না গানের ভাষা,
তবু ভালোবাসা দিয়ে বাঁধগো রাখী ॥

মায়াময় তোমাদের তরুলতা ফুল,
তোমাদের গান শুনে পথ হ'ল ভুল ;
যেন শতবার এসে জন্মেছি এই দেশে—
বন্ধু হে বন্ধু, অতিথিরে চিনিবে না কি ॥

১৪১

নয়নে নিঁদ নাহি—
নিশীথে প্রহর জাগি' একাকিনী গান গাহি'।

কোথা তুমি কোন দূরে ফিরিয়া কি আসিবে না,
তোমার সাজানো বনে ফুটিয়া ঝরিল হেনা,
কত মালা গাঁথি কত আর পথ চাহি ॥

কত আশা অনুরাগে হৃদয়-দেউলে রেখে
পূজিনু তোমারে পাষাণ, কাঁদিলাম ডেকে ডেকে ;
এস অভিমানী ফিরে, নিরাশার এ তিমিরে
চাঁদের তরণী বাহি' ॥

১৪২

পরো সখি মধুর বধূ-বেশ।
বাঁধো আকুল চাঁচর কেশ ॥
বাঁকা ভুরুর মাঝে পরো খয়েরি টিপ
বকুল-বেলার হার।
ছাড় মলিন বাস শাড়ি চাঁপা রং
পরো পরো আবার।
অধর রাঙাও সলাজ হাসিতে
মোছ নয়ন-ধার।

বিদেশী বন্ধু তোমারে স্মরিয়া
ফিরে এল নিজ দেশ ॥

মিলন-দিনে আর সাজে না মুখ-ভার,
ভোলো ভোলো অভিমান,
মধুরে ডাক কাছে তায়, জুড়াও তাপিত প্রাণ।
অরুণ রাঙা হোক অনুরাগের রঙে
করুণ সজল নয়ান।
মরম-বীণায় উঠুক বাজিয়া
মিলন-মধুর রেশ ॥

১৪৩

বিরহ-শীর্ণা নদীর আজিকে আঁখির কূলে, হায়!
জোয়ারে উঠল দুলে ভরে জল কানায় কানায় ॥

দুলে বসন্ত-রানী
কুসুমিতা বনানী
পলাশ রঙন দোলে নোটন-খোঁপায় ॥

দোলে হিন্দোল-দোলায় ধরণী শ্যাম-পিয়ারী,
দুলিছে গ্রহ-তারা আলোক-গোপ-ঝিয়ারী।
নীলিমার কোলে বসি
দোলে কলঙ্কী-শশী,
দোলে ফুল-উর্বশী ফুল দোলনায় ॥

১৪৪

আয় বনফুল, ডাকিছে মলয়।
এলোমেলো হাওয়ায় নূপুর বাজায়
কচি কিশলয় ॥
তোমরা এলে না বলে ভ্রমরা কাঁদে,
অভিমানে মেঘ ঢাকিল চাঁদে,

"ভুল বঁধু ভুল" টুলটুলে মৌটুসি
বুলবুলে কয়॥

দুহু যামিনীর তিমির টুটে
মুহু মুহু কূহু কুহরি' ওঠে।

হে বন-কলি, গুণ্ঠন খোলো
হে মৃদু-লজ্জিতা, লজ্জা ভোলো
'কোথা তার কূল' বলে নটিনী তটিনী
খুঁজে বনময়॥

১৪৫

আমি সূর্যমুখী ফুলের মত
দেখি তোমায় দূরে থেকে।
দলগুলি মোর রেঙে ওঠে
তোমার হাসির কিরণ মেখে॥

নিত্য জানাই প্রেম-আরতি
যে পথে, নাথ, তোমার গতি,
ওগো আমার ধ্রুব জ্যোতি
সাধ মেটে না তোমায় দেখে॥

জানি, তুমি আমার পাওয়ার বহু দূরে, হে দেবতা!
আমি মাটির পূজারিণী, কেমন করে জানাই ব্যথা।

সারা জীবন তবু, স্বামী,
তোমার ধ্যানেই কাঁদি আমি,
সন্ধ্যাবেলা ঝরি যেন
তোমার পানে নয়ন রেখে॥

১৪৬

আঁধারের এলোকেশ ছড়িয়ে এলে
তুমি ধূসর সন্ধ্যা।

তোমারে অর্ঘ্য দিতে বনে ফুটিল কি তাই
রজনীগন্ধা ?

গোধূলির রং সম তব মুখে, হায় !
তরুণ হাসি কেন চকিতে মিলায় ?
সহসা মহুয়া বনে চঞ্চল বায়
হল নিথর সুমন্দা ॥

বিষাদ-গভীর তব নয়ন যেন
নিশীথের সিন্ধু ;
মুদিত কমলের দলিত দলে তুমি
শিশিরের বিন্দু।

তুমি সকরুণ প্রার্থনা বেলাশেষের,
পথ-হারা পাখি তুমি দূর বিদেশের,
স্নিগ্ধ স্রোত তুমি দূর অমরার
অলকানন্দা ॥

১৪৭
আধুনিক

তোমার মনে ফুটবে যবে প্রথম মুকুল।
প্রিয় হে প্রিয়, আমারে দিও সে প্রেমের ফুল ॥

দীরঘ বরষ মাস তাহারই আশে
জাগিয়া রব তব দুয়ার-পাশে,
বহিবে কবে ফুল-ফোটানো
দখিনা বাতাস অনুকূল ॥

আর কারে দাও যদি আমার সে ধ্যানের কুসুম
ক্ষতি নাই, ওগো প্রিয়, ভাঙুক এ অকরুণ ঘুম

গুঞ্জরি গুঞ্জরি ভ্রমর সম
কাঁদিব তোমারে ঘিরি', প্রিয়তম !
হুতাশ বাতাস সম কুসুম ফুটায়ে
চলে যাব দূরে বেভুল ॥

এন, ১৭০৬৪

১৪৮

শিউলি মালা গেঁথেছিলাম
তোমায় দেবো বলে।
না নিয়ে সে মালা নিঠুর
তুমি গেলে চলে॥

প্রণাম করে উদ্দেশে তাই
সেই মালিকা জলে ভাসাই,
তোমার ঘাটে লাগে যদি
নিও চরণ-তলে॥

এল শুভদিন যবে মোর
দুখের রাতির শেষে
তোমার তরী গেল ভেসে
সুদূর নিরুদ্দেশে।
দিন ফুরাবে শিউলি ফোটার
মোর শুভদিন আসবে না আর,
ভরলো বিফল পূজার থালা
নীরব চোখের জলে॥

১৪৯

তুমি কি আসিবে না।
বলেছিলে তুমি আসিবে আবার ফুটিবে যবে হেনা॥

সেদিন ঘুমায়ে ছিল যে মুকুল
আজি সে পূর্ণ বিকশিত ফুল,
সেদিনের ভীরু অচেনা হৃদয়
আজি হতে চায় চেনা॥

ঘন-পল্লব-গুণ্ঠন-ঢাকা
ছিল সেদিন যে লতা
আজি সে পুষ্প নিবেদন লয়ে
কহিতে চায় যে কথা।

প্রদীপ জ্বালায়ে আজি সন্ধ্যায়
পথ চেয়ে আছি তোমার আশায়,
পূর্ণিমা তিথি আসিল, হে চাঁদ
অতিথি আসিলে না॥

১৫০

নাই চিনিলে আমায় তুমি,
রইব আধেক চেনা।
চাঁদ কি জানে কোথায় ফোটে
চাঁদনী রাতে হেনা॥

আধো আঁধার আধো আলোতে
একটু চোখের চাওয়া পথে
জানিতাম তা ভুলবে তুমি
আমার আঁখি ভুলবে না॥

আমার ঈষৎ পরিচয়ের
সেই সঞ্চয় লয়ে
হয় না সাহস তোমায় যাব
মনের কথা কয়ে।

একটু জানার মধু পিয়ে
বেড়াই কেন গুনগুনিয়ে,
তুমি জানো আমি জানি
আর কেহ জানে না॥

১৫১

বিদায়ের শেষ বাণী
তুমি মোরে বলো না,
জানি আমি তারে জানি॥

রাতের আঁধারে পাখি
সে কথা কহিছে ডাকি,
বায়ু করে কানাকানি ॥

আকাশের পার হতে
যে তারকা ঝরে যায়,
সে যে আজ কয়ে গেল
তোমার কথাটি, হায় !

যাবে তুমি কোন্ ক্ষণে
ভুলে আছি আনমনে,
ভাঙিও না ভুলখানি ॥

১৫২

মনে পড়ে আজ সে কোন্ জনমে বিদায়-সন্ধ্যাবেলা
আমি দাঁড়ায়ে রহিনু এপারে
তুমি ওপারে ভাসালে ভেলা ॥
সেই যে বিদায়-ক্ষণে
শপথ করিলে বন্ধু আমার, রাখিবে আমারে মনে,
ফিরিয়া আসিবে খেলিবে আবার সেই পুরাতন খেলা ॥

আজো আসিলে না, হায় !
মোর অশ্রুর লিপি বনের বিহগী দিকে দিকে লয়ে যায়
তোমারে খুঁজে না পায়।

মোর গানের পাপিয়া ঝুরে
গহন কাননে তব নাম লয়ে আজও 'পিয়া পিয়া' সুরে।
গান থেমে যায়, হায় ! ফিরে আসে পাখি
বুকে বিঁধে অবহেলা ॥

১৫৩

কৃষ্ণা নিশীথ নাচে ঝিল্লীর নূপুর বাজে
রিমিঝিমি রিমিঝিমি মৃদু আওয়াজে ॥
আঁধারের চাঁচর চিকুর খুলিয়া
আপন মনে নাচে হেলিয়া দুলিয়া

মুঠি মুঠি হিম-কণা তারা-ফুল তুলিয়া
ছুঁড়ে ফেলে ধরণী মাঝে॥

তার মণি-হার খুলে পড়ে উল্কা-মানিক,
তার নাচের নেশায় ঝিমায় দশদিক।

আধো-রাতে আমি শুনি স্বপনে
তার গুঞ্জন-গীত কান-কথা গোপনে,
কালো-রূপের শিখা ও কি শ্যামা বালিকা
নাচে নাচে জাগাইতে নটরাজে॥

১৫৪

আমার ঘরের মলিন দীপালোকে
জল দেখেছি যেন তোমার চোখে॥
বল পথিক বল বল
কেন নয়ন ছলছল,
কেন শিশির টলমল,
কমল-কোরকে॥

তোমার হাসির তড়িৎ-আলোকে
মেঘ দেখেছি তব মানস-লোকে।
চাঁদনী রাতে আনো কেন
পূবের হাওয়ায় কাঁদন হেন,
ধূলি-ঝড়ে ঢাকলে যেন
ফুলেল্ বসন্তকে॥

১৫৫

প্রেমের হাওয়া বইল, যখন মুকুল গেল ঝরে।
প্রদীপ নিভে রইল, যখন তুমি এলে ঘরে॥
তোমার আসার লগ্ন এলো
যে-দিন আশা ফুরিয়ে গেলো,

মন গিয়েছে মরে, যখন পেলাম মনোহরে॥
আঘাত দিয়ে দিয়ে যে-দিন করলে পাষাণ মোরে,
সেদিন নিয়ে বসালে হায়! তোমার ঠাকুর ঘরে।

তোমার শুভ দৃষ্টি লাগি
বহু সে-যুগ ছিলাম জাগি;
আজি কি বেলা-শেষে তুমি এলে স্বয়ম্বরে॥

১৫৬

বনদেবী জাগো
সহকার-করে বাঁধো বল্লরী কঙ্কণ।
আকাশে জাগাও তব
নব কিশলয়-কেতন-কম্পন॥

অশান্ত দক্ষিণা সমীরণ
গেয়ে যাক বসন্ত আবাহন,
বনে বনে হোক ফুল-আলপনা অঙ্কন॥

মধুপ গুঞ্জরে ঝিল্লীর মণি-মঞ্জীরে
তোলো ঝংকার,
মুহু মুহু কুহু রবে আনো আনন্দিত ছন্দ
ধরণীতে অলকানন্দার।

ঝরা পল্লব মরমরে
মৃদু ঝরণার ঝরঝরে
মুখরিত হোক তব বনভূমি-অঙ্গন॥

১৫৭

মোর প্রথম মনের মুকুল
ঝরে গেল হায় মনে, মিলনেরি ক্ষণে।
কপোতীর মিনতি কপোত শুনিল না,
উড়ে গেল গহন বনে॥

দক্ষিণ সমীরণ কুসুম ফোটায় গো,
আমারি কাননে ফুল কেন ঝরে যায় গো,
জ্বলিল প্রদীপ সকলেরি ঘরে, হায় !
নিভে গেল মোর দীপ গোধূলি-লগনে॥

বিফল অভিমানে কাঁদে বনমালা কণ্ঠ জড়ায়ে,
কাঁদি ধূলি-পথে একা ছিন্ন-লতার প্রায়, লুটায়ে লুটায়ে।

দারুণ তিয়াসে এসে সাগর-মুখে
ঢলিয়া পড়িনু, হায় ! বালুকারি বুকে ;
ধোঁয়ারে মেঘ ভাবি' ভুলিল চাতকী—
জ্বলিয়া মরি গো বিরহ-দহনে॥

১৫৮

মোরে ভালবাসায় ভুলিয়ো না,
পাওয়ার আশায় ভুলিয়ো।
মোরে আদর দিয়ে দুলিয়ো না,
আঘাত দিয়ে দুলিয়ো॥

হে প্রিয়, মোর এ কী মোহ—
এ-প্রাণ শুধু চায় বিরহ,
তুমি কঠিন সুরে বেঁধে আমায়
সুরের লহর তুলিও॥

প্রভু, শান্তি চাহে জুড়াতে সব
আমি চাহি পুড়িতে—
সুখের ঘরে আগুন জ্বেলে
পথে পথে ঘুরিতে।

নগ্ন দিনের আলোকেতে
চাহি না তোমায় বক্ষে পেতে,
তুমি ঘুমের মাঝে স্বপনেতে
হৃদয়-দুয়ার খুলিও॥

১৫৯

হংস-মিথুন ওগো যাও কয়ে যাও—
বৈশাখী তৃষ্ণার জল কোথা পাও॥

কোন্ মানস-সরোবর-জলে
পদ্ম-পাতার ছায়াতলে
পাখায় বাঁধিয়া পাখা দু'জনে
প্রখর বিরহ-দাহন জুড়াও॥

অলস দুপুর মোর কাটে না একা,
ঝরে যায় চন্দন-পত্রলেখা।

কখন আসিবে মেঘ নভে,
মিটিবে আমার তৃষ্ণা কবে?
তৃষায় মূর্ছিতা চাতকী—
কোথায় তাহার ঘনশ্যাম, বলে দাও॥

১৬০

সুরে ও বাণীর মালা দিয়ে তুমি
আমারে ছুঁইয়াছিলে।
অনুরাগ-কুঙ্কুম দিলে দেহে মনে,
বুকে প্রেম কেন নাহি দিলে?

বাঁশি বাজাইয়া লুকালে তুমি কোথায়—
যে ফুল ফোটালে, সে ফুল শুকায়ে যায়;
কী যেন হারায়ে প্রাণ করে হায় হায়—
কী চেয়েছিলে—কেন কেড়ে নাহি নিলে॥

জড়ায়ে ধরিয়া কেন ফিরে গেলে,
বল কোন্ অভিমানে?
কেন জাগে নাকো আর সে মাধুরী
রস-আনন্দ প্রাণে?

তোমারে বুঝি গো বুঝেছিনু আমি ভুল,
এসেছিলে তুমি ফোটাতে প্রেম-মুকুল ;
কেন আঘাত করিয়া, প্রিয়তম, সেই
ভুল নাহি ভাঙাইলে ॥

১৬১

স্বপনে এসো নিরজনে প্রিয়া।
আধো রাতে চাঁদের সনে (প্রিয়া) ॥

রহিব যখন মগন ঘুমে
যেয়ো নীরবে নয়ন চুমে—
মধুকর আসে যখন গোপনে
মল্লিকা চামেলি বনে ॥

বাতায়নে চাঁপার ডালে
এসো কুসুম হয়ে নিশীথ কালে।

ভীরু কপোতী সম
এসো হৃদয়ে মম—
বাহুর মালা হয়ে বাসর-শয়নে (প্রিয়া) ॥

১৬২

মুখে কেন নাহি বল
আঁখিতে যে-কথা কহ।
অন্তরে যদি চাহ মোরে তবে
কেন দূরে দূরে রহ ॥

প্রেম-দীপশিখা অন্তরে যদি জ্বলে—
কেন চাহ তারে লুকাইতে অঞ্চলে ;
পূজিবে না যদি সুন্দরে—
রূপ-অঞ্জলি কেন বহ ॥
ফুটিলে কুসুম-কলি
রহে না পাতার তলে,

কুণ্ঠা ভুলিয়া দখিনা বায়ের
কানে কানে কথা বলে।

যে-অমৃত-ধারা উথলে হৃদয় মাঝে,
রুধিয়া তাহারে রেখো না হৃদয়ে লাজে;
প্রাণ কাঁদে যার লাগি তারে কেন
বিরহ-দাহনে দহ॥

১৬৩

পিয়া পিয়া পিয়া—পাপিয়া পুকারে।
"চোখ গেল" বিরহিনী বধূর মনের কথা
কাঁদিয়া বেড়ায় বাদল-আঁধারে॥

প্রথম বিরহ অল্প-বয়সী—
ভুলি' গৃহকাজ রহে বাতায়নে বসি;
পাখির পিয়া-স্বর বুকে তার তোলে ঝড়,
অঞ্চলে আঁখি-জল মোছে বারে বারে॥

পরেনি বেশ, বাঁধেনি কেশ
ম্লান-মুখী দীপালিকা;
নীরব দেহে যেন শুকায়ে যায় ওগো
মালতীর মালিকা।

বনের বিহঙ্গ ছাড়ি' বিহগীরে
যায় না বিদেশে, রহে সুখ-নীড়ে;
বলো কেমনে, ওগো প্রেমের বিধাতা,
বিরহ-দাহ সহি হিয়ার মাঝারে॥

১৬৪

প্রিয়তম, এত প্রেম দিও না গো,
সহিতে পারি না আর।

তটিনীর বুকে ঝাঁপায়ে পড়িলে
কোন্ মহা-পারাবার ॥

তোমার প্রেমের বন্যায় বঁধু, হায় !
দুই কূল মোর ভাঙিয়া ভাসিয়া যায় ;
আমি নিজেরে হারাতে চাহিনি, বন্ধু,
দিতে চেয়েছিনু হায় ॥

তুমি চাহ বুঝি তুমি ছাড়া আর
রহিবে না মোর কেউ,
তাই কি পরাণে তুফান তোলে গো
এত রোদনের ঢেউ।

দেহ ও মনের সীমা ছাড়াইয়া মোরে
কোথায় নিয়ে যেতে চাও মোর হাত ধরে ;
বলো কোন্ মধুবনে শেষ হবে বঁধু
আমাদের অভিসার ॥

১৬৫

আমি দিনের সকল কাজের মাঝে তোমায় মনে পড়ে।
আমার কাজ ভুলে যাই, মন চলে যায় সুদূর দেশান্তরে ॥

তোমায় মনে পড়ে ॥
তুলসী-তলায় দীপ জ্বালিয়ে
দূর আকাশে রই তাকিয়ে,
সাঁঝের ঝরা-ফুলের মত অশ্রুবারি ঝরে ॥

আঁধার রাতে বাতায়নে একলা বসে থাকি,
চাঁদকে শুধায় তোমার কথা ঘুম-হারা মোর আঁখি।

প্রভাত-বেলা গভীর ব্যথায়
মন কেঁদে কয় তুমি কোথায়,
শূন্য লাগে এ তিন ভুবন প্রিয় তোমার তরে ॥

১৬৬

উতল হল শান্ত আকাশ
তোমার কলগীতে।
বাদলা-ধারা ঝরে বুঝি
তাই আজি নিশীথে॥

সুর যে তোমার নেশার মত
মনকে দোলায় অবিরত,
ফুলকে শেখায় ফুটিতে গো,
পাখিকে শিস দিতে॥

কেন তুমি গানের ছলে
বঁধু, বেড়াও কেঁদে—
তীরের চেয়েও সুর যে তোমার
প্রাণে অধিক বেঁধে।

তোমার সুরে সে কোন্ ব্যথা
দিল এত বিহ্বলতা?
আমি জানি সে বারতা,
তাই কাঁদি নিভৃতে॥

১৬৭

স্বপন-বিলাসে চাঁদ যবে হাসে
কুমুদ ফোটে দীঘিতে।
সেই আধো রাতে নয়ন-পাতে
ঘুম হয়ে এসো নিভৃতে॥

আমার তন্দ্রার মাঝে
যেন তব বাঁশরি বাজে,
মম দেহ-বীণায় ঝঙ্কার তুলিও
গভীর করুণ গীতে॥

যে বিফল-মালা শুকায় নিরালা
বাতায়ন-লগ্না,
পরশ করো এসে রহিব যবে আমি
ঘুম নিমগ্না।

শিশিরের মানিক দুলে
যখন হেনার-মুকুলে
হে সুদূর পথিক, এসো ভুলে
নীরব সে নিশীথে॥

১৬৮

কিশোরীরা : মোরা ফুটিয়াছি বঁধু
হের তোমারি আশায়।
১ম কিশোরী : আমি অনুরাগ-রাঙা,
আমি গোলাব-শাখায়॥

২য় কিশোরী : বন-কুন্তলে গরবী
আমি কানন-করবী
৩য় কিশোরী : আমি সরসী-কমলা
আমি ষোড়শী-কমলা
৪র্থ কিশোরী : আমি চম্পক খোঁপায়॥

নিভিল আলেয়া-আলো পথ চলিতে,
প্রজাপতিদ্বয় : তোমরা আসিলে কি গো মন ছলিতে।

কিশোরীরা : মোরা অনির্বাণ-শিখা দীপ্তিমতী,
আমরা কুসুম রাঙা আমরা জ্যোতি।
প্রজাপতিদ্বয় : আমরা চাহি না ক প্রেম,
চাহি মোহনী-মায়ায়॥

১৬৯

মহুয়া-বনে লো মধু খেতে, সই!
বাহিরে চাঁদ এল, ঘরে মোর চাঁদ কই॥

আমার নাচের সাথী কোথা পাইনে দেখা,
সরেনা পা ওলো নাচতে একা;
সে বিনে সখি লো আমি আমার নই॥

মিছে মাদলে তাল হানে মাদলিয়া,
সে কি গেল বিদেশ, মোরে না বলিয়া।

দূরে বাঁশি বাজে পলাশ পিয়াল বনে,
বুঝি ঐ বঁধু মোর যেন লাগে মনে ;
সে মোরে ভুলে নাচে কাহার সনে,
সে যে জানতো না, সজনী, কভু আমি বৈ॥

১৭০

বিধুর তব অধর–কোণে
মধুর হাসির রেখা
তারি লাগি ভিখারি–মন
ফেরে একা একা॥

সজাগ হয়ে আছে শ্রবণ
থির হয়েছে অধীর পবন
তুমি কথা কইবে কখন
গাইবে কুহু–কেকা॥

কখন তুমি চাইবে, প্রিয়া,
সলাজ অনুরাগে,
তিমির–তীরে অরুণ ঊষা
তারি আশায় জাগে।

কেমন করে চাঁদ যে টানে—
সিন্ধু জলের জোয়ার জানে,
দেখিতে, আমি আসি না কো
দিতে তোমায় দেখা॥

১৭১
দ্বৈত সঙ্গীত

স্ত্রী : বেদনা–বিহ্বল পাগল পুবালী পবনে
হায় নিদহারা তার আঁখি–তারা জাগে
আনমনা একা বাতায়নে॥

ঝরিছে অঝোর নভে বাদল,
হিয়া দুরুদুরু মনতল,
কাজলের বাঁধ নাহি মানে, হায় !
অশ্রুর নদী দু'নয়নে ॥

পুরুষ : মন চলে গেছে দূর-সুদূর
একা প্রিয় যথা ব্যথা-বিধুর ;
স্ত্রী : এ বাদল-রাতি কাটে বিনা সাথী,
তারি কথা শুধু পড়ে মনে ॥

১৭২

ফুলের বনে আজ বুঝি সই
রূপ-সায়রের ঢেউ লেগেছে।
ঘুমিয়ে-পড়া শ্যাম ভ্রমরা
গুনগুনিয়ে গান ধরেছে ॥

কুড়িয়ে পাওয়া কুসুম-দলে
ডুবিয়ে নিয়ে শিশির-জলে
পরতে ধরা আপন গলে মালা গেঁথেছে ॥

প্রেম-পিয়াসীর বুকের কাঁদন
জাগিয়ে দিল মলয় পবন,
পরাণ-বঁধুর কাজল নয়ন মনে জেগেছে ॥

১৭৩

বঁধুর চোখে জল—
আহা গোলাপ যূঁথীর পাঁপড়ি যেন শিশির-ছলছল !
আঁখি দুটি কাজল-কালো—
যেন বনের ছায়া-আলো,
কান্না-হাসির দোল্-দোলানো পৌষ-ফাগুনের ঢল ॥

বঁধুর চোখে জল—
আহা সুখের রাতের স্বপন যেন নেশায় টলমল ॥

চাউনি-ঝরা রূপ-দীপালি
ঘনায় মনে সুর-মিতালি,
ঘোর বরষায় ফাগুন যেন আলোয় ঝলমল ॥

১৭৪

পরদেশী মেঘ যাও রে ফিরে।
বলিও আমার পরদেশী রে ॥

সে দেশে যবে বাদল ঝরে
কাঁদে না কি প্রাণ একেলা ঘরে,
বিরহ-ব্যথা নাহি কি সেথা
বাজে না বাঁশি নদীর তীরে ॥

বাদল-রাতে ডাকিলে,
'পিয়া পিয়া পাপিয়া',
বেদনায় ভরে ওঠে না কি রে
কাহারো হিয়া ॥

ফোটে যবে ফুল, ওঠে যবে চাঁদ
জাগে না সেথা কি প্রাণে কোন সাধ,
দেয় না কেহ গুরু-গঞ্জনা
সে দেশে বুঝি কুলবতী রে ॥

১৭৫

পালিয়ে তুমি বেড়াবে কি
এমনি ভাবে।
এমনি করে জনম কি মোর
কেঁদেই যাবে ॥

ওগো চপল বনের পাখি,
ধরা তুমি দেবে না কি,—
অন্তরালে থাকি, শুধু
গান শোনাবে॥

কেন এলে নিঠুর তুমি
পথিক-হাওয়া,
তোমার স্বভাব ফুল ফুটিয়েই
ঝরিয়ে যাওয়া।

হে বিরহী, লীলা-চতুর,
অশ্রু কি মোর এতই মধুর !
কবে এসে আমার অভিমান ভাঙাবে॥

১৭৬

জাগো যুবতী ! আসে যুবরাজ।
অশোক-রাঙা বসনে সাজ॥

আসন পাতো বনে অঞ্চল আধো,
বন্দনা-গীতি-ভাষা বাধো-বাধো,
কপোলে লাজ॥

উছলি' ওঠে যৌবন আকুল তরঙ্গে,
খেলিছে অনঙ্গ নয়নে, বুকে, অঙ্গে
আকুল তরঙ্গে।

আগমনী-ছন্দ মেঘ-মৃদঙ্গে,
ভবন-শিখী গাহে বন-কুহু সঙ্গে।
বাজো হৃদি-অঙ্গনে বাঁশরি বাজো॥

১৭৭

আমি হব মাটির বুকে ফুল।
প্রভাত-বেলা হয়তো পাব
তোমার চরণ-মূল॥

ঠাঁই পাব গো তোমার থালায়,
রইব তোমার গলার মালায়,
সুগন্ধ মোর মিলবে হাওয়ায়
আনন্দ আকুল॥

আমারি রঙে রঙিন হবে বন,
পাখির কণ্ঠে আনব আমি
গানের হরষণ।

না-ই যদি নাও তোমার গলে—
তোমার পূজা-বেদীতলে
শুকাব গো, সে-ই হবে মোর
মরণ অতুল॥

১৭৮

একাদশীর চাঁদ রে ঐ
রাঙা মেঘের পাশে।
যেন কাহার ভাঙা কলস
আকাশ-গাঙে ভাসে॥
সেই কলসি হতে ধরার 'পরে
অঝোর ধারায় মধু ঝরে রে—
দলে দলে তাই কি তারার
মৌমাছিরা আসে॥

সেই মধু পিয়ে ঘুমের নেশায়
ঝিমায় নিশীথ রাতি,
বন-বধূ সেই মধু ধরে
ফুলের পাত্র পাতি।

সেই মধু এক বিন্দু পিয়ে
সিন্ধু ওঠে ঝিলমিলিয়ে রে—
সেই চাঁদেরই আধখানা কি
তোমার মুখে হাসে॥

১৭৯

কত রাতি পোহায় বিফলে, হায়!
জাগি' জাগি'।
সদা আঁখি-নীরে ভাসি
তারি লাগি'॥

সে কোথায় দূর-দেশে
হেসে মাতায় মধু রাতি
বুকে যে জ্বলে মরে
হেথা মোর আশা-বাতি,
ভুলেছে সে তবু কেন তারে মাগি॥

মলয়ে দোলে শাখী—
ভাবি সে বুঝি এল,
চকিতে নড়লে পাখি
চমকে উঠি যে লো।

চুপি কয় কানে কানে
বেহায়া ভোমরা গানে—
মিছে এ ফুল-শয়নে
মানিনী মঞ্জলি মনে,
অকারণে অকরুণে অনুরাগী॥

১৮০

ও কে চলিছে বনপথে একা
নূপুর পায়ে রণঝন ঝন্।
তারি চপল চরণ-আঘাতে
দুলিছে নদী, দোলে ফুলবন॥

ঝরে ঝর্ঝর গিরি-নির্ঝর তার ছন্দ চুরি করে,
'এল সুন্দর এল সুন্দর'—বাজে বনের মর্মরে।

গাহে পাখি মেলি আঁখি,
বলে, বনদেবী এলো না কি?
মধুর রঙ্গে অঙ্গ–ভঙ্গে আনে শিহরণ॥

সন্ধ্যায় ঝিল্লীর মঞ্জীর তার
ঝির–ঝির শির–শির তোলে ঝঙ্কার।
মধুভাষিণী, সুচারুহাসিনী, সে মায়া–হরিণী—
ফোটালো আঁধারে, মরি মরি,
অরুণ আলোর মঞ্জরি;
দুলিছে অলকে আঁখির পলকে
দোলন–চাঁপার নাচের মতন॥

১৮১

গুনগুনিয়ে ভ্রমর এল ফুলের পরাগ মেখে।
তোমার বনে ফুল ফুটেছে যায় কয়ে তাই ডেকে॥

তোমার ভ্রমর–দূতের কাছে
যে বারতা লুকিয়ে আছে
দখিন হাওয়ায় তারই আভাস
শুনি থেকে থেকে॥

দল মেলেছে তোমার মনের মুকুল এতদিনে
সেই কথাটি পাখিরা গায় বিজন বিপিনে।

তোমার ঘাটের ঢেউগুলি, হায়!
আমার ঘাটে দোল দিয়ে যায়;
লতার পাতায় জ্যোৎস্না দিয়ে
সেই কথা চাঁদ লেখে॥

১৮২

চৈতালী চাঁদিনী রাতে—
নব–মালতীর কলি মুকুল–নয়ন তুলি'
নিশি জাগে আমারি সাথে॥

পিয়াসী চকোরীর দিনগোনা ফুরালো,
শূন্য গগনের বক্ষ জুড়ালো;

দক্ষিণ-সমীরণ মাধবী কঙ্কণ
পরায়ে দিল বনভূমির হাতে ॥

চাঁদিনী তিথি এল,
আমারি চাঁদ কেন এলো না ;
বনের বুকের আঁধার গেল গো
মনের আঁধার গেল না।

এ মধু-নিশি মিলন-মালায়
কাঁটারই মত আমি বিঁধিয়া আছি, হায় !
সবারই আঁখিতে আলোর দেয়ালি,
অশ্রু আমারি নয়ন-পাতে ॥

১৮৩

চঞ্চল শ্যামল এলো গগনে।
নয়ন-পলকে বিজলি ঝলকে
চাঁচর অলক ওড়ে পবনে ॥

রিমঝিম বৃষ্টির নূপুর বোলে,
মৃদঙ্গ বাজে গুরু গম্ভীর রোলে ;
হেরি সেই নৃত্য ধরার চিত্ত
ডুবুডুবু বরিষার প্রেম-প্লাবনে ॥

উদাসী বেণু তার অশান্ত বায়ে
বাজে রহি রহি দূর বনছায়ে ;
আকাশে অনুরাগে ইন্দ্রধনু জাগে,
ভাবের বন্যা বহে বৃন্দাবনে ॥

১৮৪

পুবালী পবনে বাঁশি বাজে রহি' রহি'।
ভবনের বধূরে ডাকে বনের বিরহী ॥

রতন হিন্দোলা নীপ-ডালে বাঁধা,
দোলে দোলে, বলে যেন "রাধা রাধা"।

দুরু দুরু বুকে বাজে গুরু গুরু দেয়া,
কেয়াফুল আনে সোম-সুগন্ধ বহি'॥

চোখে মাখি' সজল কাজলের ছলনা
অভিসারিকার সাজে সাজে গোপ-ললনা।

বৃষ্টির টিপ ফেলে ননদীর নয়নে
কদম-কুঞ্জে চলে গোপন চরণে।
মিলন-বিরহ শোক তারি বুকে কাঁদে
"রাধা-শ্যাম রাধা-শ্যাম" কহি'॥

১৮৫

বন-ফুলের তুমি মঞ্জরি গো।
তোমার নেশায় পথিকভ্রমর
ব্যাকুল হল গুঞ্জরি' গো॥

তুমি মায়ালোকের নন্দিনী
নন্দনের আনন্দিনী,
তুমি ধূলির ধরার বন্দিনী—
যাও গহন কাননে সঞ্চরি' গো॥

মৃদু পরশ-কুণ্ঠিতা
তুমি বালিকা—
বল্লভ-ভীতা পল্লব-অবগুণ্ঠিতা মুকুলিকা।

তুমি প্রভাত-বেলায় মুঞ্জরি
লাজে সন্ধ্যায় যাও ঝরি'
তুমি অরণ্যা-বল্লরী শোভা
ফুল্ল পল্লী-সুন্দরী॥

১৮৬

বাজে মৃদঙ্গ বরষার ওই দিকে দিকে দিগন্তরে।
নীরস ধরা সরস হলো কাহার যাদু-মন্তরে॥

বন-ময়ূর আনন্দে
নাচে ধারা-প্রপাত ছন্দে,
ঝরঝর গিরি-নির্ঝর স্রোতে অন্তর-সুখে সন্তরে॥
শ্যামল প্রিয়-দরশা হল ধূসর পথ-প্রান্তর,
বন্ধু-মিলন-হরষা গাহে দাদুরী অবান্তর।

শ্রাবণ-প্লাবন বন্যাতে
আজি পুষ্পে পল্লবে বন মাতে,
এল শ্যাম-শোভন সুন্দর প্রাণ চঞ্চল করে মন্থরে॥

১৮৭

মাদল বাজিয়ে এল বাদলা মেঘ এলোমেলো,
মাতলা হাওয়া এল বনে।
ময়ূর ময়ূরী নাচে কালো জামের গাছে,
পিয়া পিয়া বন-পাপিয়া ডাকে আপন মনে॥

বেত-বনের আড়ালে ডাহুকী ডাকে,
ডাকে না এমন দিনে কেহ্ আমাকে ;
বেণীর বিনুনী খুলে খুলে পড়ে,
একলা মন টেকে না ঘরের কোণে॥

জঙ্গল পাহাড় কাঁপে বাজের আওয়াজে,
বুকের মাঝে তবু নূপুর বাজে ;
ঝিঁঝি তার ডাক ভুলে
রিমঝিম্-ঝিম্ বৃষ্টির বাজনা শোনে॥

১৮৮

মধুকর মঞ্জীর বাজে
বাজে গুন্ গুন্ মঞ্জুল গুঞ্জরণে।
মৃদুল দোদুল নৃত্যে
বন-বালিকা মাতে কুঞ্জবনে॥

বাজাইছে সমীর দখিনা
পল্লবে মর্মর বীণা,
বনভূমি ধ্যান–আসীনা
সাজিল রাঙা কিশলয়–বসনে॥

ধূলি–ধূসর প্রান্তর
পরেছিল গৈরিক সন্ন্যাসী–সাজ,
নব–দুর্বাদল শ্যাম হলো
আনন্দে আজ।

লতিকা–বিতানে ওঠে ডাকি'
মুহু মুহু ঘুমহারা পাখি,
নব নীল অঞ্জন মাখি'
উদাসী আকাশ হাসে চাঁদের সনে॥

১৮৯

মেঘের ডমরু ঘন বাজে।
বিজলি চমকায় আমার বনছায়
মনের ময়ূর যেন সাজে॥

সঘন শ্রাবণ গগন–তলে
রিমি ঝিমি ঝিম্ নবধারা–জলে
চরণ–ধ্বনি বাজায় কে সে—
নয়ন লুটায় তারি লাজে॥

ওড়ে গগন–তলে গানের বলাকা,
শিহরণ জাগে উজ্জ্বল–পাখা।
সুদূরের মেঘে অলকার পানে,
ভেসে চলে যায় শ্রাবণের গানে
কাহার ঠিকানা খুঁজিয়া বেড়ায়,
হৃদয়ে কার স্মৃতি রাজে॥

১৯০

যদিও দূরে থাক তবু যে ভুলি নাক,
তোমার এ ভালোবাসা দিল যে মোরে মান।
আমারি তরে নিতি গেয়েছ কত গীতি,
কত যে সুখ-স্মৃতি দিয়েছ বলিদান॥
আজিও বাণী তব বহিছে ফুলবাসে,
মরম-ব্যথা হয়ে সে আসে হৃদি-পাশে।

যে-ব্যথা অভিমানে পরশ তব আনে—
গভীর সে-বেদনা রাঙালো মন-প্রাণ॥

১৯১

বেলফুল এনে দাও,
চাই না বকুল।
চাই না হেনা, আনো
আমের মুকুল॥

গোলাপ বড় গরবী,
এনে দাও করবী,
চাইতে যূথী আনো
টগর, কি ভুল॥

কি হবে কেয়া, দেয়া
নাই গগনে;
আনো সন্ধ্যামালতী
গোধূলি-লগনে।

গিরি-মল্লিকা কই,
চামেলি পেয়েছে সই,
চাঁপা এনে দাও, নয়
বাঁধব না চুল॥

১৯২

তোমার আকাশে এসেছিনু, হায় !
আমি কলঙ্কী চাঁদ।
দূর হতে শুধু ভালোবেসেছিনু—
সে তো নহে অপরাধ ॥
তুমি তো জানিতে আমার হিয়ার তলে
কোন্ সে বেদনা কলঙ্ক হয়ে দোলে ;
মোর জোছনায় ডুবে গেল তাই
তোমার মনের বাঁধ ॥

কলঙ্ক মোর দেখেছে সবাই,
তুমি দেখেছিলে আলো—
মোর কলঙ্ক গৌরব মানি'
তাই বেসেছিলে ভালো।

অঙ্গে তোমার মোর ছাপ লাগে পাছে—
ভালবেসে তবু তোমারে চাহিনি কাছে !
অঙ্গার-সম জ্বলে আজো প্রাণে
অপূর্ণ মোর সাধ ॥

১৯৩

বিদেশিনী চিনি চিনি।
চিনি চিনি ঐ চরণের নূপুর রিনিঝিনি ॥

দ্বীপ জেগে ওঠে পাথার জলে
তোমার চরণ-ছন্দে,
নাচে গাঙচিল সিন্ধু-কপোত
তোমারি সুরে-আনন্দে,
মুকুতা কাঁদিছে হার হ'তে ওগো
তোমার বেণীর বন্ধে।
মলয়ে শুনেছি তোমার বলয়
চুড়ির রিনিঠিনি ॥

সাগর-সলিল হয়েছে সুনীল
তোমার তনুর বর্ণে,
তোমার আঁখির আলো ঝলমল
দেবদারু তরু-পর্ণে।
অস্ত-তপন হয়েছে রঙিন
তোমার হাসির স্বর্ণে
শঙ্খ-ধবল বেলাভূমে
খেলো সাগর-নটিনী॥

১৯৪

আজো মধুর বাঁশরি বাজে
গোধূলি-লগনে বুকের মাঝে॥

আজো মনে হয় সহসা কখন
জলে ভরা দুটি ডাগর নয়ন
ক্ষণিকের ভুলে সেই চাঁপা ফুলে
ফেলে ছুটে যাওয়া লাজে॥

হারানো দিন বুঝি আসিবে না ফিরে
মন কাঁদে তাই স্মৃতির তীরে

তবু মাঝে মাঝে আশা জাগে কেন
আমি ভুলিয়াছি ভোলেনি সে যেন
গোমতীর তীরে পাতার কুটিরে
সে আজো পথ চাহে সাঁঝে॥

১৯৫

ওরে বেভুল—
তবু ভাঙলো না তোর ভুল;
ভাঙলো যে তোর আশার প্রাসাদ
ভাঙলো প্রেম-পুতুল॥

দূর আকাশের সোনার চাঁদে
চাইলি পেতে বাহুর ফাঁদে,
আজ হতাশায় পরান কাঁদে
বৃথাই হস ব্যাকুল॥

সাধ করে তুই পরলি গলে
প্রেম-ফুলের মালা,
ফুল সে তো নয় কাঁটা শুধু—
দেয় সে দহন-জ্বালা।
আলেয়ার ঐ আলোর পিছে
ঘুরে ঘুরে মরলি মিছে,
সাগরে তুই ভাসলি নিজে—
কোথায় পাবি কূল॥

১৯৬

পাখি জাগে ফুল জাগে আজি রাতে।
বুঝি আসিবে তুমি শেষ খেয়াতে॥

কাজ সারা হয়ে গেছে মোর,
গেঁথেছি বকুল ফুলডোর;
কুসুমিত উপবন তলে
আমি বসে আছি ভরা জোছনাতে॥

ওপারে উঠেছে তারা
এপারে প্রদীপ জ্বলে,
যেন তোমার আঁখির সাথে
আজি মোর আঁখি কথা বলে।
গান গেয়ে প্রিয় তব লাগি'
প্রহরে প্রহরে আমি জাগি;
নয়নে আমার নিঁদ নাহি
প্রিয় তোমার মধুর ভাবনাতে॥

১৯৭

মোর নিশীথের চাঁদ ঘন মেঘে ঢাকিয়াছে।
আর দূরে থাকিও না, এসো এসো আরো কাছে॥

(মোর) ভবন-কপোতগুলি উড়িয়া গিয়াছে ভয়ে,
কাঁপিছে মালতী-লতা মুকুল-বক্ষে লয়ে ;
(মোর) আশার প্রদীপ-শিখা হের ঝড়ে নিভিয়াছে॥

হের ঘোর ঘনঘটা সব লাজ দিল ঢেকে
বিজলি তোমারে হেরি চমকায় থেকে থেকে,

বাহিরে আলেয়া ডাকে ধর হাত ধর মম,
আঁধারে দেখাও পথ তুমি ধ্রুবতারা-সম ;
ঐ শোন গো ফটিক-জল তৃষ্ণার বারি যাচে,
আজ দূরে থাকিওনা এস এস আরো কাছে।

১৯৮

হে মায়াবী, বলে যাও।
কেন দখিনা হাওয়ার মত
ফুল ফুটিয়ে চলে যাও॥

কেন ফাল্গুন এনে আনো বৈশাখী ঝড়,
কেন মন নিয়ে মনে রাখ না মনোহর ;
কেন মালা গেঁথে বুকে তুলে পায়ে দলে যাও॥
কেন সাগরের তৃষ্ণা এনে দাও না কো জল,
তুমি প্রেমময়, না কি মায়া-মরীচিকা ছল ;
কেন হৃদয়-আকাশে এনে গোধূলি-লগন
অসীম শূন্যে গলে যাও॥

১৯৯

ওগো তারি তরে মন কাঁদে হায়, যায় না যারে পাওয়া।
ফুল ফোটে না যে কাননে, কাঁদে দখিন হাওয়া॥

যে মায়া-মৃগ পালিয়ে বেড়ায়
কেন এ মন তার পিছে ধায়,
যে দলে গেল পায়ে আমায় কেন তাহারি পথ-চাওয়া॥

যে আমারে ভুলে হলো সুখী, যায় না তারে ভোলা,
যে ফিরিবে না আর, তারি তরে রাখি দুয়ার খোলা।

মৌন পাষাণ যে দেবতা
হেলার ছলে কয় না কথা,—
তারি দেউল-দ্বারে কেন বন্দনা-গান গাওয়া॥

২০০

কে এলে গো চপল পায়ে।
নতুন পাতার নূপুর বাজে দখিন বায়ে॥

ছায়া-ঢাকা আমের ডালে চপল আঁখি—
উঠলো ডাকি' বনের পাখি,
নতুন চাঁদের জোছনা মাখি',
সোনাল শাখায় দোল দোলায়॥

সুনীল তোমার ডাগর চোখের দৃষ্টি পিয়ে
সাগর দোলে, আকাশ ওঠে ঝিল্‌মিলিয়ে।
পিয়াল বনে উঠলো বাজি' তোমার বেণু,
ছড়ায় পথে কৃষ্ণচূড়ার পরাগ-রেণু;
ময়ূর-পাখা বুলিয়ে চোখে
কে দিলে গো ঘুম ভাঙায়ে॥

২০১

সন্ধ্যার গোধূলি-রঙে নাহিয়া
কে এলে কাহারে চাহিয়া॥

মধুর লগনে অপরূপ বেশে
কেন দাঁড়ালে মম দ্বারে এসে,

দিনের শেষে ঝরা ফুলের দেশে
আসিলে চাঁদের তরী বাহিয়া ॥

অস্ত-রবির রঙ লয়ে কোন্ যাদুকর
নিরমিল তোমার মূরতি মনোহর,—
মনের পদ্ম-বনে বাণী মধুকর
সুন্দর ! সুন্দর !—ওঠে গাহিয়া ॥

২০২

দিয়ে গেল দোল গোপনে এ কোন্ ক্ষ্যাপা হাওয়া।
মরমের রঙ-মহলে কার এ গজল গাওয়া ॥

চাহিনি ছল করে সই প্রেম-খেয়ালির মনকে ভোলাতে,
কে চাহে বর্ষা-রাতে ফুল-ফাল্গুনের দোলনা দোলাতে ;
নহে লো মোর গগনে চাঁদ-বিরহীর রোজ আসা-যাওয়া—
যে আমায় চায় না মনে, চাই না লো তার মুখপানে চাওয়া ॥

মিছে কি দুল পরিনু মঞ্জরি ফুল কুঞ্জে তুলিয়া,
o o o o
নহে লো মোর এ মিছে অশ্রুজলে সাধ করে নাওয়া।
যে গেল ভুলবে বলে আজকে তারে বুক ভরে পাওয়া ॥

২০৩

ধূলি-পিঙ্গল জটাজুট মেলে
আমার প্রলয়-সুন্দর এলে ॥

পথে-পথে ঝরা কুসুম ছড়ায়ে
রিক্ত শাখায় কিশলয় জড়ায়ে
গৈরিক উত্তরী গগনে উড়ায়ে
রুদ্ধ ভবনের দুয়ার ঠেলে ॥

বৈশাখী পূর্ণিমা চাঁদের তিলক
তোমারে পরাব,
মোর অঞ্চল দিয়ে তব জটা নিঙাড়িয়া
সুরধ্বনি ঝরাব।
যে-মালা নিলে না আমার ফাগুনে,
জ্বালাব তারে তব রূপের আগুনে ;
মরণ দিয়া তব চরণ জড়াব—
হে মোর উদাসীন, যেও না ফেলে॥

২০৪

[গজল—কাহারবা]

তোমার কুসুম-বনে আমি আসিয়াছি ভুলে।
তবু মুখপানে প্রিয় চাহ চাহ মুখ তুলে॥

দেখি সেদিনের সম
ভুলে যাওয়া স্মৃতি মম
তব ও-নয়নে আজও ওঠে কি না দুলে॥

আসিয়াছি, ভুল করে
জানি, ভুলেছ তুমিও ;
ক্ষণেকের তরে তবু
এ-ভুল ভেঙো না, প্রিয় !
তীর্থে এসেছি মম দেবীর দেউলে॥
তোমার মাধবী-রাতে
আসিনি আমি কাঁদাতে,
কাঁদিতে এসেছি একা বিদায়-নদীর কূলে॥

২০৫

বুনো পাখি, বুনো পাখি
চোখে তোর নেই কেন ঘুম ?
ঘুমায় তেপান্তর আকাশ সাগর
বন নিঝঝুম॥
চোখে তোর নেই কেন ঘুম ?

জোছ্না-আঁচল জড়াইয়া গায়
শ্রান্ত ধরণী অঘোরে ঘুমায়—
ঘুমায় ভ্রমর লতার কোলে
মাখিয়া পরাগ-কুম্‌কুম॥
চোখে তোর নেই কেন ঘুম?

আমিও জাগি তোরই মত পাখি
বিরহ শয়নে-ভবনে একাকী,
হুতাশ পবনে ছড়ায় সুরভি
বিফল মালার কুসুম॥
চোখে তোর নেই কেন ঘুম?

২০৬

নিতি নিতি মোরে ডাকে সে স্বপনে
নিরাশার আলো জ্বালিয়া গোপনে॥

জানি না মায়াবিনী কি মায়া জানে,
কেবলি বাহিরে পরান টানে,
ঘুরে ঘুরে মরি আঁধার গহনে॥
শত পথিকে ও রূপে ছল হানে,
অপরূপ শত রূপে শত গানে।

পথে পথে বাজে তাহারি বাঁশি,
সে সুরে নিখিল-মন উদাসী;
দহে যাদুকরী বিধুর দহনে॥

২০৭

জনম জনম তব তরে কাঁদিব।
যত হানিবে হেলা ততই সাধিব॥

তোমারি নাম গাহি'
তোমারি প্রেম চাহি'
ফিরে ফিরে আমি তব চরণে আসিব॥

জানি জানি বঁধু, চাহে যে তোমারে
ভাসে সে চিরদিন নিরাশা-পাথারে।
তবু জানি, হে স্বামী!
কোন্ সে লোকে আমি
তোমারে পাব বুকে বাহুতে বাঁধিব॥

২০৮

শ্রান্ত বাঁশরি সকরুণ সুরে কাঁদে যবে
কে এলে প্রদীপ লয়ে আঁধার ঘরে নীরবে॥

গোধূলি-লগনে এসে
দাঁড়ালে বঁধুর বেশে
জীবনেরই বেলা শেষে হে প্রিয় এলে কি তবে॥

যে হাতের মালা তব চেয়েছিনু, প্রিয়তম।
রাখ সেই হাতখানি তপ্ত ললাটে মম,
তোমার পরশে মোর, মরণ মধুর হবে॥

২০৯

জানি জানি তার সে আঁখি কি জাদু জানে।
যায় কি ভোলা হায়, যে জ্বালা দিয়েছে প্রাণে॥

জানি গো ডুবলো ধরা কোন্ কুহকীর রূপ-সায়রে
কে দেয় মধুর ব্যথা বিঁধিয়া নিঠুর শরে।
কে এ মদিরা পিয়া
মাতালে পিক্-পাপিয়া
কাঁটারই বুকে এ কে ফুলেরই স্বপন আনে॥

আবার এ ছিন্ন তারে কোন্ মায়াবীর সুর বাজে
লাজে বুক শিউরে ওঠে হেরিয়া কোন্ নিলাজে।
কে চিকুর চমকে দিলে
আমার এ নভোনীলে
কে এ মরুর আঁখি ভাসালে শাওন-বানে॥

২১০

হে অশান্তি মোর এস এস।
তব প্রবল প্রেমের লাগি' ভবন হতে
বৈরাগিনী বেশে এসেছি বাহির পথে॥

কুণ্ঠা ভুলায়ে দাও, খোলো গুণ্ঠন
দস্যু–সম মোরে করো লুণ্ঠন,
তৃণ–সম মোরে ভাসাইয়া লয়ে যাও
কূল–ভাঙা বিপুল বন্যা–স্রোতে॥

নদীরে যেমন করে টানে পারাবার,
তেমনি মরণ–টানে আমারে টানো, হে বন্ধু আমার!

প্রলয়–মেঘের বুকে বিজলি–সম
তোমারে জড়ায়ে রবো, হে প্রিয়তম!
হবে শুভদৃষ্টি তোমায় আমায়
মরণ–হানা অশনির আলোতে॥

২১১

তুমি আমায় যবে জাগাও গুণী তোমার উদার সঙ্গীতে,
মোর হাত দু'টি হয় লীলায়িত নমস্কারের ভঙ্গিতে॥

সিন্ধু–জলের জোয়ার–সম
ছন্দ নামে অঙ্গে মম,
রূপ হল মোর নিরুপম তোমার প্রেমের অমৃতে॥

আমার আঁখির পল্লবদল উদাস অশ্রুভারে,
ভোরের করুণ তারার মতো কাঁপে বারে বারে।

আনন্দে ধীর বসুন্ধরা
হলো চপল নৃত্যপরা
ঝরে রঙের পাগল ঝোরা তোমার চরণ রঙ্গিতে॥

২১২

ওকে নাচের ঠমকে দাঁড়াল থমকে
সহসা চমকে পথে।
যেন তার নাম ধরে ডাকিল কে
বাঁশের বাঁশিতে মাঠের ওপার হতে॥

তার হঠাৎ থেমে যাওয়া দেহ দোদুল্
নাচের তালে যেন ছন্দের ভুল,
সে রহে চাহি' অনিমেষে
পটে-আঁকা ছবির তুল !
গেছে হারায়ে সে যেন কোন্ জগতে॥

তার ঘুম-জড়িত চোখে জাগাল
কী নূতন ঘোর
অকরুণ বাঁশীর কিশোর ;
উদাস মূরতি প্রভাতী রাগিণী কাননে যেন
এল নামিয়া অরুণ-কিরণ-রথে॥

২১৩

এস প্রিয়তম এস প্রাণে।
এস সুদূর মোর অভিমানে॥

এস কম্পিত হৃদয়ের ছন্দে
এস বিরহের বিধুর আনন্দে,
এস বেদনার চন্দন-গন্ধে
মম পূজার বন্দনা-গানে॥

সুখ-স্বপন হয়ে এস ঘুমে
এস হৃদয়েশ মালার কুসুমে
এস তপনের রূপে আঁখি-চুমে
ঘুম ভাঙায়ো নিশি-অবসানে॥

এস মাধবী-কাঁকন হয়ে হাতে
এস কাজল হয়ে আঁখি-পাতে
এস পূর্ণিমা-চাঁদ হয়ে রাতে
এস ফুল-চোর মালতী-বিতানে॥

২১৪

সপ্ত-সিন্ধু ভরি' গীত-লহরী
হিল্লোলি' হিল্লোলি ওঠে দিবা-বিভাবরী॥

এস এস বিরহী
আমি এনেছি বহি'
সেই সিন্ধুতে সাঁতরিতে সোনার তরী॥

কেন তীরের বালুকা লয়ে খেলিছ খেলা,
গাহন করিবে এস ফুরায় বেলা
হের ফুরায় বেলা।
বল বল সে কবে
অভিষেক হবে
হে বিজয়ী!
শুকাইল তীর্থ-জলের গাগরি॥

২১৫

মধুর রসে উঠলো ভরে মোর বিরহের দিনগুলি।
হেলায়-খেলায় দিবস ফুরায় অতীত-স্মৃতির ফুল তুলি'॥

ক্ষণেকের তরে পেয়েছিনু কাছে
সেই আনন্দে প্রাণ ভরে আছে,
আমার মনের চাঁপা গাছে গাহিছে গানের বুলবুলি॥

পাইনি বলে নিত্য জাগে পরানে পাওয়ার আশা,
বাসি হল না কো মোর ফুলহার আমার এ ভালবাসা।

—(গানটি অসম্পূর্ণ মনে হয়। মূল পাণ্ডুলিপিতে এ পর্যন্তই আছে।)

২১৬

বিদেশী তরী এল কোথা হতে
প্রভাত ঘাটে আলোর স্রোতে॥

অসীম বিরহ–রাতের শেষে
কে এল কিশোর–নাইয়ার বেশে।
বাঁশরি বাজায়ে দুয়ারে এসে
ডাকে হেসে হেসে অকূল–পথে॥

অঙ্গনে এলো শুভদিনের আলো,
বুঝি মোর নিরাশার শর্বরী গো পোহালো।

আশাবরী সুরে বেণুকা বাজে,
চির–চাওয়া এলো অভিসার–সাজে
পূর্বাচলের ঘাটে অরুণ–রথে॥

২১৭

প্রিয় কোথায় তুমি আছ কোন্ গহনে।
কোন্ ধ্রুবলোকে কোন্ দূর গগনে॥
খোঁজে কানন তোমায় মেলি' কুসুম আঁখি,
"তুমি কোথায়" বলি ডাকে বনের পাখি।
আছ ঠাকুর হয়ে কোন্ দেবালয়ে
কোন্ শ্রাবণ–মেঘে দখিনা পবনে॥

সিন্ধু–বুকে মুখ লুকায়ে নদী
"তুমি কোথায়" বলি কাঁদে নিরবধি।

জ্বালি' তারার বাতি
খোঁজে আঁধার রাতি,
তোমারে খুঁজিয়া নিভিল জ্যোতি মোর নয়নে॥

২১৮

চঞ্চল ঝর্ণা সম হে প্রিয়তম,
আসিলে মোর জীবনে।

নীরব মনের উপবন মর্মরি' উঠিল
অধীর হরষণে॥

যে মুকুল ঘুমায়ে ছিল পত্রপুটে
অনুরাগে ফুল হয়ে উঠিল ফুটে,
তনুর কূলে কূলে ছন্দ উঠিল দুলে
আকুল শিহরণে॥

অলকানন্দা হতে রসের ধারা তুমি আনিলে বহি',
অশান্ত সুরে একি গাহিলে গান হে দূর বিরহী !

মায়ামৃগ তুমি হেসে চলে যাও,
তব কূলে যে কাঁদে তারে ফিরে নাহি চাও।
কত বনভূমিরে আঁখি-নীরে ভাসাও
হে উদাসীন আনমনে॥

২১৯

আমি তব দ্বারে প্রেম-ভিখারি।
নয়নের অনুরাগ-দৃষ্টির সাথে চাহি নয়ন-বারি॥
তব পুষ্পিত তনুতে, হৃদয়-কমলে
গোপনে যে প্রেম-মধু উথলে
তোমার কাছে সেই অমৃত যাচে
তৃষিত এ পথচারী॥

জনমে জনমে আমি রূপ ধরে আসি গো
তোমারই বিরহে কাঁদিতে,
রাহুর মতো আমি আসি না বাহু-পাশে বাঁধিতে।

আমি ফুলের মধু চাই, ছিঁড়ি না ফুল গো,
দূরে রহি' গাহি গান বন-বুলবুল গো,
মনোবনে আছে তব নন্দন-পারিজাত
আমি তারি পূজারী॥

২২০

বেণুকার বনে কাঁদে বাতাস বিধুর—
সে আমারি গান, প্রিয় সে আমারি সুর॥

হলুদ চাঁপার ডালে
সহসা নিশীথ কালে
ডেকে ওঠে সাথীহারা পাখি ব্যথাতুর॥

নদীর ভাটির টানে শ্রান্ত সাঁঝে
অশ্রু—জড়িত মোর সুর যে বাজে।

যে সুরের আভাসে
আঁখি পুরে জল আসে,
মনে পড়ে চলে–যাওয়া প্রিয় রে সুদূর॥

২২১

কোন্ সে গিরির অন্ধকারায়
ঝর্ণা তুমি লুকিয়েছিলে?
কার সে বাঁশির করুণ সুরে
বেরিয়ে এলে এই নিখিলে॥
কোন্ অসীমের আভাস পেয়ে
কোন্ সাগরে চললে ধেয়ে,
শিউলি ফুলের ঝরা মালা
উদ্দেশে তার ভাসিয়ে দিলে॥

চন্দনিত তোমার জলে
চূর্ণ চাঁদের মানিক ঝলে,
তোমার স্রোতের ঝিলিক লাগে
দূর গগনের গহন নীলে॥

২২২

সই পলাশ বনে রঙ ছড়ালো কে?
রঙে রঙীন মানুষটিরে
কাছে ডেকে দে লো॥

সে ফাগুন জাগায়, আগুন লাগায়,
স্বপন ভাঙায়, হৃদয় রাঙায় রে;
তারে ধরতে গেলে পালিয়ে সে যায়—
রঙ ছুঁড়ে চোখে॥
সে ভোরের বেলা ভ্রমর হয়ে
পদ্মবনে কাঁদে,
তার বাঁকা ধনুক যায় দেখা ঐ
সাঝ আকাশের চাঁদে।

সে গভীর রাতে আবীর হাতে
রঙ খেলে ফুলকলির সাথে রে,
তার রঙিন সিঁথি দেখি
প্রজাপতির পালকে লো॥

২২৩

ম্লান আলোকে ফুটলি কেন
গোলক-চাঁপার ফুল।
ভূষণহীনা বনদেবী,
কার হবি তুই দুল॥

হার হবি কার কবরীতে—
সন্ধ্যারাণী দূর নিভৃতে
বসে আছে অভিমানে
ছড়িয়ে এলোচুল॥

মাটির ধরার ফুলদানিতে
তোর হবে কি ঠাঁই,
আদর কে আর করবে তোরে—
বসন্ত যে নাই।

গোলক-চাঁপা খুঁজিস্ কারে—
কোন্ গোলকের দেবতারে?
সে দেবতা নাই রে হেথা—
শূন্য যে আজি গোকুল॥

২২৪

মালতী মঞ্জরি ফুটিবে যবে
অলস বেলায়—
প্রিয় হে প্রিয়, মোরে স্মরিও
সেই সন্ধ্যায়॥

ঝরা পল্লবে ফেলি দীরঘ শ্বাস
কাঁদিয়া ফিরিবে যবে চৈতী বাতাস,
নাগকেশরের ঝরা কেশর দলে
খুঁজিও আমায়॥

মল্লিকা মুকুলের প্রথম সুবাস
বিরহী-পরান যবে করিবে উদাস—
পিয়াল নদীর কূলে কাঁদিয়া বাঁশি
ডাকিবে পিয়ায়॥

২২৫

মঞ্জু রাতের মঞ্জরি আমি গো
বনের ধারের বনফুল।
কুঞ্জ-বীথির বাঁশরি আমি গো
রূপসীর কানের দুল॥

কান্তার সরসীর আমি যে কমল,
ঝর্ণাধারা আমি, আমি চঞ্চল
গুল্‌বাগের বুলবুল॥

প্রখর তাপে আমি যে বাদল,
ছলছল নয়নের আমি সে কাজল।

আমি শুকতারা জাগি একাকী,
মরুর বুকে আমি ঝড়ের পাখি,
আমি কূলহারা নদীকূল॥

২২৬

ফাগুন এলো বুঝি মহুয়া-মালা গলে।
চরণ-রেখা তার পিয়াল-তরুতলে॥

পরাগ-রাঙা চেলি
অশোক দিল মেলি',
শুকালো ব্যথা-বারি মুকুল-আঁখি-কোলে॥

ধেয়ানে হিম-ঋতু জপেছে যারে নিতি
আজিকে বনপুরে বাজিল তারি গীতি।

লইয়া ফুল-ডালি
বিরহ-শিখা জ্বালি'
না জানি কোন্ সুরে কোথা সে যাবে চলে॥

২২৭

আধুনিক—দাদ্‌রা

আজ শ্রাবণের লঘু মেঘের সাথে
মন চলে মোর ভেসে,
রেবা নদীর বিজন তীরে মালবিকার দেশে॥

মোর মন ভেসে যায় অলস হাওয়ায়
হাল্কা-পাখা মরালী-প্রায়,
বিরহিনী কাঁদে যথায়
একলা এলোকেশে॥

কভু মেঘের পানে কভু নদীর পানে চেয়ে
লুকিয়ে যথা নয়ন মোছে গাঁয়ের কালো মেয়ে,
একলা বধূ বসে থাকে যথায় বাতায়নে
বাদল দিনের শেষে॥

২২৮
আধুনিক

মম বেদনার শেষ হ'ল কি এতদিনে।
বুঝি তাই এলে প্রিয় পথ চিনে॥
বরষার নবধারা-ছন্দে
এলে বন-মুকুলের গন্ধে,
তব চরণ-ছোঁওয়ায়
আজি বাজিল কি সুর
মোর মনোবীণে॥

কত যুগ ধরি' চেয়ে আছি পথ
আজি কি হ'ল সফল।
তাই সহসা কানন মোর মৌন বিহগ-তানে
মুখর চপল।

তৃষিত চাতক-হিয়া মম
কাঁদে হায়! "এসো প্রিয়তম!"
হের শূন্য এ অন্তর-মন্দির মোর তোমা বিনে॥

২২৯

আকাশে আজ ছড়িয়ে দিলাম, প্রিয়।
আমার কথার ফুল গো,
আমার গানের মালা গো—
কুড়িয়ে তুমি নিও॥

আমার সুরের ইন্দ্রধনু
রচে আমার ক্ষণিক তনু,
জড়িয়ে আছে সেই রঙে মোর
অনুরাগ অমিয়॥

আমার আঁখি-পাতায় নাই দেখিলে
আমার আঁখিজল,
আমার কণ্ঠের সুর অশ্রুভারে
করে টলমল।

আমার হৃদয়-পদ্ম ঘিরে
কথার ভ্রমর কেঁদে ফিরে,
সেই ভ্রমরের কাছে আমার
মনের মধু পিও॥

২৩০

কেন আজ নতুন করে
পরান তোমারে পাইতে চায়।
এত কাছে আছ তবু কেন বুকে—
অসহ বিরহ, হায়।

রূপ-সরসীতে ফুটালে পদ্মিনী, বঁধু!
দিলে সুরভিত রসঘন মধু,
তবু শীর্ণা তনু কেন চায় গোধূলি-রাঙা শাড়ি,
আলতা পরিতে কেন সাধ যায়॥

বনশ্রী কাঁদে কণ্ঠ জড়ায়ে
বলে, ওলো নিরাভরণা—
অথই জলে কাঁদে প্রেম-ঘন কমল
খোঁপায় কেন পর না!
কেন তব সুরের কপোতী
মুক্তামালা চুড়ি-কাঁকন পরায়॥

২৩১

আবার ভালবাসার সাধ জাগে।
সেই পুরাতন চাঁদ আমার চোখে আজ
নূতন লাগে॥

যে ফুল দলিয়াছি নিঠুর পায়ে
সাধ যায় ধরি তারে বক্ষে জড়ায়ে।
উদাসীন হিয়া, হায়! রেঙে ওঠে অবেলায়
সোনার গোধূলি-রাগে॥

আবার ফাগুন-সমীর কেন বহে?
আমার ভুবন ভরি' কেঁদে ওঠে বাঁশরি
অসীম বিরহে।
তপোবনের বুকে ঝর্ণার সম
কে এলে সহসা, হে প্রিয়তম!
মাথুরের গোকুল সহসা রাঙাইলে
রাসের কুঙ্কুম-ফাগে॥

২৩২

আমি প্রভাতী তারা পূর্বাচলে।
আশা-প্রদীপ আমি
নিশির শীশমহলে॥

রাতের কপোলে আমি
ছলছল অশ্রুর জল,
আমি ধরণীতে হিম-কণা
টলমল নব দূর্বাদলে॥

নব অরুণোদয়ের আমি ইঙ্গিত,
বিহগ-কণ্ঠে আমি
জাগাই শুভ-সঙ্গীত।

আমি কনক-কদম
তিমির নীপ শাখায়
আমি মধ্যমণি মালিকায়,
শ্যাম গগন-গলে॥

২৩৩

আজকে গানের বান এসেছে আমার মনে।
যাক্ না নিশি গানে গানে জাগরণে॥

মন ছিল মোর পাতায় ছাওয়া,
হঠাৎ এল দখিন হাওয়া;
পাতার কোলে কথার কুঁড়ি
ফুটলো অধীর হরষণে॥

সেই কথারই মুকুলগুলি
সুরের সুতায় গেঁথে গেঁথে
কারে যেন চাই পরাতে
কাহারে চাই কাছে পেতে।

জানি না সে কোন্ বিজনে
নিশীথ জেগে এ গান শোনে ;
না-দেখা তার চোখের চাওয়া
আবেশ জাগায় মোর নয়নে॥

২৩৪

ও মেঘের দেশের মেয়ে !
কোথা হতে এলি রে তুই
কেয়া পাতার খেয়া বেয়ে॥

ধারা-নূপুর রুনঝুনিয়ে
কানে কদম দুল দুলিয়ে
ফুল কুড়াতে এলি কি তুই
মোর কাননে ধেয়ে॥

পুব-হাওয়াতে উড়ছে আঁচল নীলাম্বরী—
তুই বুঝি ভাই রূপকাহিনীর মেঘলা-পরী !
তোর কণ্ঠে বাজে যে গান মধুর
তারি তালে নাচে ময়ূর ;
মেঘ-মাদলের সাথে ওঠে
আমারও মন গেয়ে॥

২৩৫

ওগো দেবতা তোমার পায়ে
গিয়াছিনু ফুল দিতে।
মোর মন চুরি করে নিলে
কেন তুমি অলখিতে॥

আজ ফুল দিতে শ্রীচরণে
মম হাত কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে ;
কেন প্রণাম করিতে গিয়া—প্রিয়
সাধ জাগে পরশিতে ॥

তুমি দেবতা যে মন্দিরে—
কাছে এলে যাই ভুলে ;
বঁধু আমি দীনা দেবদাসী
কেন তুমি মোরে ছুঁলে।

আমি হাতে আনি হেম-ঝারি,
তুমি কেন চাহ আঁখি-বারি ;
আমি পূজা-অঞ্জলি আনি,
তুমি কেন চাহ মালা নিতে ॥

২৩৬

তুমি কি দখিনা পবন
দুলে ওঠে দেহলতা,
ফুলে ফুলে ফুল্ল হয়ে ওঠে মন ॥

অন্তর সৌরভে শিহরে,
কথার কোয়েলিয়া কুহরে ;
তনু অনুরঞ্জিত করে গো
প্রীতির পলাশ-রঙ্গন ॥

কী যেন মধু জাগে হিয়াতে—
চাহি যেন সেই মধু
কোন্ চাঁদে পিয়াতে।

ফুটাইয়া ফুল কোথা চলে যাও,
হুতাশ নিঃশ্বাসে কী বলে যাও—
মধু পান করি না'ক
রচে যাই শুধু মধু-বন ॥

২৩৭

চৈতী রাতের উদাস হাওয়ায়
পরান আমার কাঁদে গো।
বিদায়-নেওয়া প্রিয়ারে তাই
বাহুর মালা বাঁধে গো॥

ধরার বুকে ধরিয়ে আগুন
পালিয়ে গেছে চতুর ফাগুন,
ফুল ঝরায়ে ফুলবাগিচায়
তাকায় করুণ-ছাঁদে গো॥

জোছনা ঝরে মরুর মাঝে
চোখের জলের ধারা,
কেমন করে বিদায় দেবো
তাই ভেবে হই সারা।

বাহুর বাঁধন এড়িয়ে যাবে,
একটু পরেই বিদায় লবে,
ভুবন আমার শূন্য হবে
গভীর অবসাদে গো॥

২৩৮

তোমার বিনা-তারের গীতি
বাজে আমার বীণা-তারে।
রইলো তোমার ছন্দ-গাথা
গাঁথা আমার কণ্ঠহারে॥

কী কহিতে চাও হে গুণী,
আমি জানি, আমি শুনি;
কান পেতে রই তারার সাথে
তাই তো সুদূর গগন-পারে॥

পালিয়ে বেড়াও উদাস হাওয়া
গোপন কথার ফুল ফুটিয়ে,

আমি তারই মালা গেঁথে
লুকিয়ে রাখি বক্ষে নিয়ে।

হয়তো তোমার কথার মালা
কাঁটার মত করবে জ্বালা,
সেই জ্বালাতেই জ্বলবে আমার
প্রেমের শিখা অন্ধকারে॥

২৩৯

বিকাল বেলার ভুঁইচাঁপা গো
সকাল বেলার যুঁই।
কারে কোথায় দেবো আসন
তাই ভাবি নিতুই॥

ফুলদানিতে রাখব কারে,
কারে গাঁথি কণ্ঠ-হারে;
কারে দেব দেবতারে
কারে বুকে থুই॥

সমান অভিমানী তোরা,
সমান সুকোমল;
চাঁপা আমার চোখের আলো,
যুঁই চোখের জল।
বর্ষা-মুখর শ্রাবণ-প্রাতে
কাঁদি আমি যূথীর সাথে,
চাঁপায় চাহি চৈতী রাতে—
প্রিয় আমার দুই-ই॥

২৪০

বেদনার পারাবার করে হাহাকার
তোমার আমার মাঝে, হে প্রিয়তম!
অনন্ত এই বিরহের নাহি পার,
হবে না মিলন আর এ জনম॥

এই বুঝি হায় বিধির লিখন—
দু'কূলে থাকি কাঁদিব দুজন
রাতের চখা-চখির সম॥

নিশুতি রাতে তারার চোখে,
দলিত ফুলে, ঝরা-কোরকে
খুঁজিও আমায়—ফিরিয়া যদি
আসি এ ঘরে, প্রিয় মম॥

২৪১

ভুলে যেও, ভুলে যেও,
সেদিন যদি পড়ে আমায় মনে
যবে চৈতী বাতাস উদাস হয়ে
ফিরবে বকুল বনে॥

তোমার মুখের জ্যোৎস্না নিয়ে
উঠবে গো চাঁদ ঝিলমিলিয়ে,
হেনার সুবাস ফেলবে নিশ্বাস
তোমার বাতায়নে॥

শুনবে যেন অনেক দূরে
ক্লান্ত বাঁশির করুণ সুরে—
বিদায় নেওয়া কোন্ বিরহী
কাঁদে নিরজনে॥

২৪২

নয়নে তোমার ভীরু মাধুরীর মায়া
বন-মৃগী সম উঠিছে চমকি'
হেরিয়া আপন ছায়া॥

প্রাতে উষার প্রায়
রেঙে ওঠো লজ্জায়,

এলায়িত লতিকায়
ভঙ্গুর তব কায়া॥

দৃষ্টিতে তব আরতি দীপের দ্যুতি,
তুমি নিবেদিতা সন্ধ্যা-পূজা-আহুতি।

ভূমি-অবলুণ্ঠিতা
বনলতা কুণ্ঠিতা,
কোলাহল-শঙ্কিতা
যেন গো তাপস-জায়া॥

২৪৩

নীপ-শাখে বাঁধো ঝুলনিয়া,
কাজল-নয়না শ্যামলিয়া॥

মেঘ-মৃদঙ্গ-তালে
শিখী নাচে ডালে-ডালে,
মল্লার গান গাহিছে পবন পূরবিয়া॥

কেতকী-কেশরে কুন্তল করো সুরভি,
পরো কদম-মেখলা কটিতটে রূপ-গরবী।

নব-যৌবন-জল-তরঙ্গে
পায়ে পাঁয়জোর বাজুক রঙ্গে,
কাজরী ছন্দে নেচে চল করতালি দিয়া॥

২৪৪

খেলিছে জলদেবী সুনীল সাগর-জলে।
তরঙ্গ-লহর তোলে লীলায়িত কুন্তলে॥

ছলছল ঊর্মি-নূপুর
স্রোত-নীরে বাজে সুমধুর,
চল-চঞ্চল বাজে কাঁকন কেয়ুর,
ঝিনুকের মেখলা কটিতে দোলে॥

আনমনে খেলে চলে বালিকা,
খুলে পড়ে মুকুতা-মালিকা ;
হরষিত পারাবারে ঘূর্ণি জাগে,
লাজে চাঁদ লুকালো গগন-তলে ॥

২৪৫

ছলকে গাগরি গোরী ধীরে ধীরে যাও।
পলকে পরাণ নিতে বারেক ফিরে চাও ॥

যৌবন-ভার-নত ক্ষীণ তনু সহে কত,
পরাণের বিনিময়ে তব ভার মোরে দাও ॥

ঝলকে বিজলি-জ্বালা মদির নয়ন-তলে,
পতঙ্গ পোড়ে অনলে তবু সে পড়ে না জলে ;
নয়নে চাহিয়া দহি, নয়ন ফিরায়ে নাও ॥

২৪৬

তব মাধবী-লীলায় করো মোরে সঙ্গী,
হে বনলক্ষ্মী।
তব অপাঙ্গে হইব ভ্রূভঙ্গি,
হে বনলক্ষ্মী ॥

মোরে জ্বালায়ে জ্বালো
তব বাসরে আলো ;
মোরে নূপুর করি'
বাঁধো চরণে তারি
নাচে তোমার সভায় যে কুরঙ্গী,
হে বনলক্ষ্মী ॥

তব রূপের দেশে
এনু বাউল-বেশে ;

যেন ফিরে নাহি যাই,
আঁখি-প্রসাদ পাই,
হব কেশে তব বেণীর ভুজঙ্গী,
হে বনলক্ষ্মী ॥

২৪৭

আমি গগন গহনে সন্ধ্যাতারা
কনক-গাদার ফুল গো।
গোধূলির শেষে হেসে উঠি আমি
এক নিমেষের ভুল গো ॥

আমি ক্ষণিকা,
আমি সাঁঝের অধরে ম্লান আনন্দ কণিকা,
আমি অভিমানিনীর খুলে ফেলে দেওয়া মণিকা,
আমি দেব-কুমারীর দুল গো ॥

আলতা রাখার পাত্র আমার
আধখানা চাঁদ ভাঙা,
তাহারি রঙ গড়িয়ে পড়ে
ঐ অস্ত-আকাশ রাঙা।
আমি এক মুঠো আলো কৃষ্ণ-সাঁঝের হাতে,
আমি নিবেদিত ফুল আকাশ-নদীতে রাতে,
ভাসিয়া বেড়াই যার উদ্দেশে গো
তার পাই না চরণ-মূল ॥

২৪৮

আজি বাদল বঁধু এলো শ্রাবণ সাঁঝে—
নীপের দীপ ঢাকি' আঁচল ভাঁজে ॥

জ্বালি' হেনার ধুনা
যাচি' কার করুণা
বন-তুলসী তলে এলে পূজারিণী সাজে ॥

সেদিন এমনি সাঁঝে মোর বেদীর মূলে
প্রিয়া জ্বালিলে এ দীপ, তাহা গেছ কি ভুলে?

সেই সন্ধ্যা-স্মৃতি—
সে যে করুণ গীতি
দূরে দাদুরী আনে বহি' মরম মাঝে॥

২৪৯

আমি যদি কভু দূরে চলে যাই।
তব নয়নের বাহির হলে
হৃদয়ে কি রবে মোর ঠাঁই॥
আজিকার যত প্রিয় গান,
এই হাসি এই অভিমান—
তব স্মৃতির বীণার তারে
গোপনে কি বাজিবে সদাই॥

যদি বারি ঝরে কেয়াবনে
এমনি বরষা-ঘন রাতে,
আমি আবার আসিব ফিরে
বারি হয়ে তব আঁখি-পাতে।

মোর দেওয়া ঝরা ফুল, প্রিয়,
শয়ন-শিয়রে রেখে দিও;
সেদিন বলিও তুমি—
মোর চেয়ে প্রিয় কিছু নাই॥

২৫০

আজকে না হয় একটি কথা
কইলে আবার মোর সাথে।
ওগো একটু না হয় বসলে এসে
এই পাথরের পৈঠাতে॥

শুধুই কি গো আমার আঁখি
ঝিমায় মদির-স্বপ্ন মাখি',
ওগো তোমার কি চোখ ধরে না কো
ঢুলতে নেশার মৌতাতে॥

আজকে তোমার নয়ন আমার
নয়ন হেরি' লজ্জা পায়,
আজকে তোমার মুখের কথা
শুধুই কি গো মুখ রাঙায়!

ফাগুন হাওয়ার দোদুল দোলায়
এই যে এসে দোল দিয়ে যায়—
ওগো মোরাই কি গো দুলব শুধু
মান-বিরহের দোলনাতে॥

২৫১

হাসি মুখে বাসি ফুল ফেলে দাও ভোরে।
মোর মন নিয়ে ফেলে দিলে তেমনি করে॥

কেন ডেকেছিলে তব উৎসব সভাতে
অবহেলা ভরে যদি ফেলে দিবে প্রভাতে;
অকারণ অকরুণ বাণ হানিতে কেন
বনের পাখিরে এনেছিলে পিঞ্জরে॥

গান গেয়ে চলেছিনু আপনার পথে—
কেন তব হৃদয়ে ঠাঁই দিলে আমারে
এনে পথ হতে।

পুতুল-খেলার মত মোরে লয়ে খেলিলে,
বক্ষে তুলিয়া শেষে পায়ে দলে ফেলিলে;
দেবতার পূজা শেষে বিগ্রহ লয়ে
ডুবাইলে নদী-জলে নিষ্ঠুর করে॥

২৫২

তোমারেই আমি চাহিয়াছি, প্রিয়, শতরূপে শতবার।
জনমে জনমে চলে তাই মোর অনন্ত অভিসার॥

বনে তুমি যবে ছিলে বনফুল
গেয়েছিনু গান আমি বুলবুল,
ছিলাম তোমার পূজার থালায় চন্দন ফুলহার॥

তব সঙ্গীতে আমি ছিনু সুর, নৃত্যে নূপুর-ছন্দ ;
আমি ছিনু তব অমরাবতীতে পারিজাত ফুলগন্ধ।

কত বসন্তে কত বরষায়
খুঁজেছি তোমারে তারায়-তারায়,
আজিও এসেছি তেমনি আশায় লয়ে প্রীতি-সম্ভার॥

২৫৩

মদির অধীর দখিনে হাওয়া।
ফিরে গেল, এল না (মোর) পথ-চাওয়া॥

ফুরাইয়া যায় পরাণের ফাগুন, আসিল না জীবন-দেবতা,
ঝরা পল্লব-প্রায় সাধ আশা ঝরে যায়, শুকাল এ তনু-লতা ;
শ্রান্ত গানের পাখি ডেকে ডেকে চলে যায় চির-বসন্ত যথা॥

আকাশে আজিও ঝরে জোৎস্নার ঝর্ণা,
তুমি আসিবে বলি' এ দেহ চাঁপার কলি
আজও আছে বঁধু চন্দন-বর্ণা।
নিরাশার সায়রে আজিও একটি দুটি কুসুম ফোটে ;
কৃষ্ণা তিথি, তবু আধেক রাতের পরে আজও চাঁদ ওঠে।
এ চাঁদ উঠিবে না, এ ফুল ফুটিবে না, আর এই জীবন-তটে॥

এস ফিরে, এসে লহ প্রিয়তম
তোমারে নিবেদিত অঞ্জলি মম
রূপের প্রেমের অঞ্জলি মম
এস ফিরে, এসে লহ প্রিয়তম॥

২৫৪

হৈমন্তিকা

হৈমন্তিকা এস এস
হিমেল শীতল বন-তলে।
শুভ্র পূজারিণী বেশে
কুন্দ-করবী-মালা গলে॥

প্রভাত শিশির নীরে নাহি'
এস বলাকার তরী বাহি'
সারস মরাল সাথে গাহি
চরণ রাখি শতদলে॥

ভরা নদীর কূলে কূলে
চাহিছে সচকিতা চখী—
মানস-সরোবর হতে—
মানস-লক্ষ্মী এল কি?

আমন ধানের ক্ষেতে জাগে
হিল্লোল তব অনুরাগে,
তব চরণের রঙ লাগে
কুমুদে রাঙা কমলে॥

২৫৫

সেদিন নিশীথে মোর কানে কানে
যে কথাটি গেছ বলে,
প্রথম মুকুল হয়ে সেই বাণী
মালতী লতায় দোলে॥

সেই কথাটি আবার শুনিবে বলিয়া
আড়ি পাতে চাঁদ মেঘে লুকাইয়া,
চাহে চুপি চুপি পিয়াসী পাপিয়া
ঘন পল্লব-তলে॥

বসে আছি সেই মালতী বিতানে
আজ তুমি নাই কাছে,

ম্লান মুখে পথ চাহে ফুলগুলি
আঁধার বকুল গাছে।

দখিনা বাতাস করে হায় হায়,
ঝরিছে কুসুম শুক্‌নো পাতায় ;
নিবু নিবু হল তোমার আশায়—
চাঁদের প্রদীপ জ্বলে॥

২৫৬

সাঁঝের আঁচলে রহিল হে প্রিয় ঢাকা
ফুলগুলি মোর বেদনার রং মাখা॥

আসিবে যখন ফিরে
আবার এ মন্দিরে
চরণে দলিও আলপনা মোর অশ্রুর জলে-আঁকা॥

বিরহ-মলিন বন-তুলসীর শুকানো মালিকাখানি
ফেলিবার আগে ধন্য করিও একটু পরশ দানি'।
যেতে এই পথ 'পরে
যদি মোরে মনে পড়ে
যমুনার জলে ভাসাইয়া দিও একটি মাধবী-শাখা॥

২৫৭

লীলা-চঞ্চল-ছন্দ দোদুল চল-চরণা
হেলে দুলে এলে কে গো গিরি-ঝরণা॥

দুলিয়ে জলের জরিন বেণী নাচো আনন্দে—
রামধনুতে ওড়ে তব রাঙা ওড়না॥
বুলবুলিরে গান গাওয়াও গো, নাচাও ময়ূরে,
ফুল-ভূষণে সাজে কানে নিরাভরণা॥
চাহিয়া আছি তোমার পথে, শুনেছি নূপুর,
কবে মিলবে আমার প্রেম-পাথারে-
সাগর-শরণা॥

২৫৮

মৌরী ফুলের মিঠে সুবাস বাতায়নে এল ভেসে।
পথ দিয়ে কে সোনার মেয়ে জলকে গেল এলোকেশে॥

কি ফুল ছিল তার কবরীতে
মদির তাহার সুরভিতে
উদাস করে মনকে আমার
নিয়ে গেল ফুলের দেশে॥

দখিন হাওয়া মর্মরিয়া খোঁজে তারে বনে বনে,
ভ্রমর ফেরে গুঞ্জরিয়া তারি তরে আনমনে।

কালো দিঘির কালো জলে
তারি তরে ঢেউ উথলে,
তারি পায়ের আলতা হতে
আকাশ রাঙে দিনের শেষে॥

২৫৯
শরতের গান

মম আগমনে বাজে আগমনীর সানাই।
সহসা প্রাতে আমি এসেছি জানাই॥
আমি আনি দেশে দশভুজার পূজা,
কোজাগরী নিশি জাগি আমি অনুজা।

বুকে শাপলা–কমল—
মালা দোলে টলমল,
আমি পরদেশী বন্ধুরে স্বদেশে আনাই॥

২৬০

আজি মনে মনে লাগে হোরি
আজি বনে বনে জাগে হোরি॥

ঝাঁঝর করতাল খরতালে বাজে।
বাজে কঙ্কণ চুড়ি মৃদুল বাজে।
লচকিয়া আসে মুচকিয়া হাসে
প্রেম-উল্লাসে শ্যামল গোরী॥

কদম্ব তমাল রঙে লালে লাল
লাল হল কৃষ্ণ ভ্রমর ভ্রমরী॥

রঙের উজান চলে কালো যমুনার জলে
আবীর-রাঙা হল ময়ূর-ময়ূরী॥

২৬১

শেফালি ও শেফালি!
আজ প্রভাতে মন ভুলাতে হাসি ঝরালি॥

শিশির-ভেজা মুখটি নিয়ে
ধরার বুকে চুমটি দিয়ে
পড়লি রূপালি॥
দুধ-চোয়ানো শ্বেত সোহাগে
আলতা ধরার চরণ রাগে
নূপুর বাজালি॥

কার তরে তুই শারদ প্রাতে
আঁচল ভরালি॥

[হিন্দুস্থান রেকর্ড নং এফ. জি. ১২]

২৬২

ওলো বকুল ফুল!
ঝরঝরিয়ে পড়লি ঝরে ধীর বাতাসের পেয়ে দুল॥

ফুরফুরে তোর গন্ধ বেয়ে
উঠছে কত ছন্দ গেয়ে।

সেই সুরেরই কণ্ঠ ছেয়ে
দুলিস দোদুল দুল ॥

তোর ঝরে পড়া সেও তো ভালো
বুকটিরে মোর করবে আলো,
ভোর বেলা তাই করিস কি লো
সকল দিক আকুল ॥

[হিন্দুস্থান রেকর্ড নং এফ. জি. ১২]

২৬৩

বন-মল্লিকা ফুটিবে যখন গিরি-ঝর্ণার তীরে
সেই চৈতালী গোধূলি-লগনে এস তুমি ধীরে ধীরে ॥
গিরি-ঝর্ণার তীরে ॥
বনের কিশোর ! এস সেথা হেসে হেসে
সাজায়ে আমায় বন-লক্ষ্মীর বেশে,
ধোয়াব তোমার চরণ-কমল বিরহ-অশ্রু নীরে ॥

ঘনালে গহন সন্ধ্যার মায়া আসিও সোনার রথে,
অতি সুকোমল শিরিষ কুসুম বিছায়ে রাখিব পথে।
মালতী-কুঞ্জে ডাকিবে পাপিয়া পাখি
তুমি এসে বেঁধো আলোকলতার রাখী।
ভ্রমরের মত পিপাসিত মোর আঁখি কাঁদিবে তোমারে ঘিরে ॥

২৬৪

গুণ্ঠন খোলো পারুল মঞ্জরি।
বল গো মনের কথা বনের কিশোরী ॥

চৈতালী চাঁদের তিথি যে ফুরায়
কাঁদিয়া কোয়েলিয়া পরদেশে যায় ॥

মধু-মাখা নাম তব মধুকর গায়
মঞ্জুল গুঞ্জরি ॥

বনমালী নিতি আসি' ভাঙায় ঘুম
বনদেবী গাহে জাগো দুলালী কুসুম,
কত মল্লিকা বেলী বকুল চামেলি
বিলায়ে সুবাস হের গিয়াছে ঝরি' ॥

২৬৫

ফাগুন ফুরাবে যবে—
উঠিবে দীরঘ শ্বাস চম্পার বনে
কোয়েলা নীরব হবে ॥

আমারে সেদিন যদি স্মরণে আসে
বেদনা জাগে ঝরা ফুল-সুবাসে
আমার স্মৃতি যত ঝরা পাতার মত
ফেলে দিও নীরবে ॥

যবে বাসর-নিশি ফুরাবে
রাতের মিলন-মালা প্রভাতে মলিন হবে ॥

সুখ-শশী অস্ত যাবে।
আসিবে জীবনে তব বৈশাখী ঝড়।
লুটাবে পথের 'পরে ভেসে যাবে ঘর
সেদিন স্মরণে তব আসিবে কি তাহারে
গৃহহীন করিয়াছ যাহারে ভবে ॥

২৬৬

রুম রুমুঝুম্ জল-নূপুর বাজায়ে কে
মোরে বর্ষার প্রভাতে গেলে ডেকে ॥

কে গো আনন্দিনী, কাহার নন্দিনী
শ্রবণ মন বলে তোমারে চিনি চিনি,
তব আসার আশে চির-বিরহিণী
পথ চেয়ে আছি কবে থেকে ॥

মনের মধুবনে সহসা পাপিয়া
'পিয়া পিয়া' বলে উঠিল ডাকিয়া,
তোমার স্মৃতি আজি উদাস আকাশে
মেঘের কাজল দিল মেখে॥

২৬৭
ঠুংরী

পিয়া স্বপনে এস নিরজনে
আধো রাতে চাঁদের সনে॥

রহিব যখন মগন ঘুমে
যেও নীরবে নয়ন চুমে
মধুকর আসে যখন গোপনে
মল্লিকা চামেলি বনে॥

বাতায়নে চাঁপার ডালে
এস কুসুম হয়ে নিশীথ কালে।
ভীরু কপোতের সম
এস হৃদয়ে মম
মালা হয়ে বাসর-শয়নে॥

২৬৮

বঁধু আমি ছিনু বুঝি বৃন্দাবনের
রাধিকার আঁখি-জলে।
বাদল সাঁঝের যুঁই ফুল হয়ে
আসিয়াছি ধরাতলে॥

তাই যেমনি মিলন-সাধ ওঠে জেগে
তুমি লুকাও যে চাঁদ বিরহের মেঘে;
আমি পুবালী পবনে ঝুরে যাই বনে
দলগুলি যেই খোলে॥

বঁধু এই বুঝি হায় নিয়তির খেলা—
মিলন আমার নহে,

ক্ষণিকের শুভ দৃষ্টি লভিয়া
কাঁদিব পরম বিরহে।
বুঝি মিলন আমার নহে।

আসিব না আমি মাধবী-নিশীথে,
বরষায় শুধু আসিব ঝুরিতে ;
অসহায় ধারাস্রোতে ভেসে যাব,
মালা হবো না কো গলে॥

২৬৯

সবার দেবতা তুমি, আমার প্রিয়—
এই শুধু জেনেছি মনে।
তাই আমার মাটির ঘরে তোমারে ডাকি—
তুমি আমি র'ব দু'জনে॥

দেবতা হে, মন্দির মাঝে
কহিতে না পারি কিছু লাজে,
কবে আমার মনের কথা শোনাব তোমায়
নিরালায় প্রেম-কূজনে॥

মোর পূজার থালিকা হতে নিয়েছ পূজা,
ভুলে গেছ পূজারিণীরে ;
তব দেউল-দুয়ার হতে শূন্য হাতে
বারে বারে এসেছি ফিরে।

বলো বলো মোর প্রিয় বেশে
আমারে চাহিবে কবে এসে ;
কবে তোমার নয়ন দুটি মিলাবে প্রিয়
ভালোবেসে মোর নয়নে॥

২৭০

নিও না গো মোর অপরাধ
তোমার পানে চাই যদি বা ভুলে।
দেখলে পরে পূর্ণিমা-চাঁদ
চিরদিনই সাগর ওঠে দুলে॥

ধরণী যে নীল গগনে
তাকিয়ে থাকে আপন মনে ;
নিত্য ভোরে অরুণ পানে
সূর্যমুখী চায় যে নয়ন তুলে ॥

মনের বনে ফুলের মেলা
জাগায় তোমার সোনার হাসির আলো ;
তোমার দেওয়া অবহেলা
প্রিয়, আমার তাও যে লাগে ভালো।

তোমার পানে তাকাই যখন
প্রদীপ হয়ে ওঠে নয়ন ;
পূজারিণী আমি প্রিয়
ওই অপরূপ রূপের দেউলে ॥

২৭১

আসিবে তুমি, জানি প্রিয় !
আনন্দে-বনে বসন্ত এলো—
ভুবন হল সরসা, প্রিয়-দরশা
মনোহর ॥

বনান্তে পবন অশান্ত হল তাই,
কোকিল কুহরে,
ঝরে গিরি-নির্ঝরিণী ঝরঝর ॥

ফুল্ল যামিনী আজি ফুল-সুবাসে,
চন্দ্র অতন্দ্র সুনীল আকাশে ;
আনন্দিত দীপান্বিত অম্বর ॥

অধীর সমীরে দিগাঞ্চল দোলে,
মালতী-বিতানে পাখি পিউ-পিউ বোলে,
অঙ্গে অপরূপ ছন্দ আনন্দ-লহর তোলে।

দিকে দিকে শুনি আজ
আসিবে রাজাধিরাজ
প্রিয়তম সুন্দর ॥

২৭২

আরো কতদিন বাকি !
তোমারে পাওয়ার আগে বুঝি, হায় !
নিভে যায় মোর আঁখি ॥

কত আঁখিতারা নিভিয়া গিয়াছে
কাঁদিয়া তোমার লাগি',
সেই আঁখিগুলি তারা হয়ে আজো
আকাশে রয়েছে জাগি'—
যেন নীড়হারা পাখি ॥

যত লোকে আমি তোমার বিরহে
ফেলেছি অশ্রুজল,
ফুল হয়ে সেই অশ্রু ছুঁইতে
চাহে তব পদতল ; —
সে সাধ মিটিবে না কি ॥

২৭৩

শ্রান্ত হৃদয় অনেক দিনের অনেক কথার ভারে।
হে বিরহী, গেলে চলে, শুনলে না কো তারে ॥

আমার মুখের সে কথা, হায় !
শুনতে এলে অনেক আশায় ;
ফুটেছে সেই কথার মুকুল বিজন অন্ধকারে ॥
যে কথা, হায় ! বলতে এলে, গেলে না কো বলে,
মালা গাঁথার ফুলগুলিরে গেলে পায়ে দলে।

সেই ফুলে আজ মালা গাঁথি,
তোমার আশায় জাগি রাতি ;
তোমার চলে যাওয়ার পথ ধুয়ে দিই আকুল নয়ন-ধারে ॥

২৭৪

বাহির দুয়ার মোর বন্ধ হে প্রিয়*
মনের দুয়ার আজি খোলা।
সেই পথে এসো হে মোর চিত-চোর,
হে দেবতা পথভোলা॥

সেথা নাহি কুললাজ কলঙ্ক ভয়,
নাহি গুরুজন-গঞ্জনা নিরদয় ;
তাই গোপন মানস তমাল কুঞ্জে
আমি বাঁধিয়াছি ঝুলন-দোলা॥

মোর অন্তরে বহে সদা অন্তঃসলিলা
অশ্রুনদী—
সেই যমুনার তীরে কর তুমি লীলা
নিরবধি।
সেই সে মিলন-মন্দিরে জাগাবে না কেহ,
তব দেহে বিলীন হবে মোর দেহ ;
অনন্ত বাসর-শয্যা রচিয়া
অনন্ত মিলনে রহিব উতলা॥

* পাঠান্তর—'বাহির দুয়ার মোর রুদ্ধ, হে প্রিয়'

২৭৫
(ভূপাল—তেতালা)

কহিতে নারি যে কথাগুলি,
গোলাপে কহে সে কথা বুলবুলি॥
উদাসী সমীরণ সেই কথা বলে
জবা ফুলের কাছে মরা ধূলিতলে ;
সেই কথা কহে চাঁদে
প্রভাত গোধূলি॥

সত্যযুগ, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৫৯

২৭৬

কালো ভ্রমর এলো গো আজ
গোলাপ তোমার ঘোমটা খোলো।
পাত্‌লা মিহিন পাপড়ি ফাঁকে
রঙিন হাসি জাগিয়ে তোলো॥

কয়েদ ছিল কালকে সাঁঝে
পাগল বঁধুর বুকের মাঝে—
ভালো যদি বাসো ওকে,
সে অভিমান আজকে ভোলো॥

প্রেম ক্ষণিকের স্বপন-মায়া
শারদ মেঘের চপল ছায়া;
যেটুকু পাও তাই নিয়ে সই
দখিন হাওয়ায় দোদুল দোলো॥

২৭৭

বিদায়ের শেষ বাণী
তুমি মোরে বলো না,
জানি আমি তারে জানি॥

রাতের আঁধারে পাখি
সে কথা কহিছে ডাকি',
বায়ু করে কানাকানি॥

আকাশের পার হতে
যে তারকা ঝরে যায়,
সে যে আজ কয়ে গেল
তোমার কথাটি, হায়!

যাবে তুমি কোন্ ক্ষণে
ভুলে আছি আনমনে,
ভাঙিও না ভুলখানি॥

২৭৮

বেলা গেল, সন্ধ্যা হল,
এখন খোল আঁখি।
এই সোনার খনির কাছে এসে
ফিরলি ধুলা মাখি'॥

এ সংসারের সার ছেড়ে তুই
সং সেজে হায় বেড়াস্ নিতুই ;
যে তোরে ধন-রত্ন দিলো
তারেই দিলি ফাঁকি॥

ভুলে রইলি যাদের নিয়ে তাদের
পেলি কোথা হতে,
তোর যাবার বেলায় কেউ কি সাথী
হবে রে তোর পথে।

এখনও তুই ডাক্ একবার,
নাই রে সীমা তাঁহার দয়ার ;
সে-ই করবে ক্ষমা, ঘুম পাড়াবে
শীতল বুকে রাখি'॥

২৭৯

ব্যথা দিয়ে প্রাণ ব্যথা না পায়—
ওগো অকরুণ, লহ বিদায়॥

এ পথে যায় না পথিক, ভুল করে রূপ সন্ধানে ;
এ মেঘে নাই বরিষণ, চমকে চিকুর বাজ হানে ;

কাঁটা নিকুঞ্জে এ মোর আর না মুকুল মুঞ্জরে,
উদাসীর মন বেঁধে না আর নয়নের ফুল-শরে ;
ভুলে গেছে পাখি তার সুর সাধায়॥

আমারে চাও না যদি চাও মালিকার বন্ধনে,
পূজারীর প্রাণ চাহ না, চাও খালি ধূপ-চন্দনে ;

ফিরে যাও, যাও মধুকর, আর নিলাজের গুঞ্জনে
ছলনার জাল বুনো না এই বেদনার ফুল-বনে ;
মিছে চেয়ে থাকা মোর মন কাঁদায়॥

২৮০

স্বপন যখন ভাঙবে তোমার
দেখবে আমি নাই।
(মোরে) শূন্য তোমার বুকেরি কাছে
খুঁজবে গো বৃথাই॥

দেখবে জেগে বাহুর 'পরে
আছে নীরব অশ্রু ঝরে,
কাছে থেকেও ছিলাম দূরে
যাই গো চলে যাই॥

কাঁটার মত ছিলাম বিঁধে আমি তোমার বুকে,
বিদায় নিলাম চিরতরে
ঘুমাও তুমি সুখে।

একলা ঘরে জেগে ভোরে
হয়ত মনে পড়বে মোরে,
দূরে সরে হয়ত পাব
অন্তরেতে ঠাঁই॥

২৮১

শত জনম আঁধারে আলোকে
তারকা-গ্রহে লোকে লোকে
প্রিয়তম ! খুঁজিয়া ফিরেছি তোমারে॥

স্বপন হয়ে রয়েছ নয়নে,
তপন হয়ে হৃদয়-গগনে—
হেরিয়া তোমারে বিরহ-যমুনা
প্রিয়তম ! দুলিয়া ওঠে বারে বারে॥

হে লীলা-কিশোর ! ডেকেছে আমারে
তোমার বাঁশি,
যুগে যুগে তাই তীর্থ-পথিক
ফিরি উদাসী।
দেখা দাও, তবু ধরা নাহি দাও,
ভালবাস বলে তাই কি কাঁদাও ;
তোমারি শুভ্র পূজার-পুষ্প
প্রিয়তম ! ফুটিয়া ওঠে অশ্রুধারে ॥

২৮২

যাই গো চলে যাই না-দেখা লোকে
জানিতে চির-অজানায়।
নিরুদ্দেশের পথে মানস-রথে
স্বপন-ঘুমে মন যথা চলে যায় ॥

সাগর-জলে পাতাল-তলে তিমিরে
অজানা মায়ায় আছে চিরদিন যে সে দেশ ঘিরে—
মেঘলোক পারায়ে
চাঁদের বুকে গ্রহ তারায় ॥

যাই হিমাগিরি-চূড়াতে মেরুর অন্ধকারে,
আকাশের দ্বার খুলে হেরিতে উষারে।
রামধনু-রথে যথা পরীরা খেলে,
যে দেশ হইতে আসে এ জীবন,
যেখানে হারায় ॥

২৮৩

ওরে যোগ-সাধনা পরে হবে
নাম জপ তুই আগে।
সকল কাজে সকাল সাঁঝে
গভীর অনুরাগে ॥

ওরে যে ঠাকুরে পরান যাচে,
সে নামের মাঝে লুকিয়ে আছে ;
যেমন বীজের মাঝে মহাতরু সঙ্গোপনে জাগে ॥

বীজ না বুনে আগে ভাগেই
ফসল খুঁজিস্ তুই,
তাই চিরকাল পোড়ো জমি
রইল মনের ভুঁই।

তোর কোন্ পথ নাম-জপের শেষে
দেখিয়ে দেবেন তিনিই এসে,
তোর জীবন হবে প্রেমে রঙিন
রঙ যদি রে লাগে ॥

তার মধুর নামের রঙ যদি রে লাগে,
নাম জপ তুই আগে ॥

২৮৪

রুমুঝুম রুমুঝুম নূপুর বাজে।
আসিল রে, প্রিয় আসিল রে।
কদম্ব-কলি শিহরে আবেশে,
বেণীর তৃষ্ণা জাগে এলোকেশে,
হৃদি-ব্রজধাম রস-তরঙ্গে
প্রেম-আনন্দে ভাসিলে রে ॥

ধরিল রূপ অরূপ শ্রীহরি,
ধরণী হল নবীনা কিশোরী ;
চন্দ্রার কুঞ্জ ছেড়ে যেন কৃষ্ণ-চন্দ্রমা
গগনে হাসিল রে ॥

আবার মল্লিকা মালতী ফোটে,
বিরহে যমুনা উথলি ওঠে,
রোদন ভুলে রাধা গাহিয়া ওঠে—
"সুন্দর মোর ভালবাসিল রে ॥

২৮৫

আয় ঘুম, আয় ঘুম আয়, মোর গোপাল ঘুমায়,
বহু রাত্রি হ'ল আর জাগাস্ না মায়॥

কোলে লয়ে তোরে ধীরে ধীরে দোলাব,
ঘুম-পাড়ানিয়া গান তোরে শোনাব,
গায়ে হাত বুলাব, পাখা ঢুলাব,
মন ভুলাব কত রূপকথায়॥

ঘুম আয়, ঘুম আয়!
তোরে কে বলে চঞ্চল? এক-চোখো সে।
মোর শান্ত গোপাল, থাকে গোষ্ঠে বসে।

তোরে কে বলে ঝড় তোলে থির যমুনায়।
সে যে দিন রাত ঘোরে তার মার পায় পায়
ঘুম আয়, ঘুম আয়, ঘুম আয়!

এন. ১৭২৩৬.

২৮৬

তুমি যতই দহ না দুখের অনলে
আছে এর শেষ আছে।
আগুনে পুড়িব নির্মল হব
যাব চরণের কাছে॥

দহনের শেষে বরষা আসিবে,
করুণা-ধারায় হৃদয় ভাসিবে।
এ-দিন রবে না, কুসুম ফুটিবে
আবার শুষ্ক গাছে॥

তব ললাটের আগুন যখন
পেয়েছি, হে সুন্দর!
পাইব করুণা-জাহ্নবী-ধারা
শীতল চাঁদের কর।

ওগো মঙ্গলময় ! আঘাতের ছলে
স্মরণ করায়ে দাও পলে পলে,
এতদিন পরে আবার আমারে
তব মনে পড়িয়াছে॥

২৮৭

বেদনার বেদীতলে পেতেছি আসন,
হে দেবতা !
সেথা আর কেহ নাই, আমরা দু'জন
কহিব কথা॥

বাহির ভুবনে তব কত পূজারী,
সেথায় মনের কথা কহিতে নারি।
তাই হৃদয়-দেউলে রেখে দিয়েছি আগল
সেথা তোমার চরণ-তলে জানাব গোপন
প্রাণের ব্যথা॥

পূজা-মন্দির হতে এসে চুপে চুপে
হে দেবতা ! সাজায়েছি প্রিয় রূপে।
সবার সমুখে তাই
মালা দিতে লাজ পাই,
প্রেমের বাসর-ঘরে পরাব বরণ-মালা
হব প্রণতা॥

২৮৮

দেবতা হে, খোলো দ্বার, আসিয়াছি মন্দিরে।
ফিরায়ো না মোরে আর, আঁধার এলো যে ঘিরে॥

রিক্ত আজ কানন, নাই ফুল নিবেদন,
সাজায়েছি উপচার আকুল নয়ন-নীরে॥

ঘনালো অন্ধ ঝড় গগনে বিজলী-লিখা,
কেঁপে ওঠে থরথর ভীরু মোর দীপ-শিখা।

বহু দূর হতে এসে
তোমারে পেয়েছি শেষে
তুমিও ফিরালে মুখ পূজারিণী যাবে ফিরে॥

২৮৯

পূজার থালায় আছে আমার ব্যথার শতদল,
হে দেবতা, রাখো সেথা তোমার পদতল॥

নিবেদনের কুসুম সহ
লহ হে নাথ আমায় লহ;
যে আগুনে আমায় দহ,
সেই আগুনে আরতি-দীপ জ্বেলেছি উজল॥

যে নয়নের জ্যোতি নিলে কাঁদিয়ে পলে পলে,
মঙ্গল-ঘট ভরেছি নাথ সেই নয়নের জলে।
যে চরণে হানো আঘাত
প্রণাম লহ সেই পায়ে, নাথ!
রিক্ত তুমি করলে যে হাত
হে দেবতা, লও সে হাতের অর্ঘ্য সুমঙ্গল॥

২৯০

হে মহামৌনী, তব প্রশান্ত গম্ভীর বাণী
শোনাবে কবে।
যুগ যুগ ধরে প্রতীক্ষা-রত আছে জাগি
ধরণী নীরবে॥

যে বাণী শোনার অনুরাগে
উদার অম্বর জাগে;
অনাহত যে বাণীর ঝঙ্কার
বাজে ওঙ্কার প্রণবে॥

চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-তারায়
জ্বলে যে বাণীর শিখা,

পুষ্পে পর্ণে শত বর্ণে
যে বাণী-ইঙ্গিত লিখা ;

যে অনাদি বাণী সদা শোনে
যোগী ঋষি মুনি জনে,
যে বাণী শুনি না শ্রবণে,
বুঝি অনুভবে ॥

২৯১

আজ সকালে সূর্য ওঠা সফল হল মম।
ঘরে এলো ফিরে পরবাসী প্রিয়তম ॥

আজ প্রভাতের কুসুমগুলি
সফল হল ডালায় তুলি'
সাজির ফুলে আজের মালা
হবে অনুপম ॥
এতদিনে সুখের হল প্রভাতী শুকতারা,
ললাটে মোর সিঁদুর দিল উষার রঙের ধারা।

আজকে সকল কাজের মাঝে
আনন্দেরই বীণা বাজে,
দেবতার বর পেয়েছি আজ
তপস্বিনী-সম ॥

২৯২

দুঃখ-সুখের দোলায় দয়াল
দোল দিতেছ অবিরত।
তুমি হাস বুঝি মনে মনে
ভয়ে আমি কাঁদি যত ॥

দাতা হয়ে সব কিছু দাও,
নিঠুর করে সব কেড়ে নাও ;

সাগর শুকাও, মরু ভাসাও,
ফুটায়ে ফুল ঝরাও কত॥

তোমার লীলা তুমি জানো ;
জানি না বুঝি না—কেন
ভাঙো যত গড়ো তত॥

অবহেলায় গেল বেলা,
ধুলা-খেলা হল মেলা ;
এবার কোলে তুলে দাও ভুলায়ে
অবুঝ মনের ব্যথা-ক্ষত॥

২৯৩

খুঁজে দেখা পাইনে যাহার,
পরাণ তবু আছে বলে—
করুণ সুরের মালাখানি
পরিয়ে দেব তারি গলে॥

কে আমারে জোছনা-রাতে
জাগালে গো ফুলের সাথে,
তার সাথে মোর হবে দেখা
চির-রাতের তিমির-তলে॥

সুখে দুখে আমার বুকে
শুনি কাহার চরণ-ধ্বনি,
জীবন ভরে আকুল করে
কে আমারে দিন-রজনী।

শিহর-লাগা অনুরাগে
তার লাগি মোর হৃদয় জাগে,
তার সাথে মোর হবে মিলন
চির-রাতের তিমির-তলে॥

২৯৪

সকাল-সাঁঝে প্রভু সকল কাজে
বেজে উঠুক তোমারি নাম।
নিশীথ রাতের তারার মত
উঠুক তোমারি নাম॥
বেজে উঠুক তোমারি নাম।

তরুর শাখায় ফুলের সম
বিকশিত হোক, প্রভু,
তব নাম নিরুপম ;
সাগর মাঝে তরঙ্গ-সম
বহুক তোমারি নাম॥

পাষাণ-শিলায় গিরি-নির্ঝর সম
বহুক তোমারি নাম,
অকূল সমুদ্রে ধ্রুবতারা-সম
জাগি রহুক তব নাম॥

প্রভু জাগি রহুক তব নাম।
শ্রাবণ-দিনের বারিধারার মত
ঝরুক ও নাম প্রভু অবিরত ;
মানস-কমল-বনে মধুকর-সম
লুটুক তোমারি নাম॥

২৯৫

মম মায়াময় স্বপনে কার বাঁশি বাজে গোপনে—
বিধুর মধুর সুরে কে এল, কে এল সহসা।
যেন সিগ্ধ আনন্দিত চন্দ্রালোকে ভরিল আকাশ,
হাসিল তমসা॥

অচেনা সুরে কেন ডাকে সে মোরে
এমন করে ঘুমের ঘোরে ;
নব-নীরদ-ঘন-শ্যামল কে এ চঞ্চল,
তারে হেরিয়া তৃষিত প্রাণ হল সরসা॥

কভু সে অন্তরে, কভু দিগন্তরে—
এই সোনার মৃগ ভুলাতে আসে মোরে ;
দেখেছি ধ্যানে যেন এই সে সুন্দরে—
শুনেছি ইহারি বেণু প্রাণ-বিবশা॥

২৯৬

ডাকতে তোমায় পারি যদি
আড়াল থাকতে পারবে না॥
এখন আমি ডাকি তোমায়,
তখন তুমি ছাড়বে না॥

যদি দেখা না পাই কভু—
সে দোষ তোমার নহে প্রভু,
সে সাধনায় আমারই হার, স্বামী,
তুমি কভু হারবে না॥
বহু লোকের চিন্তাতে মোর
বহু দিকে মন যে ধায়,—
জানি জানি, অভিমানী,
পাইনি আজো তাই তোমায়।

বিশ্ব-ভুবন ভুলে যেদিন
তোমার ধ্যানে হব বিলীন,
সেদিন আমার বক্ষ হতে
চরণ তোমার কাড়বে না॥

২৯৭

মোর লীলাময় লীলা করে
আমার দেহের আঙিনাতে।
রসের লুকোচুরি-খেলা
নিত্য আমার তারি সাথে॥

তারে নয়ন দিয়ে খুঁজি যখন
অন্তরে সে লুকায় তখন ;

আবার অন্তরে তায় ধরতে গেলে
লুকায় গিয়ে নয়ন-পাতে ॥

ঐ দেখি তার হাসির ঝিলিক
আমার ধ্যানের ললাট-মাঝে,
ধরতে গেলে দেখি সে নাই—
কোন্ সুদূরে নূপুর বাজে।
যেন বর-কনে এক বাসর-ঘরে
অনন্তকাল বিরাজ করে,
তবু তাদের হয় না দেখা,
হয় না মিলন হাতে হাতে ॥

২৯৮

তোমার মহাবিশ্বে কিছু হারায় না তো কভু—
আমরা অবোধ, অন্ধ মায়ায় তাই তো কাঁদি তবু ॥
তোমার মতই তোমার ভুবন
চির-পূর্ণ, হে নারায়ণ!
দেখতে না পায় অন্ধ নয়ন,
তাই এ দুঃখ, প্রভু ॥

ঝরে যে ফুল ধুলায়, জানি, হয় না তারা কভু হারা,
ঐ ঝরা ফুলে নেয় যে জনম তরুণ তরুর চারা।
তারা হয় না কভু হারা ॥

হারালো মোর (ও) প্রিয় যারা,
তোমার কাছে আছে তারা;
আমার কাছে নাই তাহারা,
হারায়নি কো তবু ॥

২৯৯

জগতের নাথ, করো পার!
মায়া-তরঙ্গে টলমল তরণী,
অকূল ভব-পারাবার (হে) ॥

নাহি কাণ্ডারী, ভাঙা মোর তরী,
আশা নাহি কূলে উঠিবার।
আমি গুণহীন বলে কর যদি হেলা,
শরণ লইব তবে কার॥

সংসারের এই ঘোর পাথারে
ছিল যারা প্রিয় সাথী,
একে একে তারা ছেড়ে গেল, হায় !
ঘনাইল যেই দুখ-রাতি।

ধ্রুবতারা হয়ে তুমি জ্বালো
অসীম আঁধারে, প্রভু, আশার আলো ;
তোমার করুণা বিনা, হে দীন-বন্ধু !
পারের আশা নাহি আর॥

৩০০

খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে।
প্রলয়-সৃষ্টি তব পুতুল-খেলা নিরজনে,
প্রভু, নিরজনে॥

শূন্যে মহা-আকাশে
মগ্ন লীলা-বিলাসে
ভাঙিছ গড়িছ নিতি ক্ষণে ক্ষণে॥

তারকা-রবি-শশী খেলনা তব,
হে উদাসী—
পড়িয়া আছে রাঙা পায়ের কাছে
রাশি রাশি।

নিত্য তুমি, হে উদার,
সুখে-দুখে অবিকার,
হাসিছ খেলিছ, প্রভু, আপন মনে॥

৩০১

কাণ্ডারী গো, কর কর পার
এই অকূল ভব-পারাবার।
তোমার চরণ-তরী বিনা, প্রভু,
পারের আশা নাহি আর॥

পাপের তাপের ঝড়-তুফানে
শান্তি নাহি আমার প্রাণে ;
আমি যেদিকে চাই দেখি কেবল
নিরাশারই অন্ধকার॥

দিন থাকতে আমার মত প্রভু
তোমায় কেউ নাহি সম্ভাষে ;
দিন ফুরালে খাটে শুয়ে
এই ঘাটে সবাই আসে।

লয়ে তোমার নামের কড়ি'
সাধু পেল চরণ-তরী ;
সে-কড়ি নাই যে, কাঙালের
হও হে দীনবন্ধু তার॥

৩০২

আমি বাঁধন যত খুলিতে চাই
জড়িয়ে পড়ি তত।
শুভদিন এলো না, দিনে দিনে
দিন হলো হায় গত॥

শত দুঃখ অভাব নিয়ে
জগৎ আছে জাল বিছিয়ে,
অসহায় এ পরাণ কাঁদে
জালে মীনের মত॥

বোঝা যত কমাতে চাই
ততই বাড়ে বোঝা ;

শান্তি কবে পাব, কবে
চলব হয়ে সোজা।

দাও বলে, হে জগৎ-স্বামী!
মুক্তি পাব কবে আমি,
কবে উঠবে ফুটে জীবন আমার
ভোরের ফুলের মত॥

৩০৩

তুমি যে হার দিলে ভালবেসে সে হার আমার হল ফাঁসি।
(প্রিয়) সেই হার আজ বক্ষে চেপে আকুল নয়ন-জলে ভাসি॥

তুমি জান অন্তর্যামী,
দান তো তোমার চাইনি আমি,
তোমায় শুধু চেয়েছিলাম, সাধ ছিল মোর হতে দাসী॥
দুখের মালা কেড়ে নিয়ে কেন দিলে মতির মালা
মালায় শীতল হবে কি, নাথ! শূন্য আমার বুকের জ্বালা?

মোরে রেখো না আর সোনার রথে,
ডাকো তোমার তীর্থপথে;
আমার সুখের ঘরে আগুন জ্বালো, শোনাও বাঁশি সর্বনাশী॥

৩০৪

যে পাষাণ হানি' বারে বারে তুমি
আঘাত করেছ স্বামী;
সে পাষাণ দিয়ে তোমার পূজায়
এ মিনতি রাখি আমি॥

যে আগুন দিলে দহিতে আমারে,
হে নাথ, নিভিতে দিইনি তাহারে,

আরতি-প্রদীপ হয়ে তারি বিভা
বুকে জ্বলে দিবাযামী॥

তুমি যাহা দাও, প্রিয়তম মোর,
তাহা কি ফেলিতে পারি;
তাই নিয়ে তব অভিষেক করি
নয়নে দিলে যে বারি।

ভুলিয়াও মনে কর না যাহারে,
হে নাথ, বেদনা দাও না তাহারে;
ভুলিতে পারো না মোরে, ব্যথা-দেওয়া ছলে
তাই নিচে আস নামি॥

৩০৫

এ কোন্ মায়ায় ফেলিলে আমায়
চির-জনমের স্বামী—
তোমার কারণে এ তিন ভুবনে
শান্তি না পাই আমি॥

অন্তরে যদি লুকাইতে চাই—
অন্তর জ্বলে পুড়ে হয় ছাই;
এ আগুন আমি কেমনে লুকাই,
ওগো অন্তর্যামী॥

মুখ থাকিতেও বলিতে পারে না
বোবা স্বপ্নের কথা;
বলিতেও নারি লুকাতেও নারি
তেমনি আমার ব্যথা।

যে দেখেছে প্রিয় বারেক তোমায়
বর্ণিতে রূপ ভাষা নাহি পায়,
পাগলিনী-প্রায় কাঁদিয়া বেড়ায়
অসহায়, দিবাযামী॥

৩০৬

অনাদি কাল হতে অনন্ত লোক
গাহে তোমারি জয়।
আকাশ-বাতাস রবি-গ্রহ-তারা-চাঁদ,
হে প্রেমময়,
গাহে তোমারি জয়॥

সমুদ্র-কল্লোল, নির্ঝর-কলতান—
হে বিরাট, তোমারি উদার জয়গান ;
ধ্যান-গম্ভীর কত শত হিমালয়
গাহে তোমারি জয়॥

তব নামের বাজায় বীণা বনের পল্লব
জনহীন প্রান্তর স্তব করে, নীরব।
সকল জাতির কোটি উপাসনালয়
গাহে তোমারি জয়॥

আলোকের উল্লাসে, আঁধারের তন্দ্রায়
তব জয়গান বাজে অপরূপ মহিমায়,
কোটি যুগ-যুগান্ত সৃষ্টি-প্রলয়
গাহে তোমারি জয়॥

৩০৭

বিশ্ব ব্যাপিয়া আছো তুমি জেনে
শান্তি ত নাহি পাই।
রূপ ধরে এস, দাঁড়াও সমুখে
দেখিয়া আঁখি জুড়াই॥

আমার মাঝারে যদি তুমি রহ
কেন তবে এই অসীম বিরহ,
কেন বুকে বাজে নিবিড় বেদনা
মনে হয় তুমি নাই॥

চাঁদের আলোকে ভরে না গো মন
দেখিতে চাই যে চাঁদ,
ফুলের গন্ধ পাইলে, জাগে যে
ফুল দেখিবার সাধ।

(ওগো) সুন্দর, যদি নাহি দেবে ধরা
কেন প্রেম দিলে বেদনায় ভরা,
রূপের লাগিয়া কেন প্রাণ কাঁদে
রূপ যদি তব নাই॥

৩০৮

পরমাত্মা নহ তুমি, তুমি পরমাত্মীয় মোর।
হে বিপুল বিরাট, মোর কাছে তুমি প্রিয়তম চিত-চোর॥

তোমারে যে ভয় করে, হে বিশ্ব-ত্রাতা!
তার কাছে তুমি রুদ্র দণ্ড-দাতা;
প্রেমময় বলে তোমারে যে বাসে ভালো
তার কাছে তুমি মধুর লীলা-কিশোর॥

দেখে ভীরু চোখ আষাঢ়ের মেঘে
বজ্র তব বিপুল,
মোর মালঞ্চে, সেই মেঘ হেরি
ফোটায় নব মুকুল।
আকাশের নীল অসীম পদ্ম 'পরে
চরণ রেখেছ, হে মহান, লীলা-ভরে।
সেই অনন্ত, জানিনা কেমন করে
আমার হৃদয়ে খেল দিবানিশি ভোর॥

৩০৯

ওগো অন্তর্যামী, ভক্তের তব শোন শোন নিবেদন
যেন থাকে নিশিদিন তোমার সেবায় মোর
তনু-প্রাণ-মন॥

নয়নে কেবল দেখি যেন আমি
তোমারি স্বরূপ ত্রিভুবন-স্বামী,
শিরে বহি যেন তোমারি পূজার অর্ঘ্য অনুক্ষণ॥

এ রসনা শুধু জপে তব নাম, এই বর দাও নাথ ;
তোমারই চরণ–সেবায় লাগুক মোর এই দু'টি হাত।
ওঠে তব নাম প্রতি নিঃশ্বাসে
শ্রবণে কেবলি তব নাম ভাসে
তব মন্দির–পথে যেন সদা চলে মোর এ চরণ॥

৩১০

যত নাহি পাই দেবতা তোমায়, তত কাঁদি আর পূজি।
যতই লুকাও ধরা নাহি দাও, ততই তোমারে খুঁজি॥

কত সে রূপের রঙের মায়ায়
আড়াল করিয়া রাখ আপনায়
তবু তব পানে অশান্ত মন কেন ধায় নাহি বুঝি॥

কাঁদাবে যদি গো এমনি করিয়া কেন প্রেম দিলে তবে
অন্তবিহীন এ লুকোচুরির শেষ হবে নাথ কবে।

সহে না হে নাথ বৃথা আসা–যাওয়া—
জনমে জনমে এই পথ চাওয়া
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফুরাইয়া গেল চোখের জলের পুঁজি॥

৩১১

মৃত্যুর যিনি মৃত্যু, আমি শরণ নিয়াছি তাঁর।
নাই নাই মোর চিত্তে, ওরে মৃত্যুর ভয় আর॥

তাঁহার নামের অমৃত সুধায়
ভরিয়াছে প্রাণ কানায় কানায়,
পান করে মৃত–সঞ্জীবনী হল মধুময় সংসার॥

মৃত্যুরে আজ মনে হয় যেন ঘুমাই মায়ের কোলে,
হাসিয়া জাগিব পুনরায় নব জীবনে, প্রভাত হলে।
মৃত্যুর ভয় গিয়াছে যখন
মৃত্যু অমনি মরেছে তখন
আজ মৃত্যু আসিলে ধরিও জড়ায়ে, করি গলার হার॥

মোরই ভগবান মৃত্যুর রূপে
মুখোস পরিয়া আসে চুপে চুপে,
আমি ধরিয়া ফেলেছি এই লীলা মোর সুন্দর বিধাতার ॥

৩১২

অসীম আকাশ হাত্‌ড়ে ফিরে
খুঁজিস রে তুই কাকে ?
তোর দূরের ঠাকুর তোরই ঘরে
কাছে কাছে থাকে ॥

মা হয়ে সে কোলে করে
পিতা হয়ে বক্ষে ধরে
সে প্রিয় হয়ে বন্ধু হয়ে বিলায় আপনাকে ॥

ওরে মন-কানা ! তুই দেশে দেশে কোন্
তীর্থে যাবি ?
তোর খুললে মনের চোখ কত দেখবি নতুন লোক
তোরই আশে পাশে সে যে হাসে,
দেখতে পাবি।

তুই যাকে কেবল ভাবিস মায়া—
দেখবি তাতেই তাঁহার ছায়া ;
শত্রু-মিত্র কত রূপে ছদ্মবেশে চুপে চুপে
সে নাম ভাঁড়িয়ে ডাকে
তোরে নাম ভাঁড়িয়ে ডাকে ॥

৩১৩

সংসারেরি সোনার শিকল বেঁধো না আর পায়।
(তোমার) প্রেম-ডোরে ত্রিভুবন-স্বামী বাঁধো আমায় ॥
সারা জীবন বোঝা বয়ে
এসেছি আজ ক্লান্ত হয়ে
জড়াও হে শান্তিদাতা তোমার শীতল ছায় ॥

হে নাথ, যত দিন শক্তি ছিল বোঝা বহিবার
হাসিমুখে বয়েছি নাথ তোমার দেওয়া ভার।

শেষ হল আজ ভবের খেলা
কি দান দিলে যাবার বেলা—
তোমার নামের ভেলায় যেন
এ দীন তরে যায়॥

৩১৪

গাহে আকাশ পবন নিখিল ভুবন
তোমারই নাম গাহে তোমারই নাম।
সাগর-নদী বন-উপবন
তোমারই নাম গাহে তোমারই নাম॥

মধুর তোমার গানের নেশায়
ঘোর লাগে ঐ গ্রহ-তারায়
অনন্ত কাল ঘুরিয়া বেড়ায়
ঘিরি' অসীম গগন
গাহে তোমারই নাম॥

তোমার প্রিয় নামে, হে বঁধু,
ফুলের বুকে পুরে মধু;
তোমার নামের মাধুরী মাখি'
গান গেয়ে যায় বনের পাখি;
নিখিল পাগল ও-নাম ডাকি
কোটি চন্দ্র তপন
গাহে তোমারই নাম॥

৩১৫

মোর প্রিয়জনে হরণ করে
তুমি প্রিয় হলে।
এবার ছেড়ে যেয়ো না নাথ
থাক চোখের জলে॥

যারা ছিল তোমায় আড়াল করে
তুমি তাদের নিলে হরে।
এবার ত্রিভুবনে তুমিই শুধু
রইলে আমার বলে॥

তুমি তাদের দিয়েছিলে
তুমিই ডেকে নিলে কাছে
তোমার দেওয়া তুমি নিলে
মোর কি বলার আছে।
হে নাথ, ভবে রইল না আর
কারুর তরে ভাবনা আমার,
তুমি বসো এবার শূন্য আমার
হৃদয়-পদ্ম-দলে॥

৩১৬

সুখ-দিনে ভুলে থাকি,
বিপদে তোমারে স্মরিয়া।
ডুবাবে কি তব নাম
আমারে ডুবাইয়া॥

মা'র কাছে মার খেয়ে
শিশু যেমন ডাকে মাকে
যত দাও দুখ শোক
ততই ডাকি তোমাকে।
জানি শুধু তুমি আছ
আসিবে আমার ডাকে,
তোমারি এ তরী প্রভু,
তুমি চল বাহিয়া॥

৩১৭

প্রভু, লহ মম প্রণতি
(আমি) জনমে জনমে নিবেদিতা—
লহ প্রেম-আরতি॥

তোমারি লাগিয়া সব সুখ ছাড়িনু
প্রভুজী, ফিরায়ো না মোরে।
সকল তেয়াগি পেয়েছি হৃদয়ে
তব প্রিয় মুরতি॥

পরাণে বাজে মোর মিলন-বাঁশি,
নয়নে তবু বহে ধারা,
বিরহের রাতে মম দুখ-ভাগী
কে হবে প্রভু তুমি ছাড়া?

কত না স্রোতের ফুল তোমারি পূজাতে
ঠাঁই পায় তব চরণে
আমার হৃদয় প্রভু, সেও তো স্রোতের ফুল
রাখ মম বিনতি॥

৩১৮

এই বিশ্বে আমার সবাই চেনা, কেউ অচেনা নাই।
যারে দেখি হয় মনে সেই বন্ধু, প্রিয়, ভাই
কেউ অচেনা নাই॥

কোন্ সে লোকে নাই তা মনে
চেনা ছিল সবার সনে,
দেখে এদের প্রাণ জুড়িয়ে যায় রে আমার তাই।
কেউ অচেনা নাই॥

চোখ যারে কয় "চিনতে নারি", প্রাণ কেন রে কাঁদে;
(তারেই) জড়িয়ে ধরতে চায় এই বুক (যে) শত্রু হয়ে বাঁধে।

সব মানুষের প্রাণের কাছে
আমার চেনা লুকিয়ে আছে,
(তাই) অচেনা কেউ চেনা হলে (এত) আনন্দ পাই।
কেউ অচেনা নাই॥

৩১৯

আমার মালায় লাগুক তোমার মধুর
হাতের ছোঁয়া।
ঘিরুক তোমায় মোর আরতি
পূজা-ধূপের ধোঁয়া॥

পূজায় বসে দেব-দেউলে
তোমায় দেখি মনের ভুলে,
তুমি নিলে আমার পূজা প্রিয়
হবে তাঁরই লওয়া॥
হবে দেবতারই লওয়া।

তুমি যেদিন প্রসন্ন হও, ঠাকুর চাহেন হেসে
আমার ঠাকুর চাহেন হেসে
কাঁদলে তুমি, বুকে আমার দেবতা কাঁদেন এসে।

আমি অন্ধকারে ঠাকুর পূজে
ঘরের মাঝে পেলাম খুঁজে
সে যে তুমি আমার চির
অবহেলা-সওয়া॥

৩২০

আঁধার রাতে দেবতা মোর এসে গেছে চলে।
রেখে গেছে চরণ-চিহ্ন শূন্য গৃহ-তলে॥

জেগে দেখি বুকের কাছে
পূজার মালা পড়ে আছে,
ফেলে গেছে মালাখানি বুঝি খানিক প'রে গলে॥

তার অঙ্গের সুবাস ভাসে মন্দির-অঙ্গনে,
তাহার ছোঁয়া লেগে আছে কুম্‌কুম-চন্দনে।

অপূর্ণ মোর প্রণামখানি
দেবো কবে নাহি জানি
সে আসবে বুঝি বাসনা-ধূপ পুড়িয়া শেষ হলে॥

৩২১

ছাড়িয়া যেও না আর।
বিরহের তরী মিলনের ঘাটে লাগিল যদি আবার॥

কত সে-বিফল জনমের পর
পথ-চাওয়া মোর ফিরে এলে ঘর,
এল শুভদিন, কাটিল অসহ রাতের অন্ধকার॥

দেবতা গো ফিরে চাও।
মোর বেদনার তপস্যা শেষ, মিলনের বর দাও।
লয়ে জীবনের সঞ্চিত ব্যথা
তোমার চরণে হলাম প্রণতা
লহ পূজা মোর নয়নের লোর
শীর্ণা তনুর হার॥

৩২২

নীরব সন্ধ্যা নীরব দেবতা
খোলো মন্দির-দ্বার।
ম্লান হল বেদনায়-অঞ্জলি নিশি-গন্ধার॥

নিভিয়া যায় হায় অঞ্চল-তলে
নয়নের প্রদীপ নয়নের জলে,
শুকাইল নিরাশায় চন্দন ফুলদল
তোমার বরণ-ডালার॥

মৌন রবে আর কতকাল বল পাষাণ-বেদীতে
কত জনম কত পূজারিণীর আয়ু-দীপ নিভাইতে।

দিনের তপস্যার শেষে সাঁঝ-লগনে
আশার চাঁদ কি গো উঠিবে না গগনে,
আমার শেষ বাণী তোমার চরণে
নিবেদনের ক্ষণ পাব নাকি আর॥

৩২৩

মৃত্যু-আহত দয়িতের তব
শোন করুণ মিনতি—
অমৃতময়ী মৃত্যুঞ্জয়ী
হে সাবিত্রী সতী॥

ঘন অরণ্যে বাজে মোর স্বর,
মোরি রোদনে উঠিয়াছে ঝড়,
সাঁঝের চিতায় ওই নিভে যায়
মম নয়নের জ্যোতি॥

যুগে যুগে তুমি বাঁচায়েছ মোরে
মৃত্যুর হাত হতে—
দেবী সাবিত্রী সতী।
মোরি হাত ধরে রাজপুরী ছেড়ে
চলেছেন বনের পথে
বিধবা অশ্রুমতী।

জীবনের তৃষা মেটেনি তাহার,
তুমি এসে মোরে বাঁচাও আবার;
মৃত্যু তোমারে করিবে প্রণাম—
ধরার অরুন্ধতী॥

৩২৪

লক্ষ্মী মা গো নারায়ণী আয় এ আঙিনাতে।
সুধার পাত্র সোনার ঝাঁপি লয়ে শুভ হাতে॥

সৌভাগ্যদায়িনী তুই মা এসে
দারিদ্র্য-ক্লেশ নাশ কর মা হেসে
কোজাগরী পূর্ণিমা আন মা
দুঃখের আঁধার রাতে॥

আন্ কল্যাণ শান্তি শ্রী জননী কমলা,
এ অভাবের সংসারে থাক মা হয়ে অচঞ্চলা।

রূপ দে মা যশ দে, দে জয়,
অভয় পদে দে মা আশ্রয় ;
ধরা ভরবে শস্যে ফুলে ফলে
মা তোর আসার সাথে॥

৩২৫

এ দেবদাসীর পূজা লও হে ঠাকুর।
দয়া কর, কথা কও, হয়ো না নিঠুর॥

লহ মান অভিমান, দেহ প্রাণ মন,
মম প্রেম-ধূপ নাও রূপচন্দন,
এই লহ আভরণ চুড়ি-কঙ্কণ,
চোখের দৃষ্টি ? নাও কণ্ঠের সুর॥

আজ শেষ করে আপনারে দিব তব পায়
চাও চাও মোর কাছে যাহা সাধ যায়।

কহিবে না কথা কি গো তুমি কিছুতেই ?
আরতির থালা তবে ফেলে দিনু এই।
নাচিব না, বাজুক না মৃদঙ্গ তাল
খুলিয়া রাখিনু এই পায়ের নূপুর॥

৩২৬

লক্ষ্মী মা গো এসো ঘরে
সোনার ঝাঁপি লয়ে করে।
কমল বনের কমল গো
বিহরে হৃদি-কমল পরে॥

কোজাগরী পূর্ণিমাতে
দাঁড়াও আকাশ আঙিনাতে,
মা গো তোমার লক্ষ্মী-শ্রী
জ্যোৎস্না-ধারায় পড়ুক ঝরে॥

চঞ্চলা গো এই ভবনে
থাকো অচঞ্চলা হয়ে,
দারিদ্র্য আর অভাব যত
দূর হোক মা তোর উদয়ে।
সুমঙ্গলা দুঃখ-হরা
অমৃত দাও পাত্র-ভরা,
ঐশ্বর্য উপচে পড়ুক
হরি-প্রিয়া তোমার বরে॥

৩২৭

দেশ গৌড়-বিজয়ে দেবরাজ
গগনে এলো বুঝি সমর-সাজে।
তাহারি মেঘ-মৃদঙ্গ গুরু গুরু
আষাঢ় প্রভাতে সহসা বাজে॥

গহন কৃষ্ণ ঐরাবত-দল
রবিরে আবরি ঘিরিল নভতল।

হানে খরশর বৃষ্টি ধারা-জল
পবন-বেগে প্রতি ভবন-মাঝে॥
বনের এলোকেশ বিজলী-পাশে
বাঁধিয়া দেব্-সেনা অট্টহাসে।
শ্যামল গৌড়ের অমল হাসি
শস্যে-কুসুমে ওঠে প্রকাশি।
অঙ্গে তাহার আঘাত রাশি
দেব-আশীর্বাদ হয়ে বিরাজে॥

৩২৮

ভারত আজিও ভোলেনি বিরাট
মহাভারতের ধ্যান।
দেশ হারায়েছে—হারায়নি তার
আত্মা ও ভগবান॥

তাহার ক্ষাত্র শক্তি গিয়াছে,
প্রেম ও ভক্তি আজও বেঁচে আছে,
আজিও পরম ধৈর্য ও বিশ্বাসে
তার আশা-দীপ জ্বালিয়া রেখেছে
সেই ভাগবত জ্ঞান ॥

দেহের জীর্ণ পিঞ্জরে তার
প্রাণে কাঁদে নিরাশায় ;
'সম্ভবামি যুগে যুগে' বাণী
ভুলিতে পারে না, হায় !

সেই আশ্বাসে আজ নব অনুরাগে
পাষাণ ভারতে বিরাট চেতনা জাগে,
জেগেছে সুপ্ত সিংহ, এসেছে
দিব্য অসি কৃপাণ ॥

৩২৯

মেঘে আর বিজুরীতে মিশায়ে
কে রচিল তনুখানি তোর !
ওরে সুন্দর নওল কিশোর ॥
যশোদার অন্তর-কামনা,
রাধিকার যত প্রেম-সাধনা—
হরণ করিলে চিত-চোর।
সুকোমল প্রেম-কিশোর ॥

কুঞ্জে ঘিরিয়া তোরে ফুল বলে ভুল করে
বনের প্রহরী গেয়ে যায় ;
রূপ দেখে ভালবেসে বনের ময়ূরী এসে
শিখী-পাখা যতনে সাজায়।

চাঁদ মুখাখানি চেয়ে
চাঁদ বুঝি লাজ পেয়ে
ছুটে যায় আপনি চকোর।
অপরূপ রূপ কিশোর।
সুন্দর নওল কিশোর ॥

৩৩০

মুখে তোমার মধুর হাসি
হাতে কুটিল ফাঁসি।
সুন্দর চোর, চিনি তোমায়,
তবু ভালবাসি॥

শত ব্রজে কেঁদে মরে
শত রাধা তোমার তরে,
কত গোকুল ডুবলো অকূল
আঁখির নীরে ভাসি॥

কত নারীর মন গেঁথে, নাথ,
পরলে বন-মালা,
যমুনাতে ডুবালে শ্যাম,
কত কুলের বালা।

দেখাও আসল হাত দু'খানি—
করাল গদা-চক্রপাণি,
তব এ দুটি হাত ছলনা, নাথ,
বাজাও যে হাতে বাঁশি॥

৩৩১

নিঠুর কপট সন্ন্যাসী—ছি, ছি,
লাজের নাহি ক লেশ।
এক দেশ তুমি জ্বালাইয়া এলে
জ্বালাইতে আর দেশ॥

নীলাচলে এসে রাজ-রাজ হয়ে
নদীয়া গিয়াছ ভুলে,
কত কূলে তুমি কালি দিয়া শেষে
আসিলে সাগর-কূলে।
(ওহে গুণের সাগর আসিলে সাগর-কূলে।)

কোন্ কুব্জায় কু-বুঝাইয়া—
নদীয়ার চাঁদে আনিলে হরিয়া,
কারে কাঁদাইয়া পাপক্ষয় লাগি'
মুড়ালে মাথার কেশ ॥

তোমারে দণ্ড দিল কে, ওহে দণ্ডধারী,
তোমার হাতে দণ্ড দিল কে।
কোন্ সে নদীয়া-বাসিনীর লাগি'
যৌবনে তুমি হয়েছ বিবাগী,
নব-যৌবনে সে বিষ্ণুপ্রিয়া
ধরেছে যোগিনী-বেশ ॥

৩৩২

ব্রজপুর-চন্দ্র পরম সুন্দর, কিশোর লীলা-বিলাসী—
সখি গো, আমি তারই চিরদাসী।
অমৃত-রস-ঘন শ্যামল-শোভা, প্রেম-বৃন্দাবন-বাসী—
সখি গো, আমি তারই চিরদাসী ॥

চাঁচর চিকুরে শিখী-পাখা যার,
গলে দোলে বন-কুসুম হার,
ললাটে তিলক, কপোলে অলকা
অধরে মৃদু মৃদু হাসি ॥
মকর কুন্তল দোলে শ্রবণে,
বোলে মণি-মঞ্জীর রাতুল চরণে,
চির অশান্ত, চপল কান্ত—
বিশ্ব সে রূপ-পিয়াসী ॥

বক্ষে শ্রীবৎস—কৌস্তুভ শোভে,
করে মুরলী বোলে মধুর রবে ;
পীত বসনধারী সেই মাধবে
যেন যুগে যুগে ভালবাসি ॥

৩৩৩

বনমালীর ফুল জোগালি বৃথাই, বনলতা !
বনের ডালায় কুসুম শুকায়, বনমালী কোথা ॥

শুকনো পাতার শুনে নূপুর
চমকে ওঠে বনের ময়ূর,
রাস নাই আজ নিরাশ ব্রজে গভীর নীরবতা ॥

যমুনা-জল উজান বেয়ে
কদম-তলে আসি
ভাটিতে যায় ফিরে, নাহি
শুনে শ্যামের বাঁশি।

তমাল ডালে ঝুলনা আর
গোপিনীরা বাঁধেনি এবার,
শ্রাবণ এসে কেঁদে শুধায় ঘনশ্যামের কথা ॥

৩৩৪

তুমি যদি রাধা হতে শ্যাম !
আমারি মতন দিবস-নিশি
জপিতে শ্যাম-নাম ॥
কৃষ্ণ-কলঙ্কেরই জ্বালা
মনে হত মালতীর-মালা,
চাহিয়া কৃষ্ণ-প্রেম জনমে জনমে
আসিতে ব্রজধাম ॥
কত অকরুণ তব বাঁশরির সুর—
তুমি হইলে শ্রীমতি ব্রজকুলবতী
বুঝিতে নিঠুর ॥

তুমি যে কাঁদনে কাঁদায়েছে মোরে—
আমি কাঁদাতাম তেমনি করে,
বুঝিতে—কেমন লাগে এই গুরু-গঞ্জনা,
এ প্রাণ-পোড়ানি অবিরাম ॥

৩৩৫

নীল যমুনা সলিল কান্তি
চিকন ঘনশ্যাম।
তব শ্যামরূপে শ্যামল হ'ল
সংসার ব্রজধাম॥

রৌদ্রে পুড়িয়া তাপিতা অবনী
চেয়েছিল শ্যাম–স্নিগ্ধা লাবণী ;
আসিলে অমনি নবনীত তনু
ঢলঢল অভিরাম॥
চিকন ঘনশ্যাম॥
আধেক বিন্দু রূপ তব দুলে
ধরায় সিন্ধুজল,
তব ছায়া বুকে ধরিয়া সুনীল,
হইল গগনতল।

তব বেণু শুনি, ওগো বাঁশুরিয়া,
প্রথম গাহিল কোকিল পাপিয়া,
হেরি কান্তার–বন–ভুবন ব্যাপিয়া
বিজড়িত তব নাম।
চিকন–ঘনশ্যাম॥

৩৩৬
নারায়ণী—ত্রিতাল

নারায়ণী উমা খেলে হেসে হেসে
হিম–গিরির বুকে পাহাড়ী বালিকা–বেশে॥
গিরিগুহা হতে জ্যোতির ঝরণা
ছুটে চুলে যেন চলচরণা,
তুষার–সায়রে সোনার কমল
যেন বেড়ায় ভেসে॥
খেলে হেসে হেসে।

মাধবী চাঁদ উঠে
কৈলাস চূড়ে ;
খেলা ভুলিয়া যায়,
অনিমেষ চোখে চায়
পাষাণ প্রতিমা-প্রায়
সেই সুদূরে।

সতীহারা যোগী পাগল শঙ্করে
মনে পড়িয়া তার নয়নে বারি ঝরে ;
শিব-সীমন্তিনী পাগলিনী-প্রায়
'শিব শিব' বলে ধায় মুক্তকেশে॥

৩৩৭

খেলে নন্দের আঙিনায়
আনন্দ দুলাল।
রাঙা চরণে মধুর সুরে
বাজে নূপুর-তাল॥

নবীন নাটুয়া বেশে
নাচে কভু হেসে হেসে,
যশোমতীর কোলে এসে
দোলে কভু গোপাল॥
'ননী দে' বলিয়া কাঁদে
কভু রোহিণী-কোলে,
জড়ায়ে ধরে কদম তরু,
তমাল-ডালে দোলে।

দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে
বাজায় মুরলী লয়ে,
কভু সে চরায় ধেনু
বনের রাখাল॥

৩৩৮

আমি কুসুম হয়ে কাঁদি কুঞ্জবনে,
সুন্দর শ্যাম হে।
আমি মরিতে চাহি ঝরি তব চরণে ;
সুন্দর শ্যাম হে॥

মোর ক্ষণিক এ জীবন-নিশি শেষে
প্রিয় ঝরে যাবে গো স্রোতে ভেসে ;
বঁধু কাছে এসে ছুঁয়ো ভালবেসে,
জাগায়ো প্রেম-মধু গোপন মনে ;
সুন্দর শ্যাম হে।

তব চরণ পরশ দিও মনোহর ;
মোর এ তনু রঙে রসে পূর্ণ কর ;
আমি তোমার বুকে রব পরম সুখে,
ঝরিব, প্রিয়, চাহি তব নয়নে ;
সুন্দর শ্যাম হে॥

মোর বিদায়-বেলা ঘনায়ে আসে ;
মোর প্রাণ কাঁদে মিলন-পিয়াসে ;
এই বিরহ মম, ওগো প্রিয়তম,
মিটাবে সে কোন্ শুভলগনে,
সুন্দর শ্যাম হে॥

৩৩৯

বিজলী খেলে আকাশে কেন—
কে জানে গো, কে জানে।
কোন চপলের চকিত চাওয়া
চমকে বেড়ায় দূর বিমানে॥

মেঘের ডাকে সিন্ধু-কূলে
অশান্ত স্রোত উঠলে দুলে ;
সজল ভাষায় শ্যামল যেন
কইল কথা কানে কানে॥

বারি-ধারায় কাঁদে বুঝি
মোর ঘনশ্যাম মোরে খুঁজি ;
আজ বরষায় দুখের রাতে
বন্ধুরে মোর পেলাম প্রাণে

৩৪০

মম বন-ভবনে ঝুলন-দোলনা
দে দুলায়ে উতল পবনে।
মেঘ-দোলা দোলে বাদল গগনে॥

আয় ব্রজের ঝিয়ারী পরি সুনীল শাড়ি
নীল কমলকুঁড়ি দুলায়ে শ্রবণে॥

নবীন ধানের মঞ্জরী কর্ণে
তপ্ত বক্ষ ঢাকি শ্যামল পর্ণে
ওড়না ছাপায়ে রাঙা রামধনু বর্ণে
আয় প্রেম-কুমারীরা আয় লো।
উদাসী বাঁশির সুরে ডাকে শ্যামরায় লো॥

ঝরিবে আকাশে অবিরল বৃষ্টি,
শ্যাম সখা সাথে হবে শুভদৃষ্টি
এই ঝুলনের মধু-লগনে॥

৩৪১

রাধাকৃষ্ণ নামের মালা
জপ দিবা নিশি নিরালা॥

অগতির গতি গোকুলের পতি
শ্রীকৃষ্ণের ভক্তি দেয় যে শ্রীমতি
ভব-সাগরের কৃষ্ণনাম ধ্রুব জ্যোতি
(সেই) কৃষ্ণের প্রিয়া ব্রজবালা॥

পাপ তাপ হবে দূর হরির নামে
শ্রীমতি রাধা যে হরির বামে
ঐ নাম জপি যাবি গোলকধামে
রাধা নাম হবে দুঃখ-জ্বালা॥

সাধনে সিদ্ধি হবে
রাধা বলে ডাক,
কৃষ্ণ-মূরতি হৃদি-মন্দরে রাখ,
জপরে যুগল নাম রাধাশ্যাম,
রাধাশ্যাম
আঁধার জগৎ হবে আলা॥

৩৪২

রাধা শ্যাম কিশোর প্রিয়তম কৃষ্ণ গোপাল,
বনমালী ব্রজের রাখাল।
কৃষ্ণ গোপাল, শ্রীকৃষ্ণ গোপাল, শ্রীকৃষ্ণ গোপাল॥

কভু রাম রাঘব কভু শ্যাম মাধব
কভু সে কেশব যাদব ভূপাল॥

যমুনা-বিহারী মুরলীধারী
বৃন্দাবনে সখা গোপীমনহারী।
কভু মথুরাপতি কভু পার্থ-সারথি,
কভু ব্রজে যশোদা আনন্দ-দুলাল।

দোলে গলে তার মন-বন-ফুলহার,
বাজে চরণ নূপুর গ্রহ-তারকার,
কোটি গ্রহ-তারকার।
কালিয়-দমন কভু, করাল মুরারি,
কাননচারী শিখী-পাখাধারী,
শ্যামল সুন্দর গিরিধারী-লাল
কৃষ্ণ গোপাল, শ্রীকৃষ্ণ গোপাল, শ্রীকৃষ্ণ গোপাল॥

৩৪৩

শুক-সারী সম তনু মন মম
নিশিদিন গাহে তব নাম।
শুক-তারা সম ছলছল আঁখি
পথ চেয়ে থাকি ঘনশ্যাম॥

হে চির সুন্দর, আধো রাতে আসি
বল বল কে বাজায় আশার বাঁশি,
কেন মোর জীবন-মরণ সকলি
তব শ্রীচরণে সঁপিলাম॥

কেন গোপন রোদনের যমুনায়
জোয়ার আসে?
কেন নব নীরদ মায়া ঘনায়
হৃদি-আকাশে।

দেখা যদি নাহি দেবে কেন মোরে ডাকিলে,
কেন, অনুরাগ-তিলক ললাটে আঁকিলে?
কেন কুহু কেকা সম বিরহ অভিমান
অন্তরে কাঁদে অবিরাম॥

৩৪৪

শ্রীকৃষ্ণ মুরারী গদাপদ্মধারী।
মধুবন-চারী গিরিধারী
ত্রিভুবন-বিহারী॥
লীলা-বিলাসী গোলকবাসী
'রাধা-তুলসী প্রেম-পিয়াসী
মহা বিরাট বিষ্ণু ভূ-ভার হরণকারী॥

নব নীরদ কান্তি-শ্যাম
চির কিশোর অভিরাম,
রসঘন আনন্দরূপ
মাধব বনোয়ারী॥

৩৪৫

শ্রীকৃষ্ণরূপের করো ধ্যান অনুক্ষণ
হবে নিমেষে সংসার–কালীয়দমন ॥

নব–জলধর শ্যাম
রূপ যাঁর অভিরাম
(যাঁর) আনন্দ ব্রজধাম লীলা–নিকেতন ॥

বিদ্যুৎ বর্ণ পীতাম্বরধারী,
বনমালা–বিভূষিত মধুবনচারী ;
গোপ–সখা গোপী–বঁধু মনোহারী।
নওল–কিশোর তনু মদনমোহন ॥

৩৪৬

সখি, সে হরি কেমন বল্।
নাম শুনে যার এত প্রেম জাগে
চোখে আনে এত জল ॥

সখি সে কি আসে এই পৃথিবীতে
গাহি রাধা নাম বাঁশরীতে ?
যার অনুরাগে বিরহ–যমুনা হয়ে ওঠে চঞ্চল ॥
তারে কি নামে ডাকিলে আসে,
কোন রূপ কোন্ গুণ পাইলে সে
রাধা সম ভালোবাসে ?
সখি শুনেছি সে নাকি কালো,
জ্বালে কেমনে সে এত আলো ;
মায়া ভুলাইতে মায়াবী সে না কি
করে গো মায়ার ছল ॥

৩৪৭

হে প্রবল–প্রতাপ দর্পহারি, কৃষ্ণমুরারি।
শরণাগত আর্ত–পরিত্রাণ–পরায়ণ
যুগ–যুগ–সম্ভব নারায়ণ দানবারি ॥

ভূ-ভার হরণে এস জনার্দন হৃষিকেশ,
কল্কীরূপে অধর্ম নিধনে এস দনুজারি,
কংসারি, গিরিদারী ডাকে ভয়ার্ত নরনারী ॥

দুর্বল দীনের বন্ধু, জনগণ-ত্রাতা
নিঃসের সহায় পরমেশ, বিশ্ব-বিধাতা।
তিমির-বিদারী এস মহাভারত-বিহারী ॥

এস উৎপীড়িতের নীরব বেদনে এস,
এস বীরের আত্মদানে প্রাণ-উদ্বোধনে এস,
দেশ-দ্রৌপদীর লজ্জাহারী, দৈত্য-গর্ব-খর্বকারী
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ॥

৩৪৮

আমার মন যারে চায় সে বা কোথায় গো
সখি, পাই না গো তারে।
আমার মনের দুঃখ সে বিনে কেউ জানে না রে ॥
কৃষ্ণ প্রেম-বিরহানলে ঘষিয়া ঘষিয়া জ্বলে গো,
অনল জ্বলে গেল দ্বিগুণ, জ্বলে নিভে না রে।

না পোলাম সেই বন্ধুর দেখা,
বসে কান্দি একা একা গো ;
আমার মন যে কেমন হল
রয় না ঘরে ॥

আমার যে অন্তরের ব্যথা
মুখ ফুটে না বলি কথা গো—
আমার প্রাণ বিদরে, বুক চিরে
দুঃখ দেখাই কারে ॥

৩৪৯

কি জানি পইড়াছে বন্ধু মনে
বুক ফেটে যায় বন্ধুর বিহনে॥
সখি গো, যাইতে যমুনার জলে
দেখা হলো কদমতলে,
কি কারণে চাইল না মোর পানে।
আমায় দেখে বাঁকা আঁখি
ফিরাইল কেন॥

যার সনে যার ভালবাসা
ক'দিন থাকে মনের গোসা,
বাঁচি না ঐ প্রাণবন্ধু বিহনে।
রাস্তাঘাটে দেখা হলে
ডাক দিলে না শোনে॥

তার সনে কইরে পিরীতি
রইল খোঁটা গেল জাতি,
জলাঞ্জলি দিলাম কুলমানে।
তার জন্য কান্দি না সখি
কান্দি তার গুণে॥

৩৫০

কালো পাহাড় আলো করে কে,
ও কে কালো শশী?
নিতুই এসে লো বাজায় বাঁশি
কদম তলায় বসি॥

সই লো, মানা কর না ওকে,
ও চায় না যেন অমন চোখে,
ওর চাউনি দেখে অল্প বয়সে হলাম দোষী।
গুরুজনরে সে ভয় করে না,
বাঁকিয়ে ভুরু ডাকে সে ডাকে,
আমায় সে ডাকে;
রাতের বেলা চোরের মত চাহে
বেড়ার ফাঁকে লো—
আমি মরেছি সই প'রে তাহার
বনমালার রশি॥

৩৫১

বাজলো শ্যামের বাঁশি বিপিনে
বাজলো শ্যামের বাঁশি।
কত ছলেবলে কলকৌশলে গো
কালাচাঁদকে দেখে আসি॥
চল চল ত্বরা করি'
চল চল সহচরি ;
ব্যাকুল হয়েছে হরি
দাসীর কারণে॥

নীলপদ্মে রাধাপদ্মে গো
আমরা করব যেয়ে মিশামিশি।
বেশ-ভূষণের কাজ কি আছে
গুরুজনে জানবে পাছে
জানলে হবো দোষী॥

বনে শেষে যাওয়া হয় কি না হয় গো
(আমরা) লোক-সমাজে হব দোষী॥

৩৫২

এস প্রাণে গিরিধারী, বন-চারী,
গোপী-জন-মন-হারী।
চঞ্চল গোকুল-বিহারী॥

লহ নব প্রীতির কদম-মালা।
আনন্দ-চন্দন প্রেম-ফুল-ডালা।
নয়নে আরতি প্রদীপ জ্বালা
অঞ্জলি লহ আঁখি-বারি॥

প্রণয়-বিহ্বলা প্রাণ-রাধিকা
পরেছে তব নাম-কলঙ্ক-টিকা।
অথির অনুরাগ গোপ-বালিকা
চাহে পথ তোমারি॥

৩৫৩

এল নন্দের নন্দন নব-ঘনশ্যাম।
এল যশোদা-নয়নমণি নয়নাভিরাম॥

প্রেম রাধা-রমণ নব বঙ্কিম ঠাম,
চির রাখাল গোকুলে এল গোলক ত্যজি'।
কৃষ্ণজী, কৃষ্ণজী, কৃষ্ণজী, কৃষ্ণজী॥

ভয়-ত্রাতা এল কারা-ক্লেশ নাশি'
কাজল নয়নে এল উজ্জ্বল শশী।
মুছাতে বেদন ব্যথা তিমিরহারী
ওই বিজলী ঝলকে এল ঘন গরজি'।
কৃষ্ণজী, কৃষ্ণজী, কৃষ্ণজী, কৃষ্ণজী॥

হে বিরাট তব মঙ্গল আঁখিতলে
যত পুষ্প ফোটে প্রেম-অশ্রুজলে।
অরবিন্দ পদে আর কিছু না চাহি যেন
গোপন প্রেমে মন রহে মজি'।
কৃষ্ণজী, কৃষ্ণজী, কৃষ্ণজী, কৃষ্ণজী॥

৩৫৪

দিও বর, হে মোর স্বামী, যবে যাই আনন্দ-ধামে
যেন প্রাণ ত্যজি, হে স্বামী, শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ নামে॥

ভাসি যেন আমি ভাগীরথী-নীরে
অথবা প্রয়াগে যমুনার তীরে,
অন্তিম সময়ে হেরি আঁখি-নীরে
যেন মোর রাধা শ্যামে॥

ব্রজ গোপালের শুনায়ে নূপুর
মরণ আমার করিও মধুর;
বাজায়ো বাঁশি, দাঁড়ায়ো আসি'
রাধারে লইয়া বামে॥

৩৫৫

দোলে ঝুলন-দোলায় দোলে নওল কিশোর
গিরিধারী হরষে।
মৃদঙ্গ বাজে নভোচারী মেঘে
বারিধারা রুমুঝুমু বরষে॥

নাচে ময়ূর নাচে কুরঙ্গ,
কাজরী গাহে বন-বিহঙ্গ,
যমুনা-জলে বাজে জলতরঙ্গ,
শ্যামসুন্দর-রূপ দরশে॥

৩৫৬

ব্রজ-দুলাল ঘনশ্যাম মোর
হৃদে কর বিহার হে॥

নব অনুরাগের জ্বালায়ে বাতি
অঙ্গে অঙ্গে রাখি তব শেজ পাতি'
গাঁথি অশ্রু-মোতিহার হে॥
আরতি-প্রদীপ আঁখিতে জ্বালায়ে রাখি
পথ-পানে চাহি বার বার হে।
নিবেদন করি নাথ তব চরণে
নিত্য পূজা-উপচার হে॥

বিরহ-গন্ধ-ধূপ বেদনা-চন্দন
পূজাঞ্জলি আঁখি-ধার হে,
দেবতা এস খোল দ্বার হে॥

৩৫৭

ব্রজে আবার আসবে ফিরে' আমার ননী-চোরা,
কাঁদিস নে গো তোরা।
স্বভাব যে ওর লুকিয়ে থেকে কাঁদিয়ে পাগল করা।
কাঁদিস নে গো তোরা॥

আমি যে তার মা যশোদা,
সে আমারেই কাঁদায় সদা,
যেই কাঁদি, সে যায় যে ভুলে বনে বনে ঘোরা।
কাঁদিস নে গো তোরা॥

মথুরাতে আমার গোপাল রাজা হল না কি?
সেখানে যায়, সে রাজা হয়, ভুল দেখেনি আঁখি॥

সে রাজা যদি হয়েই থাকে
তাই বলে কি ভুলবে মাকে?
আমি হব রাজ-মাতা, তাই ওর রাজবেশ পরা।
কাঁদিস নে গো তোরা॥

৩৫৮

শ্যাম-সুন্দর গিরিধারী।
মানস-মধুবনে মধুমাধবী সুরে
মুরলী বাজাও, বনচারী॥

মধুরাতে হে হৃদয়েশ
মাধবী চাঁদ হয়ে এসো,
হৃদয়ে তুলিও ভাবেরই উজান
রস-যমুনা-বিহারী॥

অন্তর মন্দিরে প্রীতি-ফুলশয্যায়
বিলাস করো লীলা-বিলাসী;
আঁখির প্রদীপ জ্বালি প্রিয়ের জাগিয়া রব
শ্যাম, তব রূপ-পিয়াসী।

কত সাধ-আশা গেল ঝরিয়া,
পরো তাই গলে মালা করিয়া;
নূপুর করিব তব চরণে গাঁথি
মম নয়নের বারি॥

৩৫৯

রাধা-তুলসী, প্রেম-পিয়াসী,
গোলোকবাসী শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ।
নাম জপ মুখে, মূরতি রাখ বুকে,
ধেয়ানে দেখ তারি রূপ মোহন॥

অমৃত রসঘন কিশোর-সুন্দর,
নব নীরদ শ্যাম মদন মনোহর—
সৃষ্টি প্রলয় যুগল নূপুর
শোভিত যাহার রাঙা চরণ॥

মগ্ন সদা যিনি লীলারসে,
যে লীলা-রস ভরা গোপী-কলসে,
কান্না-হাসির আলো-ছায়ার
মায়ায় যাহার মোহিত ভুবন॥

৩৬০

মোর বেদনার কারাগারে জাগো, জাগো,
বেদনাহারী হে মুরারি।
অসীম দুঃখ-ঘেরা কৃষ্ণ তিথিতে এস হে কৃষ্ণ গিরিধারী॥

ব্যথিত এ চিত দেবকীর সম
মূর্চ্ছিত পাষাণের ভারে,
ডাকে প্রাণ-যাদব, এসো এসো মাধব,
উথলিছে প্রেম আঁখিবারি॥

হৃদয়-ব্রজে মম ভক্তি-প্রীতি গোপী
জাগিয়া আছে আশায়,
কদম্ব ফুল সম উঠিছে শিহরি'
প্রেম মম শ্যাম বরষায়।

ওগো বনশীওয়ালা, তব না-শোনা বাঁশি
শোনে অনুরাগ-রাধা প্রণয়-পিয়াসী;
গোপন ধ্যানের মধুবনে তব নূপুর খনে খনে
শুনিছে কিশোর বনচারী॥

৩৬১

বর্ণচোরা ঠাকুর এল রসের নদীয়ায়—
তোরা দেখবি যদি আয়।
তারে কেউ বলে শ্রীমতী রাধা,
কেউ বা বলে শ্যামরায়॥

কেউ বা বলে তার সোনার অঙ্গে
রাধা-কৃষ্ণ খেলেন রঙ্গে,
ওগো কেউ বলে তায় গৌর-হরি,
কেউ অবতার বলে তায়॥

ভক্ত তারে ষড়্‌ভুজ
শ্রীনারায়ণ বলে,
কেউ দেখেছে শ্রীবাসের ঘরে,
কেউ বা নীলাচলে।

দুই হাতে তার ধনুর্বাণ
ঠিক যেন শ্রীরাম,
দুই হাতে তার মোহন বাঁশি—
যেন রাধা-শ্যাম;
আর দু'হাতে দণ্ড ঝুলি
নবীন সন্ন্যাসীর প্রায়॥

৩৬২

ওরে মথুরাবাসিনী, মোরে বল—
কোথায় রাধার প্রাণ,
ব্রজের শ্যামল॥

আজো রাজ-সভা মাঝে
সে আসে কি রাখাল সাজে,
আজিও তার বাঁশি শুনে
যমুনারি জল
হয় কি উতল?

পায়ে নূপুর কি পরে,
শিরে ময়ূর পাখা,
আছে শ্রীমুখে কি
অলকা-তিলক আঁকা?

'রাধা রাধা' বলে কি গো
কাঁদে সেই মায়া-মৃগ?
নারায়ণ হয়েছে সে
তোদের মথুরা এসে
মোদের চপল॥

৩৬৩

আমি গিরিধারী সাথে মিলিতে যাইব—
সুন্দর সাজে মোরে সাজায়ে দে।
লাখ যুগের পরে শুভ দিন এল
মেহেদি রঙে হাত রাঙায়ে দে॥
চন্দন-টীপ গলে মালতীর মালা
নয়নে কাজল পরায়ে দে।
অধর রাঙায়ে তাম্বুল রাগে
চরণে আলতা মাখায়ে দে॥

প্রেম নীল শাড়ি প্রীতির আঙিনা
অনুরাগ-ভূষণে বধূ সাজিয়া
হৃদয়-বাসরে মিলিব দোঁহে—
কুসুমেরই প্রেম সখি বিছায়ে দে॥

৩৬৪

হে মাধব, হে মাধব, হে মাধব!
এমন করে তোমার বিরহ কত স'ব॥

বিহনে তোমার ফুলের বনে
সুরভি নাহি সমীরণে,
বাজে না বেনু আমার মনে অভিনব॥

মাধবী আবার ফুটেছে বনে,
হায়　　মাধব রহিলে দূরে,
যমুনা শুকায়ে যমুনা বহে,
মোর　　আঁখির আকাশ জুড়ে।
তুমি বিনে আর, হে শ্যামরায়,
কে আছে আমার বসুন্ধরায়,
হায় আমার দুঃখের কথা কারে কব॥

৩৬৫

ওরে রাখাল ছেলে!
বল্　　কি রতন পেলে দিবি হাতের বাঁশি—
তোর ঐ হাতের বাঁশি
বাঁধা দিয়ে খাজু আনব ক্ষীরের নাড়ু
অমনি　　হেলে দুলে একবার নাচ রে আসি'॥

দেখ্　　মাখাতে তোর গায়ে ফাগের গুঁড়া
আমার　　আঙ্গিনাতে ঝরা কৃষ্ণচূড়া,
আমার　　গলায় হার খুলে পরাবো, আয় কিশোর,
তোর পায়ে ফাঁসি॥

যেন　　কালিদহের জলে সাপের মানিক জ্বলে
চোখের হাসি তোর ঐ চোখের হাসি,
তুই　　কি চাস্ চপল—মোরে বল, আমি মরেছি যে
তোরে ভালোবাসি।

আসিস আমার বাড়ি রাখাল, দিন ফুরালে—
আমার চুড়ির তালে দুলবি কদম-ডালে;
ছেড়ে গৃহ-সংসার, ওরে বাঁশুরিয়া,
হব চরণ-দাসী॥

৩৬৬

নন্দ-দুলাল নাচে, নাচে রে—হাতে সরের নাড়ু নিয়ে নাচে।
ব্রজের গোপাল নাচে, নাচে রে—হাতে সরের নাড়ু নিয়ে নাচে॥

হাতের নাড়ু মুখে ফেলে আড়-চোখে চায় হেলে-দুলে
আড়চোখে চায় যথায় গোপীর ক্ষীর-নবনী দই-এর হাড়ি আছে॥

শূন্য দু'হাত শূন্যে তুলে দেয় সে করতালি,
বলে "তাই, তাই, তাই"—
নন্দ পিতায় কয় ইশারায়—নাই ননী নাই।
নন্দ ধরতে গেলে যায় পিছিয়ে, মুচকি হেসে যায় এগিয়ে
যশোমতীর কাছেরে॥
যশোমতীর কাছে॥

কহে শিউরে উঠে কদম ফুল—নাচ রে গোপাল নাচ,
সারা গায়ে ঘুঙুর বেঁধে নাচে ডুমুর গাছ—
নাচ রে গোপাল নাচ;
শিমুল গায়ে গাছের সুখে কাঁটা দিয়ে ওঠে
ফুল ফোটে মোর আকাশে॥
নাচ ভুলে সে থমকে দাঁড়ায়, মার চোখে জল দেখতে সে পায় রে;
ননী মাখা দু'হাত দিয়ে চোখ মুছিয়ে লুকায় বুকের কাছে॥

৩৬৭

নাটুয়া ঠমকে যায় রহিয়া রহিয়া চায়—
কনক পুতলী রসময় রে।
যত রূপ যত বেশ নয়নে প্রেমাবেশ
(নদীয়ায়) দিনে হল চাঁদের উদয় রে॥

চাঁদ উঠেছে—
নদীয়ায় অপরূপ চাঁদ উঠেছে, চাঁদ উঠেছে
বিজলী-জড়িত যেন চাঁদের কণিকা গো,
চরণ-নখর রাঙা হিঙুল-রাগে;
মনোবনের পাখি পিয়াসে মরয়ে গো
উহারি পরশ-রস মাগে॥

অপরূপ বঙ্কিম চূড়ার টোলনে গো,
ললাট শোভিত চন্দন-তিলকে;

ইন্দু-লেখার মাঝে আবার বিন্দু যেন—
এ-সাজে এ মনোহরে সাজায়ে দিল কে,
ত্রিলোক ভুলাইতে তিলক দিল কে,
চন্দন-তিলকে এ শচী-নন্দনে সাজায়ে দিল কে॥

রতন কুঁদিয়া কে যতন করিয়া গো
নিরমিল গোরা দেহখানি ?
হবে যোগিনী তারি ধ্যানে,
মনের সহিত মোর,
এ পাঁচ পরাণী
এ পাঁচ পরাণী॥

৩৬৮

বাঁকা শ্যামল এল বন-ভবনে।
তার বাঁশির সুর শুনি পবনে॥

রাঙা সে চরণের নূপুর-রোলে রে,
আকুল এ-হৃদয় পুলকে দোলে রে,
সে নূপুর শুনি' নাচে ময়ুর
কদম-তমাল-বনে॥
বুঝি সে শ্যামের পরশ লাগিল,
আমার চরণে তাই নাচন জাগিল—
ঘিরি' শ্যামে দক্ষিণ-বামে
নেচে বেড়াই আপন মনে॥

৩৬৯

শ্রীকৃষ্ণ নাম মোর জপমালা নিশিদিন,
শ্রীকৃষ্ণ নাম মোর ধ্যান।
শ্রীকৃষ্ণ বসন, শ্রীকৃষ্ণ ভূষণ,
ধরম করম মোর জ্ঞান

শয়নে স্বপনে ঘুমে জাগরণে
মোর বিজড়িত শ্রীকৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ আত্মা মম, কৃষ্ণ প্রিয়তম
ওই নাম দেহ মন প্রাণ॥

কৃষ্ণ গলার হার, কৃষ্ণ নয়ন-ধার,
এ হৃদয় তারি ব্রজধাম।
ঐ নাম-কলঙ্ক ললাটে আঁকিয়া গো
ত্যজিয়াছি লাজ-কূল-মান॥

৩৭০

আমি কূল ছেড়ে চলিলাম ভেসে—
সই বলিস ননদীরে—
শ্রীকৃষ্ণ নামের তরণীতে
প্রেম যমুনার তীরে॥

সংসারে মোর মন ছিল না,
তবু মানের দায়ে
আমি ঘর করেছি সংসারেরই
শিকল বেঁধে পায়ে ;
শিক্‌লি-কাটা পাখি কি আর
পিঞ্জরে সই ফিরে॥

বলিস্ গিয়ে—কৃষ্ণ নামের
কলসি বেঁধে গলে
ডুবেছে রাই কলঙ্কিনী
কালিদহের জলে।

কলঙ্কেরই পাল তুলে সই
চললেম অকূল পানে—
নদী কি সই থাকতে পারে
সাগর যখন টানে !
রেখে গেলাম এই গোকুলে
কুলের বৌ-ঝিরে॥

৩৭১

আমি বাউল হলাম ধূলির পথে
লয়ে তোমার নাম
আমার একতারাতে বাজে শুধু
তোমারই গান, শ্যাম ॥

নিভিয়ে এলাম ঘরের বাতি,
এখন তুমিই সাথের সাথী ;
আমি যেখানে যাই সেই সে এখন
আমার ব্রজধাম ॥

আমি আনন্দ-লহরী বাজাই
নূপুর বেঁধে পায়ে,
শ্রান্ত হলে জুড়াই তনু
বনবীথি-বটের ছায়ে।

ভাবনা আমার তুমি নিলে,
আমায় ভিক্ষা-পাত্র দিলে ;
কখন তুমি আমার হবে,
পুরবে মনস্কাম ॥

৩৭২

ওরে নীল-যমুনার জল বল্ রে, মোরে বল্—
কোথায় ঘন-শ্যাম আমার কৃষ্ণ ঘন-শ্যাম।
আমি বহু আশায় বুক বেঁধে যে এলাম ব্রজধাম ॥

তোর কোন্ কূলে কোন্ বনের মাঝে
আমার কানুর বেণু বাজে, বেণু বাজে
আমি যেথায় গেলে শুনতে পাবো 'রাধা' 'রাধা' নাম ॥

আমি শুধাই ব্রজের ঘরে ঘরে—কৃষ্ণ কোথায় বল,
কেন কেউ কহে না কথা, হেরি সবার চোখে জল।

বল্ রে, আমার শ্যামল কোথায়—
কোন্ মথুরায় কোন দ্বারকায়,
বল্ যমুনা বল্—
বাজে বৃন্দাবনের কোন্ পথে তার নূপুর অভিরাম॥

৩৭৩

গগনে কৃষ্ণ মেঘ দোলে—
কিশোর কৃষ্ণ দোলে বৃন্দাবনে ;
থির সৌদামিনী রাধিকা দোলে
নবীন ঘনশ্যাম সনে।
দোলে রাধাশ্যাম ঝুলন-দোলায়—
দোলে আজি শাওনে॥

পরি' ধানী-রং ঘাঘরি, মেঘ-রং ওড়না
গাহে গান, দেয় দোল গোপিকা চল-চরণা ;
ময়ূর নাচে পেখম খুলি' বন-ভবনে॥

গুরু গম্ভীর মেঘ-মৃদঙ্গ বাজে
আঁধার অম্বর তলে,
হেরিছে ব্রজের রস-লীলা
অরুণ লুকায়ে মেঘ-কোলে।
মুঠি মুঠি বৃষ্টির ফুল ছুড়ে হাসে,
দেব-কুমারীরা হেরে অদূর আকাশে,
জড়াজড়ি করি' নাচে তরু-লতা উতলা পবনে॥

৩৭৪

জাগো জাগো গোপাল, নিশি হল ভোর।
কাঁদে ভোরের তারা হেরি' তোর ঘুম-ঘোর॥

দামাল ছেলে তুই জাগিসনি তাই
বনে জাগেনি পাখি, ঘুমে মগ্ন সবাই ;
বাতাস নিশাস ফেলে খুঁজিছে বৃথাই,
তোর বাঁশরি লুটায়ে কাঁদে আঙিনায় মোর॥

তুই উঠিস নি বলে দেখ রবি ওঠেনি,
ঘরে আনন্দ নাই, বনে ফুল ফোটেনি।

ধোয়াবে বলিয়া তোর চোখের কাজল
স্থির হয়ে আছে ঘাটে যমুনার জল ;
অঞ্চল-ঢাকা মোর, ওরে চঞ্চল,
আমি চেয়ে আছি কবে ঘুম ভাঙিবে তোর॥

৩৭৫

রাস-মঞ্চে দোল দোল লাগে রে,
জাগে নৃত্যের দোল।
আজি রাস-নৃত্যে নিরাশ চিত্ত জাগে রে, জাগে নৃত্যের দোল॥
চল যুগলে যুগলে বন-ভবনে,
আনো নিথর হেমন্ত হিম পবনে
চঞ্চল হিল্লোল॥

শত রূপে প্রকাশ আজি শ্রীহরি,
শত দিকে শত সুরে বাজে বাঁশরি ;
সকল গোপিনী আজি রাই কিশোরী,
যাবে তৃষ্ণা, পাবে কৃষ্ণের-কোল॥

তরল তাল ছন্দ-দুলাল
নন্দদুলাল নাচে রে,
অপরূপ রঙ্গে নৃত্য-বিভঙ্গে
অঙ্গের পরশ যাচে রে।
মানস-গঙ্গা অধীর তরঙ্গা—
প্রেম যমুনা হল রে উতরোল॥

৩৭৬

বাঁশিতে সুর শুনিয়ে নূপুর রুনঝুনিয়ে
এলে আজি বাদল প্রাতে।
কদম কেশর ঝুরে পুলকে তোমার পায়ে,
তমাল বিছায় ছায়া শ্যামল আদুল গায়ে,

অলকা পথ বাহি' আসিলে মেঘের নায়ে,
নাচের তালে বাজিয়া ওঠে চুড়ি কাঁকন হাতে॥

ধানী রঙের শাড়ি ফিরোজা রঙ উত্তরীয়
পরেছি এ শ্রাবণ-দোলাতে দুলিতে, প্রিয় !
কেশের কমল-কলি বনমালী তুলিয়া আদরে
চাঁচর চিকুরে আপনি পরিও,
তোমার রূপের কাজল পরায়ো আমার আঁখিপাতে॥

৩৭৭

কালো জল ঢালিতে সই
চিকন কালারে পড়ে মনে।
কালো মেঘ দেখে শাওনে সই
পড়লো মনে কালো-বরণে॥
কালো জলে দিঘির বুকে
কালায় দেখি নীল শালুকে,
আমি চমকে উঠি ডাকে যখন
কালো কোকিল বনে॥

কলমি লতার চিকন পাতায়
দেখি আমার শ্যামে লো,
পিয়া ভেবে দাঁড়াই গিয়ে
পিয়াল গাছের বামে লো।
উড়ে গেলে দোয়েল পাখি
ভাবি কালার কালো আঁখি,
আমি নীল শাড়ি পরিতে নারি
কালারই কারণে লো কালারি কারণে॥

৩৭৮

মোর ঘনশ্যাম এলে কি আজ
কালো মেঘের বেশে।
দূর মথুরার নীল-যমুনা
পার হয়ে মোর দেশে॥
এলে কালো মেঘের বেশে॥

বৃষ্টিধারায় টাপুর টুপুর
বাজে তোমার সোনার নূপুর,
বিজলিতে সেই চপল আঁখির
চমক বেড়ায় হেসে॥

তোমার তনুর সুগন্ধ পাই
জুঁই-কেতকীর ফুলে,
ওগো রাজাধিরাজ ব্রজে আবার
এলে কি পথ ভুলে।

মেঘ-গরজনের ছলে
ডাকো 'রাধা' 'রাধা' বলে,
বাদল হাওয়ায় তোমার বাঁশির
বেদন যে মেশে॥

৩৭৯

গোঠের রাখাল, বলে দে রে
কোথায় বৃন্দাবন।
যথা রাখাল রাজা গোপাল আমার
খেলে অনুক্ষণ॥
কোথায় বৃন্দাবন॥

যথা দিনে-রাতে মিলন-রাসে
চাঁদ হাসে রে চাঁদের পাশে,
যার পথের ধুলায় ছড়িয়ে আছে
শ্রীহরি চন্দন॥

যথা কৃষ্ণ নামের ঢেউ ওঠে রে
সুনীল যমুনায়,
যার তমাল বনে আজো মধুর
কানুর নূপুর শোনা যায়।
আজো যাহার কদম-ডালে
বেণু বাজে সাঁঝ-সকালে,
নিত্য লীলা করে যেথায়
মদন-মোহন॥

৩৮০

তোমার কালো রূপে যাক না ডুবে
সকল কালো মম,
হে কৃষ্ণ প্রিয়তম—
ঐ কালো রূপে থাক না ডুবে
সকল কালো সম।
নীল সাগর-জলে হারিয়ে যাওয়া
নদীর জলের সম ॥
হে কৃষ্ণ প্রিয়তম।

কৃষ্ণ নয়ন-তারায় যেমন
আলোকিত হেরি ভুবন,
তেমনি কালো রূপের জ্যোতি
দেখাও নিরুপম ॥

যাক্ মিশে আমার পাপ-গোধূলি
তোমার নীলাকাশে,
মোর কামনা যাক্ ধুয়ে তোমার
রূপের শ্রাবণ মাসে।

তোমার আমার মিলন থাকুক
যেমন নীল সলিলে সুনীল শালুক,
তুমি জড়িয়ে থাক আমার হিয়ায়
গানের সুরেরই সম ॥

৩৮১

দোলে বন-তমালের ঝুলনাতে কিশোরী-কিশোর।
চাহে দুঁহু দোঁহার মুখপানে চন্দ্র ও চকোর
যেন চন্দ্র-চকোর
প্রেম-আবেশে বিভোর ॥

মেঘমৃদঙ্গ বাজে সেই ঝুলনের ছন্দে,
রিমঝিম বারিধারা ঝরে আনন্দে।
হেরিতে যুগল শ্রীমুখ চন্দে
গগন ঘেরিয়া এল ঘন-ঘটা ঘোর ॥

নব-নীরদ দরশনে চাতকিনী-প্রায়
ব্রজ-গোপিনী শ্যামরূপে তৃষ্ণা মিটায়,
গাহে বন্দনা-গান দেবদেবী অলকায়
ঝরে বৃষ্টিতে সৃষ্টির প্রেমাশ্রু-লোর॥

৩৮২

নাচো শ্যাম নটবর কিশোর মুরলীধর
অঙ্গ মিশায়ে মম অঙ্গে।
তোমার নাচের শ্রী ফুটুক আমার এই
নৃত্য-বিভঙ্গে॥

(মম) রক্তে বাজুক তব পায়ের নূপুর,
আমার কণ্ঠে দাও বাঁশরির সুর—
তব বাঁশরির সুর।
লীলায়িত হয়ে উঠুক এ-তনু
তোমার প্রেম-আনন্দ-তরঙ্গে॥

আমার মাঝে হরি নাচো যবে তুমি
আমি নাচি আপনা ভুলি',
সরম ভরম যায়, এই দেহ-যমুনায়
ছন্দের হিল্লোল তুলি।
মনে হয় আমি যেন রাসের রাধা
জনম জনম আমি নাচি তব সঙ্গে॥

৩৮৩

মোর শ্যাম-সুন্দর এস।
প্রেমের বৃন্দাবনে এস হে
ব্রজধাম-সুন্দর এস॥
এস হৃদয়ে হৃদয়েশ
মোর নয়নের আগে এস হে
মোর নব-অনুরাগে এস শ্যাম
কোটি-কাম-সুন্দর এস॥

রস–মানস–গঙ্গার কূলে রসরাজ এস এস হে
এস মুরলী বাজায়ে এস হে, এস ময়ূরে নাচায়ে এস হে মাধব,
মধু–বনমাঝে, এস এস হে॥

মোর মুখের ভাষায় এস, মোর প্রাণের আশায় এস,
নবীন নীরদ ঘনশ্যাম–রূপে রূপ–পিপাসায় এস,
এস মদন–মোহন শোভন অভিরাম–সুন্দর এস॥

৩৮৪

গজল

কেন বাজাও বাঁশি কালো শশী
মৃদু মধুর তানে।
ঘরে রইতে নারি, জ্বলে মরি
বাজাইও না বনে
বাঁশি আর বাজাইও না বনে॥

নিঝুম রাতে বাজে বাঁশি,
পরায় গলে প্রেম–ফাঁসি,
কেহ নাহি জানে হে শ্যাম
(আমি) মরি শুধু প্রাণে॥

রাখো রাখো ও বাঁশরি,
ওহে কিশোর–বংশীধারী,
মন নাহি মানে, হে শ্যাম,
(বঁধু) বাঁশি কি গুণ জানে॥

৩৮৫

ব্রজগোপী খেলে হোরি
খেলে আনন্দ নবঘনশ্যাম সাথে॥
রাঙা অধরে ঝরে হাসির কুমকুম
অনুরাগ–আবীর নয়ন–পাতে।

পিরীতি–ফাগ–মাখা গোরীর সঙ্গে
হোরি খেলে হরি উন্মাদ রঙ্গে।
বসন্তে এ কোন্ কিশোর দুরন্ত
রাধারে জিনিতে এল পিচকারি হাতে॥

গোপিনীরা হানে অপাঙ্গ
খরশর ভ্রূকুটি–ভঙ্গ,
অনঙ্গ আবেশে জ্বরজ্বর থরথর শ্যামের অঙ্গ।
শ্যামল তনুতে হরিত–কুঞ্জে
অশোক ফুটেছে যেন পুঞ্জে পুঞ্জে,
রং–পিয়াসী মন–ভ্রমর গুঞ্জে,
ঢালো আরো রং প্রেম–যমুনাতে॥

৩৮৬

বাদল রাতে চাঁদ উঠেছে কৃষ্ণ মেঘের কোলে রে।
ব্রজপুরে তমাল–ডালের ঝুলনাতে দোলে রে॥
নীল চাঁদ আর সোনার চাঁদে
বাঁধা বন–মালার ফাঁদে রে
এ চাঁদ হেসে আর এক চাঁদের অঙ্গে পড়ে ঢলে রে॥

যুগল শশী হেরি' গোপী কহে 'বাদলা রাতই ভালো' রে।
গোকুল এলো ব্রজে নেমে, ধরা হলো আলো রে।
দেব–দেবীরা চরণ–তলে
বৃষ্টি হয়ে পড়ে গলে রে
বেদ–গাথা সব নূপুর হয়ে
রুনুঝুনু বোলে রে॥

৩৮৭

আজ গেছ ভুলে।
আজ সে–সব কথা গেছ ভুলে।
তা ধুয়ে গেছে চোখের জলে॥

অনেকের আছে অনেক সে নাথ, জানে এই সংসার,
তোমা বিনে আর কেহ নাই সখা,
অভাগিনী রাধিকার।
তার ঘর ও বাহির সবই প্রতিকূল
সে গোকুলে থেকেও অকূলে ভাসে,
সকলের সে যে চক্ষের শূল,
তারে সবাই কলঙ্কিনী বলে॥

হরি, সকলে যাহারে ছাড়িয়াছে তারে
ঠাঁই দাও পদতলে,
হরি, ঠাঁই দাও পদতলে॥

৩৮৮

তুমি কাঁদাইতে ভালবাস
আমি তাই নিশিদিন কাঁদি। (শ্যাম)
তুমি নিত্য নূতন বেদনার ডোরে
রেখেছ আমারে বাঁধি॥
বঁধু তোমারি করে রেখেছ আমারে বাঁধি॥

যদি সংসার-কাজে ভুলে যাই
তব নাম নিতে যদি ভুলে যাই
তুমি আঘাতের ছলে পরশ দিয়া
জানাও তুমি ভোল নাই।
জানাও তুমি ভোল নাই।
তুমি যে রাধার আরাধনা, নাথ,
তুমি যে আমার সাধনা,
মিলন তোমার মধুর হে প্রিয়
অধিক মধুর বেদনা॥

৩৮৯

প্রিয়তম হে,
আমি যে তোমারি চির-আরাধিকা।
তব নাম গেয়ে প্রেম-বৃন্দাবনে
ফিরি ব্রজবালিকা॥

মম নয়ন দুটি তব দেবালয়ে
জ্বলে নিশিদিন আরতি-প্রদীপ হয়ে,
নাম-কলঙ্ক তব হরি-চন্দন মোর
গলার মালিকা॥

মোরে শরণ দাও তব চরণে,
কর অবনমিতা ;
জনমে জনমে হয়ো প্রভু তুমি
আমি হব দয়িতা।
শুধু নাম শুনি', নাথ, মনে মনে
আমি স্বয়ম্বরা হয়েছি গোপনে,
বড় সাধ প্রাণে, র'ব তোমারি ধ্যানে
হব শ্যাম-সাধিকা॥

৩৯০

মম জনম মরণের সাথী
তোমারে না ভুলি যেন দিন-রাতি॥

তোমারে না হেরি আঁধার ত্রিভুবন
নিভে যায় নয়নের বাতি।
বাতায়ন খুলিয়া চাহি পথ পানে
কাঁদি কুসুম-সেজ পাতি॥

তোমারি আশায় তেয়াগিনু সব সুখ
আর মোরে রাখিও না দূরে।
তুমি যেন ছেড় না মোরে ঘনশ্যাম
মোরে বাঁধো তব চরণ-নূপুরে॥

মীরার প্রভু তুমি পরম মনোহর
তব প্রেম-রসে রহি মাতি'
পলক না পড়ে, হরি,
হেরি যেন নিশিদিন অপরূপ তব মুখ পাতি॥

৩৯১

সখি, আমি যেন রূপ-মঞ্জরি।
যেন আমার প্রেম-তুলসীর বনে
খেলিছেন এসে শ্রীহরি॥
আমি যেন রূপ-মঞ্জরি॥

যেন লো মানস-গঙ্গার জলে
জল-লীলা মোরা করি কুতূহলে ;
মোর অঙ্গে অঙ্গে আনন্দে তাঁরি
নূপুর উঠিছে মর্মরি॥

মোর বাহু দুটি যেন বনমালা হয়ে
জড়ায়ে রয়েছে মাধবে,
যেন চাঁপা-রং মোর উত্তরী দিনু
পীতাম্বর শ্রীযাদবে।

যেন আমার হৃদয়-কমল নিঙাড়ি'
শ্রী চরণ রাঙাল বন-বিহারী,
মোর অঙ্গের লীলা-ব্রজধামে তাঁর
বেণু-রব ফেরে সঞ্চরি॥
আমি যেন রূপ-মঞ্জরি॥

৩৯২

শ্রীকৃষ্ণ নাম জপ অবিরাম
থির হও অধীর চিত্ত ওরে।
হরে কৃষ্ণ হরে, হরে কৃষ্ণ হরে,
হরে কৃষ্ণ হরে, হরে কৃষ্ণ হরে॥

পদ্মপত্রে নীর-সম চঞ্চল
যাঁহার মায়ায় চিত টলে টলমল,
তাঁহারি শরণ নে রে, প্রাণ ভরে
ডাক তাঁরি নাম ধরে॥

৩৯৩

শ্যামল তুমি শ্যাম, তাই এ ধরাধাম
সাজায়েছ শ্যাম সুষমায়।
অসীম নভোতল সুনীল ঝলমল
তব নীল তনুর আভায়॥

তরুলতা পল্লবে হেরি
তব শ্যামরূপ আছে ঘেরি,
কালো বরণ হল সাগর–নদী জল
হে কৃষ্ণ তোমারি মায়ায়॥

দুখ শোকে দুর্দিনে বরষায়
নীরদ–বরণ তব রূপ ভায় ;
বিশ্বভুবন কবে কৃষ্ণময় হবে
জাগি নাথ তাহারি আশায়॥

৩৯৪

বাঁশরি বাজে দূর বনমাঝে
উদাস সুরে ঝুরে ঝুরে বলে :
আয় আয় প্রেম–যমুনায়
কূল ছেড়ে আয় আয় অকূলে॥
আয় আয় অকূলে॥

ত্যজি' সংসার–দুঃখ–জ্বালায়
জুড়াইতে আয় কৃষ্ণ–মায়ায়
গোপ গোপীর গোকুলে॥

কেউ হবি মাতা, কেউ হবি পিতা,
সখা হবি কেহ, কেউ হবি মিতা,
হবি কেহ প্রিয়, প্রিয়া হবি কেহ
নীপ–তরুমূলে॥

কেহ দিবি চন্দন কেহ দিবি মালা,
আনিবি কেহ পূজা–আরতির থালা,

ব্রজধামে ভেদ নাই, সকলের আছে ঠাঁই,
ডাকে শোন্ শ্যাম রায়
আয় ওরে চলে আয়
ঘর ভুলে ॥

৩৯৫

বনে বনে খুঁজি মনে মনে খুঁজি
চঞ্চল গোকুল-চন্দে।
খুঁজি যমুনার তীরে, খুঁজি আঁখি-নীরে
রাখালের বাঁশরিতে নূপুর-ছন্দে ॥

খুঁজি সে কৃষ্ণে কৃষ্ণাতিথিতে,
খুঁজি সে মাধবে মাধবী নিশীথে,
খুঁজি সে-শ্যামলে তমাল-কুঞ্জে
মালতী-মালায় হরি-চন্দন-গন্ধে ॥

কংস বলে তাঁরে মধুকৈটভারি—
উদ্ধব বলে তিনি প্রভু মুরারি,
রুক্মিণী বলে—হরি জীবন-স্বামী মোর
রাধিকা বলে তারে প্রীতম চিত-চোর।

শুক সারি বলে আছে সে নামে,
গোপী কয় সে রয় রাধারে লয়ে বামে,
গোষ্ঠে থাকে সখা বলে শ্রীদামে,
কোলে ঘুমায়, বলে যশোদা নন্দে ॥

৩৯৬

প্রেম-পাশে পড়লে ধরা চঞ্চল চিত-চোর।
শাস্তি পাবে নিঠুর কালা এবার জীবন ভোর ॥
মিলন-রসের কারাগারে
প্রণয়-প্রহরী রাখব দ্বারে,
চপল চরণে পরাব শিকল নব-অনুরাগ-ডোর ॥

শিরীষ কামিনী ফুল হানি' জরজর করিব অঙ্গ,
বাঁধিব বাহুর বাঁধনে, দংশিবে বেণীর ভুজঙ্গ,
কলঙ্ক-তিলক আঁকিব ললাটে হে গৌর কিশোর ॥

৩৯৭

নামে যাহার এত মধু
সে হরি কেমন!
শুধু নামে যাহার পরাণ এমন
করে উচাটন ॥

শুধু যাহার বাঁশরি-সুরে
আমার এত নয়ন ঝুরে,
না জানি তার রূপ কেমন
মদন-মোহন ॥

সে বুঝি লো অপরূপ সে চির-নতুন
তাঁর বাঁশরি সুরের মত আঁখি সকরুণ

সখি তারে আমি দেখি যদি
কাঁদব কি লো নিরবধি—
যেমন করে ঐ যমুনা কাঁদে অনুক্ষণ ॥

৩৯৮

নাম-জপের গুণে ফল্‌ল ফসল
চোখ মেলে দেখ আজ।
তোর মন-দেউলে হেলে দুলে নাচেন রসরাজ
প্রেমের ঠাকুর রসরাজ ॥

নামের মহামন্ত্র দিয়ে
(বেঁধে) আনল কারে, দেখ তাকিয়ে;
ত্রিজগৎ-পতি দাঁড়িয়ে দ্বারে পরে কাঙাল-সাজ ॥
চোখ মেলে দেখ আজ ॥

নাম-জপের গুণে স্থির হল যেই চঞ্চল তোর মতি,
মন-দর্পণে সেই দেখা দিলেন প্রিয় জগৎ-পতি।

আর অশান্তি নাই, নাই দুঃখ শোক
আনন্দময় হল ত্রিলোক ;
দেখ বিশ্বভুবন চন্দ্র রবি সৃষ্টি প্রলয় স্থিতি সবই
তোরই হৃদয়-মাঝ॥

৩৯৯

দিন গেল কই দীনের বন্ধু
এলে না ত দিন-শেষে।
(মোর) নয়নে রবে কি, হে কৃষ্ণ
চির-কৃষ্ণাতিথির বেশে॥

মোর নয়নের আলো নিভায়েছ প্রিতম,
কৃষ্ণচন্দ্র হইয়াছে তাই আকাশের চাঁদ মম।
সে কৃষ্ণচাঁদ হৃদয়-গগনে
উঠিবে কখন হেসে॥

৪০০

তোমার লীলারসে হে কৃষ্ণগোপাল
ডুবিয়ে রাখ মোরে।
তোমার আনন্দ-ব্রজে হে নন্দ-দুলাল
রাখিও সাথী করে॥

যে গোঠে চরাও ধেনু কিশোর রাখাল,
(সেথা) রাখাল বালক যেন হই চিরকাল,
যে ফুলের গেঁথে মালা পরায় ব্রজের বালা
(যেন) লুকায়ে থাকি সেই ফুলের ডোরে॥

যে যমুনা-জলে যে কদম-তলে তুমি বিহর, প্রিয়,
(যেথা) রাধার সনে রহ নিরজনে, সেথা মোরে ডাকিও।

লাখো জনম লয়ে লাখো যুগ আসিব,
(তব) নিত্য রাসলীলা-রসে ভাসিব,
মোক্ষ মুক্তি আমি চাহি না জীবন-স্বামী
হেরিব তোমারে শুধু নয়ন ভরে॥

৪০১

কিশোর গোপ-বেশ মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ
দ্বিভুজ শ্যাম সুন্দর মূরতি অপরূপ অনিন্দ্য
শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ॥

পরমাত্মারূপী পরম মনোহর,
গোলোকবিহারী চিন্ময় নটবর
ময়ুর-পাখাধারী চিকুর চাঁচর,
মণি-মঞ্জীর-শোভিত শ্রীচরণারবিন্দ॥

গলে দোলে নব বিকশিত কদম ফুলের মালা
খেলে ঘিরে যাঁরে প্রেমময়ী গোপবালা।

শোভিত স্বর্ণবর্ণ পীতবাসে
ওঙ্কার বিজড়িত শ্রীরাধার পাশে,
পদ্মপলাশ আঁখি মৃদু হাসে
যে রূপ ধেয়ায় মুনি ঋষি দেববৃন্দ
শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ॥

৪০২

আমি রব না ঘরে।
ওমা ডেকেছে আমারে হরি
বাঁশির স্বরে॥

আমি আকাশে শুনি আমি বাতাসে শুনি
ও মা নিশিদিন বাঁশরি বাজায় সে গুণী।
ও মা তাহারি সুরের সুরধুনী
বহে অন্তরে বাহিরে ভুবন ভরে॥

যবে জাগিয়া থাকি
হেরি শ্রীহরির পদ্ম-পলাশ আঁখি।
যদি ভুলিয়া কভু আমি ঘুমাই, মা গো,
সে ঘুম ভেঙে দেয় ; বলে, 'জাগো জাগো'।

সে শয়নে স্বপনে মোর সাধনা গো
আমি নিবেদিতা, মা গো,
তাহারি তরে॥

৪০৩

আমি কেমন করে কোথায় পাব
কৃষ্ণ চাঁদের দেখা।
অন্ধকারে খুঁজি তাহার
ব্রজের পথরেখা॥

মেঘে-ঢাকা আকাশ সম
পাপে মলিন হৃদয় মম
সে আকাশে উঠবে কি সে
কৃষ্ণ-শশী-লেখা॥

অশান্ত তার বেণু বাজে
আমার ব্যাকুল বুকের মাঝে,
(আমি) শুনেছি সে ডাকে তারেই
যে বিরহী একা॥

৪০৪

মোরে ডেকে লও সেই দেশে প্রিয়
যে দেশে তুমি থাক।
মোর কি কাজ জীবনে, বঁধু, যদি
তুমি কাছে নাহি ডাক॥

এই পৃথিবীর হাসি-গান
বঁধু, সব হয়ে যায় ম্লান

মধু-মাধবী রাসের তিথি
হায় ! মাধব এলে না কো ॥

এত আত্মীয় প্রিয়জন মোর, কিছু ভালো নাহি লাগে ;
ভিড় রহে না প্রেমের নীড়ে, সেথা দুটি পাখি শুধু জাগে।

ফুল তুলিয়া পূজার তরে
কেন ফেলে রাখো হেলা ভরে,
তার মরণের আগে, বঁধু,
শুধু বারেক চরণে রাখো ॥

৪০৫

পাহাড়ি

কেমন করে বাজাও বল
তোমার বাঁশের বাঁশি
জাগিয়ে চাঁদের আলো
ফুটিয়ে উষার হাসি ॥

তোমার সুরের কলরোলে
আমার মনে দোলা দোলে গো
তাই তো আমি লুকিয়ে সখা
কদমতলায় আসি ॥

বাজাও ওগো বাজাও বেণু,
ঝরাও প্রাণে গানের রেণু,
ঐ বাঁশিতে নাও ভরে নাও
আমার অশ্রুরাশি ॥

৪০৬

বন-তমালের ডালে বেঁধেছি ঝুলনা।
আজি রাতে দুলিব গো মোরা দু'জনা ॥

পুলকে দুলিবে যমুনার জল,
নীপ-কেশর হবে চঞ্চল,
জোছনায় ঝলমল কৃষ্ণ মেঘদল
মোদের দোঁহার তুলনা॥

চাঁদ হয়ে রব আমি
শ্যাম গুণ্ঠনখানি—
মেঘের শ্যামল বুকে
ঢাকা রবে মোর মুখে ;
আনন্দ ঘনশ্যাম তব সনে
লীলা-হিল্লোলে দুলিব গোপনে ;
মিনতি-জড়ানো মোর হৃদয়-কসুম-ডোর
বাঁধিনু চরণে ভুল না॥

৪০৭

পথে কি দেখ্‌লে যেতে আমার গৌর দেবতারে।
যারে কোল যায় না দেওয়া, কোল দেয় সে ডেকে তারে॥

নবীন সন্ন্যাসী, সে রূপে তার পাগল করে,
আঁখির ঝিনুকে তার অবিরল মুক্তা ঝরে,
কেঁদে সে কৃষ্ণের প্রেম ভিক্ষা মাগে দ্বারে দ্বারে॥
(আমার গৌর)

জগতের জগাই মাধাই মগ্ন যারা পাপের পাঁকে
সকলের পাপ নিয়ে সে সোনার গৌর-অঙ্গে মাখে।

উদার বক্ষে তাহার ঠাঁই দেয় সকল জাতে,
দেখেছ প্রেমের ঠাকুর সচল জগন্নাথে ?
একবার বল্‌লে হরি যায় নিয়ে সে ভবপারে॥
(আমার গৌর)

৪০৮
কীর্তন

কেমনে রাধার কাঁদিয়া বরষ যায়।
তোরা বলিস লো সখি, মাধবে মথুরায়॥

খর-বৈশাখে কি দহন থাকে
বিরহিণী একা জানে ;
ঘৃত-চন্দন পদ্মপাতায়
দারুণ দহন-জ্বালা না জুড়ায়,
ফটিক জলের সাথে আমি কাঁদি
চাহিয়া গগন পানে।
জ্বালা না জুড়ায় গো,
হরি-চন্দন বিনা ঘৃত-চন্দনে
জ্বালা না জুড়ায় গো,
শ্যাম-শ্রীমুখ-পদ্ম বিনা পদ্মপাতায়
জ্বালা না জুড়ায়॥

বরষায় অবিরল ঝর ঝর ঝরে জল
জুড়াইল জগতের নারী ;
রাধার গলার মালা হইল বিজলি-জ্বালা
সখি রে, তৃষ্ণা মিটিল না তারি।
প্রবাসে না যায় পতি
সব নারী ভাগ্যবতী
বন্ধু রে বাহুডোরে বাঁধে,
ললাটে কাঁকন হানি'
একা রাধা অভাগিনী
প্রদীপ নিভায়ে ঘরে কাঁদে।
জ্বালা তার জুড়ায় না জলে গো
শাওনের জলে তার মনের আগুন যেন
দ্বিগুন জ্বলে গো
জ্বালা তার জুড়ায় না জলে গো।
কৃষ্ণ-মেঘ গেছে চলে
সখি, অকরুণ অশনি হানিয়া হিয়ায়॥

আশ্বিনে পরবাসী প্রিয় এল ঘর (গো)
সখি রে, মিটিল বধূর মন-সাধ,
রাধার চোখের জলে মলিন হইয়া যায়
কোজাগরী চাঁদ।

(মলিন হইয়া যায় গো।)
আগুন জ্বালালে শীত যায় নাকি
রাধার কি হল, হায়!
বুক-ভরা তার জ্বলছে আগুন
তবু শীত নাহি যায়॥

যায় না, যায় না, আগুন জ্বলে—
বুকে আগুন জ্বলে, তবু শীত যায় না, যায় না,
শীত যদি বা যায় নিশীথ না যায় গো
(যায় না, যায় না),
রাধার যে কি হল, হায়॥

কলিয়া কৃষ্ণচূড়া, ছড়ায়ে ফাগের গুঁড়া
আসিল বসন্ত,
রাধা-অনুরাগে রেঙে কে ফাগ খেলিবে গো
নাই ব্রজ-কিশোর দুরন্ত।
মাধবী-কুঞ্জে কুহু পুকারিছে মুহু মুহু
ফুল-দোলনায় সবে দোলে,
এ মধু-মাধবী রাতে রাধার মাধব নাই
সখি রে, দুলিবে রাধা কার কোলে।
রাধা দোলে কার কোলে গো,
শ্যাম-বল্লভ কোলে দোল্ দোলে
শ্যাম-বল্লভ বিনা রাধা দোলে কার কোলে গো,
বল সখি, দোলে কার কোলে।
ফুল-দোলে দোলে সবে পিয়াল-শাখে,
রাধার পিয়া নাই, বাহু দুটি দিয়া
বাঁধিবে কাহাকে,
ঝরা-ফুল সাথে রাধা ধুলাতে লুটায়॥

৪০৯
কীর্তন

সখি, আমিই না হয় মান করেছিনু,
তোরা তো সকলে ছিলি;
ফিরে গেল হরি, তোরা পায়ে ধরি'
কেন নাহি ফিরাইলি।

তারে ফিরায় যে পায়ে ধরি'
তার পায়ে পায়ে ফেরেন হরি,
পরিহরি' মান অভিমান
(তারে) কেন নাহি ফিরাইলি।
তোরা তো হরির স্বভাব জানিস্।
তার স্বভাবের চেয়ে পরভাব বেশি
তোরা তো হরির স্বভাব জানিস্।
তার স্বভাব জেনেও রহিলি স্ব-ভাবে
ডাকিলি না পরবোধে,
তোদের পরম-পুরুষ পর বোধ হল
ডাকিলি না পরবোধে।
তারে প্রবোধ কেন দিলি নে সই,
তোরা তো চিনিস্ হরিরে,
প্রবোধ কেন দিলি নে সই
কেন ডাকিলি না পরবোধে।
হরি প্রহরী হইয়া রহিত রাধার
ঈষৎ অনুরোধে
তারে অনুরোধ কেন করলি নে সই
তোরা যে আমার অনুরাধা,
অনুরোধ কেন করলি নে সই
তোরা যে রাধার অনুবর্তিনী—
অনুরোধ কেন করলি নে সই
কেন ডাকিলি না পরবোধে।

৪১০
কীর্তন

সাজায়ে রাখলো পুষ্প-বাসর
তেমনি করিয়া তোরা—
কে জানে কখন্ আসিবে ফিরিয়া
গোপিনীর মনোচোরা॥

সে কি ভুলিয়া থাকিতে পারে
তার চিরদাসী রাধিকারে,
কত ঝড়-ঝঞ্ঝায় বাদল-নিশীথে
এসেছে সে অভিসারে ॥

মধুবন হতে চেয়ে আন আধফোটা বনফুল,
পাপিয়ারে বল গান গাহিতে অনুকূল,
চাঁপার কলিকা এনে নূপুর গেঁথে রাখ,
তেমনি তমাল-ডালে ঝুলনা বাঁধা থাক।

আখর ঃ—
[বেঁধে রাখ লো—ঝুলনা তেমনি বেঁধে রাখ না—
তমাল-ডালে ঝুলনা তেমনি বেঁধে রাখ লো]
সখী,—যোগিনীর বেশ ছাড়িয়া আবার পরিব নীলাম্বরী—
মথুরা ত্যজিয়া এ ব্রজে ফিরিয়া
আসিবে কিশোর হরি।

আখর ঃ—
[ফিরে আসিবে—কিশোর নটবর ফিরে আসিবে—
এই ব্রজে পদরজ দিতে ফিরে আসিবে—
আনন্দে ভাসিবে—নিরানন্দ ব্রজপুর আনন্দে ভাসিবে
এই নিরানন্দ ব্রজপুর হরিপদ-রজ লভি আনন্দে ভাসিবে ॥

রচনা-কাল : ১৯৪০

৪১১
কীর্তন

ওলো বিশাখা—ওলো ললিতে
দে এই পথের ধূলি দে।
যে পথে শ্যামের রথ চলে গেছে
দে সেই পথের ধূলি দে ॥

আখর ঃ—
[ধূলি নয় ধূলি নয়—
এ যে হরি-চন্দন, ধূলি নয়, ধূলি নয়—
এ যে হরি-চন্দন, অঙ্গ-শীতল-করা—।

ওর, ভাগ্য ভালো, রাধার চেয়ে ওর ভাগ্য ভালো—
ঐ ধূলি মাথায় তুলে দে লো।]
ঐ পথের বুকে গেছে কৃষ্ণের রথ।
সখী আমি কেন হই নাই ঐ ধূলি-পথ॥

আখর ঃ—
[বঁধু চলে যে যেত গো
আমার হিয়ার উপর দিয়া চলে যে যেত—
আমার সকল জনম সফল হত—চলে যে যেত গো।]
অনুরাগের রজ্জু দিয়া বাঁধিতাম সে রথে
নিয়ে যেতাম সে রথ প্রেম-পথে (ওলো ললিতে)
আখর ঃ—
[নিয়ে যেতাম—অনুরাগ-রজ্জুতে বেঁধে—
প্রেমের পথে—অনুরাগ-রজ্জুতে বেঁধে—]

রচনা-কাল : ১৯৪০

৪১২
কীর্তন

সুবল সখা!
এই দেখ্ এই পথে তাহার
সোনার নূপুর আছে পড়ে,
বৃন্দাবনের বনমালী গেছে রে এই পথ ধরে॥

হরি-চন্দন-গন্ধ পথে পথে পাই
ঝরা ফুলে ছেয়ে আছে বন-বীথি তাই,
ভ্রমে ভ্রমর শ্রীচরণ-চিহ্ন ঘিরে
রাঙা কমল ভ্রমে, ভ্রমে শ্রীচরণ-চিহ্ন ঘিরে
ভাসে বাঁশির বেদন তার মৃদু সমীরে॥

তারে খুঁজব কোথায়—
সেই চোরের রাজায় খুঁজব কোথায়?
তারে খুঁজলে বনে, মনে লুকায়
চোরের রাজায় খুঁজব কোথায়?

শ্রীদাম দেখেছে তাঁরে রাখাল দলে ;
গোপিনীরা দেখিয়াছে যমুনার জলে ;
বাঁশরি দেখেছে তাঁরে কদম-শাখায় ;
কিশোরী দেখেছে তাঁরে ময়ূর-পাখায়।
বৃন্দা এসেছে দেখে, রাজা মথুরায়
জানি না কোথায় সে—
দে রে দেখায়ে দে কোথা ঘনশ্যাম,
কবে বুকে পাব তারে মুখে জপি যাঁর নাম॥

৪১৩
কীর্তন

[শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় চলে গেছেন, মথুরার রাজা হয়েছেন, বিবাহ করেছেন রূপসী কুবুজাকে। এদিকে বিরহ-বিধুরা শ্রীরাধার বিরহ-বার্তা বহন করে মথুরায় এসেছেন সখী বৃন্দাদূতী। রাজ-সাজে রাজ-সিংহাসনে কুবুজার পাশে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে দেখে বৃন্দা গাইছেন।]

ছি ছি ছি কিশোর হরি, হেরিয়া লাজে মরি,
সেজেছ এ কোন্ রাজ-সাজে
(যেন সং সেজেছ, ফাগ মুছে তুমি পাগ বেঁধেছ—
হরি হে যেন সং সেজেছ ;
সংসারে তুমি সং সাজায়ে নিজেই এবার সং সেজেছ)
যেথা বামে শোভিত তব মধুরা গোপিনী নব
(সেথা) মথুরার কুবুজা বিরাজে॥
(মিলেছে ভাল, বাঁকায় বাঁকায় মিলেছে ভাল,
ত্রিভঙ্গ অঙ্গে কুবুজা-সঙ্গে বাঁকায় বাঁকায় মিলেছে ভাল),
হরি, ভাল লাগিল না বুঝি হৃদয়-আসন,
তাই সিংহাসনে তব মজিয়াছে মন।
প্রেম ব্রজধাম ছেড়ে নেমে এলে কামরূপ,
হরি, এতদিনে বুঝিলাম তোমার স্বরূপ॥

(তব স্বরূপ বুঝি না হে
গোপাল রূপ ফেলে ভূপাল রূপ নিলে, স্বরূপ বুঝি না হে)
হরি হে, তোমার মোহন মুরলী কে হরি' নিল
কুসুম-কোমল হাতে এমন নিঠুর রাজদণ্ড দিল
(হরি, দণ্ড দিল কে, রাধারে কাঁদাবে বলে দণ্ড দিল কে।

দণ্ডবৎ করি শুধাই শ্রীহরি, দণ্ড দিল কে)
রাঙা চরণ মুড়েছে কে সোনার জরিতে খুলে রেখে মধুর নূপুর॥

হেথা সবাই কি কালা গো
কারুর কি কান নাই, নূপুর কি শোনে নাই, সবাই কি কালা গো
কালায় পেয়ে হল হেথায় সবাই কি কালা গো
এরূপ দেখিতে নারি, হরি আমি ব্রজনারী, ফিরে চল তব মধুপুর।
সেথা সকলই যে মধুময়, অন্তরে মধু বাহিরে মধু
সকলই যে মধুময়—ফিরে চল হরি তব মধুপুর॥

৪১৪
কীর্তন

শ্যামে হারায়েছি বলে কাঁদি না বিশাখা
হারায়েছি শ্যামের হৃদয়।
(আমি তারি তরে কাঁদি গো ;
সেই নিদয়ের তরে নয়
তার হৃদয়ের তরে কাঁদি গো)
হারায়েছি শ্যামের হৃদয়॥

যে হৃদয় ছিল একা গোপিকার রাধিকার,
কুবুজা করেছে তারে জয়॥

(কুবুজা তারে কু বুঝায়েছে,
যে রাধা ছাড়া কিছু জানত না সই
কুবুজা তারে করেছে জয়)
কি হবে মথুরা গিয়া
হেরি' সে হৃদয়হীন পাষাণ দেবতায়?
(সে দেবতাই বটে গো, দেবো তায় সব কিছু,
সে কিছুই দেবে না,
সে দেবতাই বটে গো)
তোরা যেতে চাস, যা লো
ঠাকুর দেখিতে তোরা যেতে চাস, যা লো
রাজ-সাজে রাংতা-পরা ঠাকুর দেখিতে তোরা
যেতে চাস, যা লো॥

ধরম করম মম তনু মন যৌবন সঁপিনু চরণে যার
সে পর-পুরুষ, হল আজি অপরার পুরুষ স্বভাব ভ্রমরার।
(সে ভ্রমরারই সমতুল
ফুলে ফুলে ভ্রমে সে যে ভ্রমরারই সমতুল
তারে দেখ্‌লে ভ্রমে জাতিকুল, সে ভ্রমরারই সমতুল
পুরুষ স্বভাব ভ্রমরার)
যার হরি ছাড়া বোধ নাই,
প্রবোধ দিস না তায় সজনী।
সবারই পোহাবে নিশি, পোহাবে না রাধারই
এ আঁধার রজনী॥

৪১৫

কীর্তন

[বৃন্দাবনে আজও ব্রজনারীরা একে অপরকে রাধে বলে ডাকে]

তাই—
সখি, সেই ত পুষ্প-শোভিতা হল আবার মাধবীলতা,
মাধবী চাঁদ উঠেছে আকাশে, আমার মাধব কোথা?
রাধা আজি নিরাধারা সখি রাধামাধব কোথা?
মধুপ গুঞ্জরে মালতী-বিতানে,
নূপুর-গুঞ্জরণ নাহি শুনি কানে,
মোর মনো-মধুবনে মধুপ কানু কই—
আনন্দ-রাস নাই—রাস-বিহারী নাই—
আমি আর রাধা নই॥

সখি, পূর্ণরাসে জনম লভিয়া
পুষ্প আহরণ তরে
কৃষ্ণপূজার লাগি' পুষ্প আহরণ তরে
যেয়েছিনু বনে অনুরাগ-ভরে
বৃন্দাবন-চারী কৃষ্ণ না পেয়ে
রাধা কাঁদে ব্রজপথে যেয়ে যেয়ে
'প্রাণবল্লভ আমার কই গো কই গো
সখি আমায় বলে দেগো
রাধা হল আজি অশ্রুর ধারা।
কৃষ্ণ-আনন্দিনী রাধা বিনোদিনী কবে হবে
শ্রীকৃষ্ণ হারা॥

৪১৬
কীর্তন

ওগো প্রিয়তম তুমি চলে গেছ আজ
আমার পাওয়ার বহু দূরে।
তবু মনের মাঝে বেণু বাজে
সেই পুরান সুরে সুরে॥

মনের মাঝে বেণু বাজে
প্রিয় বাজাতে যে বেণু বনের মাঝে
আজো তার রেশ মনে বাজে ;

তব কদম–মালার কেশরগুলি
আজি ছেয়ে আছে ওগো পথের ধূলি।
ওগো আজকে করুণ রোদন তুলি
বয় যমুনা ভাটির সুরে॥
আর উজান বয় না

ওগো আজিকে আঁধার তমাল বনে
বসে আছি উদাস মনে,
তোমার দেশে চাঁদ উঠেছে
আমার দেশে বাদল ঝুরে॥

সেথা চাঁদ উঠেছে
ওগো সেথা শুক্লা তিথির চতুর্দশীর চাঁদ উঠেছে,
সখি তাদের দেশের আকাশে আজ
আমার দেশের চাঁদ উঠেছে।
ওগো মোর গগনে কৃষ্ণাতিথি
আমার দেশে বাদল ঝুরে॥

৪১৭
কীর্তন

বঁধু সেদিন নাহি ক আর—
যবে রাধার বিরহে আঁধার দেখিতে
ত্রিভুবন সংসার॥

তার বেশের লাগিয়া দেশের ফুল যে
আনিতে চয়ন করি' ;
নিতি গোকুলের পথে, বনে, যমুনাতে
বাঁশরি বাজাতে হরি
রাধা রাধা বলে।
ডাকিতে কতই ছলে হে রাধা বলে
আমরা সবই জানি
তোমার গুণের কথা সবই জানি।
আজ শত সে চন্দ্রাবলী নিয়ে কর ঢলাঢলি
কত অলি গলি ফের শ্যাম (সখা হে,)
তাই যমুনার জলে লাজে ডুবিয়া মরেছে সখা
যে বাঁশিতে নিতে রাধা নাম (সখা হে)
তুমি বলেছিলে হরি
তুমি নীল তনু হলে স্মরিয়া স্মরিয়া
রাধার নীলাম্বরী॥
আজ গেছ ভুলে সে–সব কথা গেছ ভুলে
অনেকের আছে অনেক যে নাথ জানে এই সংসার
তোমা বিনে কেহ নাই সখা অভাগিনী রাধিকার॥

৪১৮

জয় নারায়ণ অনন্তরূপধারী বিশাল।
কভু প্রশান্ত উদার কভু কৃতান্ত করাল॥

কভু পার্থ–সারথি হরি
বংশীধারী কংস–অরি
কভু গোপাল বনমালী কিশোর রাখাল॥

বিপুল মহা বিরাট কত বৃন্দাবন–বিলাসী
শঙ্খ–চক্র–গদা–পদ্মপাণি মুখে মধুর হাসি।
সৃষ্টি–বিনাশে লীলা–বিলাসে
মগ্ন তুমি আপন ভাবে অনাদিকাল॥

৪১৯

নব দূর্বাদল-শ্যাম
জপ মন নাম শ্রীরঘুপতি রাম।
সুরাসুর কিন্নর যোগী মুনি ঋষি নর
চরাচর যে নাম জপে অবিরাম॥

সজল জলদ নীল নবঘন কান্তি
নয়নে করুণা আননে প্রশান্তি,
নাম শরণে টুটে শোক তাপ ভ্রান্তি,
রূপ নেহারি' মূরছিত কোটি কাম॥

৪২০

লেটোর গান

আয় পাষণ্ড যুদ্ধ দে তুই, দেখ্‌ব আজ তোরে।
প্রত্যেক বারের পরাজয়ে লাজ নাই অন্তরে॥

রমণীদের মত হয়ে শুধু সৈন্যদেরই মাঝে
আছিস্‌ কেন কাপুরুষ বুঝিলাম কাজে,
আর কি রে চাতুরী সাজে মম সমরে॥

কুকুর ছানায় বাদ সেধেছে হায়নার সাথে
এরা চড়াই পাখির দল এসেছে মার্জার মারিতে
এরা ভেবেছে সব ভুজঙ্গেতে মারবে গরুড়ে॥

বৃষ-শৃঙ্গে বসলে মশা হয় কি অনুভব?
নজরুল এসলাম বলে গাধা হয় না রে মানব।
বৃথা নাড়ো হস্তপদ বুঝবি এইবারে॥

৪২১

মা এলো রে, মা এলো রে
বরষ পরে আপন ছেলের ঘরে।
সাত কোটি ভাই বোন মিলিয়া আজ
ডাকি আকুল স্বরে॥
(মাগো আনন্দময়ী)

মা এসেছে। মা এসেছে ! আকাশ পাতাল 'পরে
আনন্দ তাই ধরে না যে আজকে থরে থরে,
শিউলি ফুলের মত আজ আনন্দ-গান ঝরে ॥

কমল-মুকুল-শাপলা বনে ভ্রমর শোনায় গীতি—
জাগো, জাগো, আজকে মোদের আগমনীর তিথি ;
জলতরঙ্গ বেজে ওঠে নদীর বালুচরে ॥

বুকের মাঝে বাঁশি বাজে অঝোর কলরোলে,
দূর প্রবাসী কাজ ভুলে আয় আপন মায়ের কোলে ;
আজকে পেলাম মাকে যেন কত যুগের পরে ॥

৪২২

আজ আগমনীর আবাহনে
কী সুর উঠেছে বেজে।
দোয়েল শ্যামা ডাক দিয়েছে
বরণের এয়ো সেজে ॥

ভরা ভাদরের ভরা নদী
কলকল ছোটে নিরবধি,
সে সুর-গীতালি দেয় করতালি,
নাচে তরঙ্গ-দোলনে যে ॥

পূরব দীপক আরতির দীপ
শত ছটা মেঘ-জালে,
দিক্‌বালা তারা আল্‌তা গুলেছে
রক্ত-আকাশ-থালে।

ঘাসের বুকেতে শিশির-নীর
ধোয়াবে ও রাঙা চরণ ধীর,
সবুজ আঁচলে মুছে নেবে বলে
ধরণী শ্যামল সেজেছে যে ॥

৪২৩

এল রে এল ঐ রণ-রঙ্গিণী শ্রীচণ্ডী,
চণ্ডী এল রে এল ঐ।
অসুর সংহারিতে বাঁচাতে উৎপীড়িতে
ধ্বংস করিতে সব বন্ধন বন্দী শ্রীচণ্ডী,
চণ্ডী এল রে ঐ॥

দনুজ-দলনী চামুণ্ডা এল ঐ
প্রলয়-অগ্নি জ্বালি' নাচিছে।
তাথৈ তাথৈ তা তাথৈ থৈ
দুর্বল বলে মা মাভৈঃ মাভৈঃ।
মুক্তি লভিবি যত শৃঙ্খল-বন্দী
শ্রীচণ্ডী, চণ্ডী এল রে ঐ॥
রক্ত-রঞ্জিত অগ্নিশিখায়
করালী কোন্ রসনা দেখা যায়।

পাতাল-তলের যত মাতাল দানব
পৃথিবীতে এসেছিল হইয়া মানব
তাদের দণ্ড দিতে আসিয়াছে চণ্ডিকা
সাজিয়া চণ্ডী, শ্রীচণ্ডী
চণ্ডী এল রে এল ঐ॥

৪২৪

"ওম্ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোস্তুতে॥"

জয় দুর্গা জননী, দাও শক্তি—
শুদ্ধ জ্ঞান দাও, দাও প্রেমভক্তি;
অসুর-সংহারী কবচ-অস্ত্র দাও মা, বাঁধি বাহুতে॥

অর্থ-বিভব দাও, যশ দাও মা গো, প্রতি ঘরে দাও শান্তি;
পরম অমৃত দাও দূর করো মৃত্যু-সম বাঁচিয়া
থাকার এই ক্লান্তি।

শ্রান্তিবিহীন উৎসাহ দাও কর্মে,
নবীন দীক্ষা দাও শান্তির ধর্মে ;
মোদের রক্ষা করো বরাভয়-বর্মে,
বিস্ময় জ্যোতি দাও প্রতি অণুতে।।

৪২৫

নৃত্যময়ী নৃত্যকালী
নিত্য নাচে হেলে দুলে।
তার রূপের ছটায়, নাচের ঘটায়
শম্ভু লুটায় চরণ-মূলে।।
সেই নাচেরি ছন্দধারা—
চন্দ্র, রবি, গ্রহ, তারা।
সেই নাচনের ঢেউ খেলে যায়
সিন্ধুজলে পত্র-ফুলে।।

সে মুখ ফিরায়ে নাচে যখন—
ধরায় দিবা হয় রে তখন।
এ বিশ্ব হয় তিমির-মগন
মুক্তকেশীর এলোচুলে।।

শক্তি যথায়, যথায় গতি ;
মা সেথা নাচে মূর্তিমতী।
কবে দেখব সে নাচ অগ্নি শিখায়—
আমরা সবাই চিতার কূলে।।

৪২৬

তাপসিনী গৌরী কাঁদে বেলা শেষে,
উপবাস-ক্ষীণ তনু যোগিনী-বেশে।।

বুকে চাপি' করতল
বিল্বপত্র-দল,
কেঁপে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে শিব-আবেশে।।

অস্তরবি তার সহস্র করে
চরণ ধরে বলে ফিরে যেতে ঘরে।

'শিব দাও, শিব দাও' বলে
লুটায় ধূলি-তলে,
কৈলাস-গিরি পানে চাহে অনিমেষে॥

৪২৭

সোনার বরণ মেয়ে আমার
"নন্দা" কোলে আয়।
(প'রে) সোনার বসন সোনার ভূষণ
সোনার নূপুর পায়॥

(আমার) কালো মেয়ের দুখ ভোলাতে
কে শ্যাম অঙ্গ সোনায় মুড়েছে !
(মা'র) গৌরী-রূপ দেখে আমার
চোখ জুড়িয়ে যায়॥

(এই) হেম-বরণী বালিকাকে, বালিকা কে বলে,
কে ভয়ঙ্করী বলে,
(তাই) আনন্দিনী রূপ দেখলো 'নন্দা' রূপের ছলে,
এল কন্যা হয়ে কোলে।

গোধূলি-লগনে বধূর বেশে
দাঁড়ালি মা অঙ্গনে মোর হেসে,
শিব-লোকে যাবার আগে দেখা দিয়ে মায়
বুঝি চাহিস্ মা বিদায়॥

৪২৮

যারা আজ এসেছে রইবে না কাল, আমার কেহ নয়
ওরা কেহ নয়।

মা গো ওরা তোরে শুধু আড়াল করে রয়
ওরা কেহ নয়॥

ওরা মোর ইচ্ছায় আসেনি ক কেহ,
ওরা মোর ইচ্ছায় যায় না ছেড়ে গেহ,
এ সংসারের পান্থশালায় ক্ষণিক পরিচয়,
ও মা, ওদের সাথে ক্ষণিক পরিচয়।
ওরা কেহ নয়॥

যারা কেবল আছে মা গো মা ভোলাবার তরে
নে তাদের মায়া হরে,

তোর পূজার ভোগ খায় কেড়ে মা
পাঁচভূতে আর চোরে।
ওরা সবাই যাবে রইবে না কো কেউ,
মিথ্যা ওরা ক্ষণিক মায়ার ঢেউ,
ওদের মায়ায় তোকে ভোলার ভুল যেন না হয়।
ওরা কেহ নয়॥

৪২৯

মাকে আমার দেখেছে যে
ভাইকে সে কি ঘৃণা করে।
ত্রিলোক-বাসী প্রিয় তাঁহার
পরান কাঁদে সবার তরে॥

নাই জাতিভেদ উচ্চ নীচের জ্ঞান
তাহার কাছে সকলে সমান ;
দেখলে গুহক চণ্ডালে সে
রামের মত বক্ষে ধরে॥

মা আমাদের মহামায়া
পরমা প্রকৃতি,
পিতা মোদের পরমাত্মা রে
তাই সবার সাথে প্রীতি।
মোদের সবার সাথে প্রীতি।

সন্তানে তাঁর ঘৃণা করে
মাকে করে পূজা,
সে পূজা তার নেয় না কভু
নেয় না দশভূজা।
এই ভেদ-জ্ঞান ভুলব যেদিন
মা সেইদিন আসবে ঘরে॥

৪৩০

কে এলি মা টুকটুকে লাল রক্তচেলী পরে।
সারা গায়ে আবীর মেখে ভুবন আলো করে।
ত্রিভুবন রূপে ভরে॥

পায়ে লাল জবার ফুল
কানে ঝুম্‌কো জবার দুল,
লাল শাপলার মালা পরে দুলিয়ে এলোচুল,
শুভ্র-বরণ শিবকে ফাগের রঙে রঙিন করে॥

ওমা! যোগমায়া, তোর রঙে রসের ব্রজে এল হোরি,
(তোর) নাচের তালে আনন্দ-কুসুম পড়ে ঝরি'।
তোর চরণ-অরুণ-রাগে
মা, প্রভাত রবি রাঙে,
মণিপুর-কমলে গায়ত্রী জাগে
(সেই) অনুরাগের রঙিন ধারা পড়ুক বুকে ঝরে॥
তোর চরণ অরুণ রাগে।

৪৩১

ও মা! যা কিছু তুই দিয়েছিলি
ফিরিয়ে দিলাম তোকে।
তুই ছাড়া আর বলতে আপন
রইল না ত্রিলোকে॥

তুই কোলে নেবার দায় এড়িয়ে
রেখেছিলি মন ভুলিয়ে খেলনা দিয়ে।
তুই পালিয়েছিলি ঘুম পাড়িয়ে
কাজল দিয়ে চোখে।
মায়ার কাজল দিয়ে চোখে॥

কোটি জনম কাটল কেঁদে মা গো, তোকে ভুলে
(মা) তোরে মনে পড়েছে আজ,
নে মা কোলে তুলে,
(এবার) নে মা কোলে তুলে।
তুই ছাড়া মা মিথ্যা সবই,
এই পুত্র জাগায় মায়ার ছবি,
ভুলব না আর এবার আমি
জড়াব না দুঃখ-শোকে॥

৪৩২

অরুণ-কিরণে হেরি মা তোমারি
মুখের অভয় হাসি।
নাচে আনন্দে নদী-তরঙ্গ
প্রাণে প্রাণে বাজে বাঁশি॥

আগমনী গায় সৃষ্টি অশেষ,
ধ্যান ভেঙে চায় হাসিয়া মহেশ,
তোমারে পূজিতে পূজারিণী-বেশ
ধরণীরে দিল পরায়ে উদাসী॥

৪৩৩

নমস্তে বীণা পুস্তক হস্তে দেবী বীণাপাণি।
শতদল বাসিনী সিদ্ধি-বিধায়িনী সরস্বতী বেদবাণী॥

এস অমল ধবল শুভ সাত্ত্বিক বর্ণে
হংস-বাহনে লীলা-উৎপল কর্ণে,

এস বিদ্যারূপিণী মা শারদ ভারতী
এস ভীত জনে বরাভয় দানি'॥

শুদ্ধ জ্ঞান দাও, শুভ্র আলোক,
অজ্ঞান তিমির অপগত হোক,
মৃতজনে সঙ্গীত অমৃত দাও মা
বীণাতে মাভৈঃ ঝঙ্কার হানি'॥

৪৩৪

আনন্দ রে আনন্দ
দশ হাতে ওই দশ দিকে মা ছড়িয়ে এল আনন্দ।
ঘরে ফেরার বাজল বাঁশি, বইছে বাতাস সুমন্দ॥

আমার মায়ের মুখের হাসি
শরৎ-আলোর কিরণরাশি,
'কমল-বনে উঠছে ভাসি'
মায়ের গায়ের সুগন্ধ॥

উঠলো বেজে দিগ্বিদিকে ছুটির মাদল মৃদঙ্গ,
মনের আজি নাই ঠিকানা, যেন বনের কুরঙ্গ।

দেশান্তরী ছেলেমেয়ে
মায়ের কোলে এল ধেয়ে,
শিশির-নীরে এল নেয়ে
স্নিগ্ধ অকাল বসন্ত॥

৪৩৫

জয় ব্রহ্ম-বিদ্যা শিব-সরস্বতী।
জয় ধ্রুব-জ্যোতি, জয় বেদবতী॥

জয় আদি কবি, জয় আদি বাণী
জয় চন্দ্রচূড়, জয় বীণাপাণি,
জয় শুদ্ধজ্ঞান শ্রীমূর্তিমতী॥

শিব ! সঙ্গীত সুর দাও, তেজ আশা ;
দেবী ! জ্ঞান শক্তি দাও, অমর ভাষা।

শিব ! যোগধ্যান দাও অনাসক্তি,
দেবী ! মোক্ষ লক্ষ্মী ! দাও পরাভক্তি,
দাও রস অমৃত, দাও কৃপা মহতী॥

৪৩৬

নমো নমো নমো হে নটনাথ
নব ভবনে কর শুভ চরণপাত।
নৃত্য-ভঙ্গিতে সৃজন-সঙ্গীতে
বিশ্বজন-চিতে আনো নব প্রভাত॥
তোমার জটাজুটে বহে যে জাহ্নবী
তাহারি সুরে প্রাণ জাগাও, আদি কবি
শুচি ললাট-তলে
যে শিশু শশী ঝলে
তারি আলোকে হর দুঃখ-তিমির রাত॥

হে চির সুন্দর, দেহ আশীর্বাদ—
হউক দূর সব অতীত অবসাদ
লঙ্ঘি সব বাধা
তব পতাকা বহি
ফুল্ল মুখে সহি সকল সংঘাত॥

নব জীবনে লয়ে আশা অভিনব
ভুলি সকল লাজ গ্লানি পরাভব
এ নাট-নিকেতনে আরতি করি তব
হে শিব, কর নব জীবন সঞ্চাত॥

বি.দ্র. : 'নজরুল-রচনাবলী'র বর্তমান খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত 'অগ্রন্থিত গান'গুলোর বাণী সংকলিত হয়েছে ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'র তৃতীয় খণ্ড থেকে। তবে বাণীর পার্থক্য ও পাঠান্তরের ক্ষেত্রে অনুসরণ ও সংশোধন করা হয়েছে প্রধানত নজরুল-সঙ্গীত গবেষক ও বিশেষজ্ঞ ডক্টর ব্রহ্মমোহন ঠাকুর সম্পাদিত ও কলকাতার 'হরফ' প্রকাশিত'নজরুল-গীতি'-অখণ্ড (২০০৪) এবং নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত ও রশিদ-উন নবী সম্পাদিত 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' (২০০৬) গ্রন্থের অন্তর্গত বাণীর সঙ্গে মিলিয়ে।

গ্রন্থ-পরিচয়

['নজরুল-রচনাবলী'-র বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশকাল ও কতকগুলি রচনা সম্পর্কে কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য নিম্নে পরিবেশিত হলো। 'পুনশ্চ' শিরোনামে পরিবেশিত তথ্য নতুন সংস্করণের (১৯৯৩) সম্পাদনা-পরিষদ কর্তৃক সংযোজিত। 'জন্মশতবর্ষ সংস্করণের (২০০৯) সংযোজন' বর্তমান সংস্করণের সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক যোগ করা হয়েছে।]

সুর ও শ্রুতি

'সুর ও শ্রুতি' শিরোনামীয় অসমাপ্ত প্রবন্ধটি শ্রীকল্পতরু সেনগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত এবং কলিকাতার ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত 'নজরুল-গীতি অন্বেষা' নামক সংকলন-গ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটি সম্বন্ধে শ্রীকল্পতরু সেনগুপ্ত বলিয়াছেন :

"এই রচনাটি অপ্রকাশিত। একটি বাঁধাই খাতায় কাজী নজরুল ইসলামের নিজের হাতের লেখায় পাওয়া গেছে। খাতায় তিনি এত দ্রুত লিখেছেন যে, কোথাও কোথাও পাঠোদ্ধারের অসুবিধা হয়েছে। রাগ-রাগিণী ও শ্রুতির চার্টগুলি তাঁর নিজের হাতে তৈরি। এই চার্টগুলি দেখে, অনুমান করা যায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তুলনামূলক বিচারে তিনি কিরূপ আগ্রহী ছিলেন এবং কিরূপ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সঙ্গীত-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। একই খাতায় আরো কয়েকটি রাগের প্রকৃতি ও পরিচয় বর্ণনা করেছেন। ...

খাতা-দৃষ্টে অনুমান হয় ১৯৩৫-৩৬ সালে তিনি এই লেখা আরম্ভ করেছিলেন।"

নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ অমলকুমার মিত্র নজরুলের 'সুর ও শ্রুতি' সম্পর্কে ঢাকার 'নজরুল একাডেমী পত্রিকা' (নবপর্যায় ৪র্থ সংখ্যা, বর্ষা-শরৎ ১৩৯৪)তে 'নজরুল ও মারিফুন্নাগমাত' প্রবন্ধে লিখেছেন,

'মারিফুন্নাগমাত কিঞ্চিৎ আরবি-ঘেঁষা-উর্দু ভাষায় রচিত হয়েছিল। গ্রন্থকারের নাম রাজা নবাব আলী। ... অধিকাংশ সময় লখনৌতে থাকতেন। অসাধারণ সংগীতানুরাগী নবাব আলী সেকালের শ্রেষ্ঠ সংগীতগুণীদের বাবদ বিপুল সংগীত জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। ... ১৯১১ সাল থেকে তাঁর বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ হয়, ভাতখণ্ডের আগ্রহে নবাব আলী ১৯১৬ সালে বরোদায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯২৬ সালে লখনৌতে প্রতিষ্ঠিত 'মরিস কলেজ অব হিন্দুস্তানি মিউজিক'-এর প্রেসিডেন্টের

পদ নবাব আলী আমৃত্যু অলংকৃত করেন। নবাব আলী 'মারিফুন্নাগমাত' গ্রন্থ তিনটি খণ্ডে প্রকাশ করেছিলেন। তার মধ্যে প্রথম খণ্ডটি আমাদের আলোচ্য বিষয়—এইটিই নজরুল ব্যবহার করেছিলেন। ২য় ও ৩য় খণ্ড ছিল ধ্রুপদ ও ধামার গানের সংকলন। ... দ্বিবিধ উৎকর্ষে 'মারিফুন্নাগমাত' বিশের দশকের প্রথমার্ধে উত্তর-ভারতে বিশেষ করে লখনৌ অঞ্চলে সমাদর লাভ করে। উৎকর্ষের একটি দিক ছিল তথ্যের প্রাচুর্য—একটি নাতিবৃহৎ গ্রন্থে সুপরিকল্পিতভাবে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত। অপরদিকে এই গ্রন্থের মাধ্যমে সর্বপ্রথম ভাতখণ্ডের গবেষণাজাত হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সংগীতের কালোপযোগী রূপরেখা উত্তর ভারতের একটি ভাষায় প্রচারিত হলো। ভাতখণ্ডের নিজের রচনা তখনো সংস্কৃত ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় সীমিত পাঠকের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, হিন্দিতে 'ক্রমিকপুস্তক মালিকা'র—অভ্যুদয় তখনো হয়নি। ... উর্দু ভাষার ব্যবধান ঘুচিয়ে কবি নজরুল ইসলাম 'মারিফুন্নাগমাত' গ্রন্থের পাঠোদ্ধার করেছিলেন। এর জন্য তিনি কোনো উর্দুভাষীর সাহায্য নিয়েছিলেন কিনা জানা নেই। যদি না নিয়ে থাকেন তবে বুঝতে হবে উর্দু ভাষায় কবির যথেষ্টরকম দখল হয়েছিল। ... 'মারিফুন্নাগমাত'র প্রথম খণ্ডে ছিল তিনটি অধ্যায়—স্বরাধ্যায়, রাগ অধ্যায় ও তাল অধ্যায়। স্বরাধ্যায়ে ছিল শাস্ত্রীয় সংগীতের সাধারণ উপপত্তিক বিষয়গুলি। রাগ অধ্যায়ে ছিল ১৫৩টি রাগের বিবরণ, স্বরবিস্তার ও একটি করে লক্ষণগীত। এতে করে অনেকগুলি রাগ পাওয়া গেল যেগুলি ইতিপূর্বে বিভিন্ন ওস্তাদদের কুক্ষিগত ছিল, ঠিক কবে এই বই কবি (নজরুল) হস্তগত করেছিলেন সেটা জানা নেই। কবির সৃষ্টিধারায় এই গ্রন্থের প্রভাব অনুভব করা যায় ত্রিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে। ... একটি বাঁধানো খাতায় কবির হস্তাক্ষরে প্রাপ্ত 'সুর ও শ্রুতি' (এটা 'স্বর ও শ্রুতি' হবে) শীর্ষক একটি দীর্ঘ রচনা সকলের দৃষ্টিগোচর করেন কল্পতরু সেনগুপ্ত মহাশয়, 'নজরুল-গীতি অন্বেষা' পুস্তকের মাধ্যমে। পরে অন্য পত্রিকা এবং বাংলাদেশের গ্রন্থেও রচনাটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। ... আসলে এটি 'মারিফুন্নাগমাতে'র স্বরাধ্যায়ে আলোচিত 'স্বর ও শ্রুতি' অংশের নজরুলকৃত স্বচ্ছন্দ ও ঈষৎ সংক্ষিপ্ত বাংলা তর্জমা। রচনাটি অসমাপ্ত মনে করে আক্ষেপ করা হয়েছে কিন্তু আক্ষেপের কোনো হেতু নেই, লেখাটি ঠিক জায়গাতে এসেই থেমেছে। 'মারিফুন্নাগমাতে' নবাব আলী শ্রুতি সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত লিখে ভিন্ন আলোচনায় প্রবেশ করেছেন :

> শ্রুতিয়োঁ কা বর্তমান সংগীত সে কোই সংবধ নহী হৈ। কেবল সূত্র ঔর মীড় পর নির্ভর হৈঁ।

আর কবি তরজমা শেষ করেছেন এই কথা লিখে :

> 'এই যুগের সংগীত কোথাও শ্রুতির প্রয়োজন হয় না—মীড় ও সুরের কাজ ব্যতীত। এই খাতায় কবির আরো যেসব লেখা দেখা গেছে তার থেকে বোঝা যায়, কবি 'মারিফুন্নাগমাত' থেকে কাফি ঠাটের অন্তর্গত রাগগুলি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন ; যেমন—মিয়া কি সারং, পঠমঞ্জরী, সুরদাসী মল্লার, সৈন্ধবী ইত্যাদি। ... এই লেখা এই গ্রন্থের প্রায় হুবহু অনুসরণ। শুধু 'রাগ' কথাটির পরিবর্তে 'রাগিণী' কথাটি লক্ষণীয়। রাগিণী কথাটি প্রাচীন সংস্কার, একালে পরিত্যক্ত। কবি কিন্তু সংস্কারটি ত্যাগ করেননি ; দেখা যায় অন্যত্রও তিনি রাগিণী কথাটি ব্যবহার করেছেন। ('বেণুকা' ও 'দোলনচাঁপা' দুটি রাগিণীই আমার সৃষ্টি)। ... 'মারিফুন্নাগমাতে' কবি দেড়শতাধিক রাগের লক্ষণগীতি হাতে পেলেন। অর্থাৎ রাগ পরিচয় ও স্বরবিস্তার ছাড়াও প্রত্যেক রাগের একটি করে গানের মডেল স্বরলিপিসহ হাতের কাছে পাওয়া গেল। এই মডেলগুলির কাঠামো বজায় রেখে কবি অনুরূপ বন্দিশে ... বাঁধতে পারতেন। স্বরগুলো তো ছকে সাজানোই ছিল, তার নিচে পছন্দমতো বাংলা কথা বসিয়ে দিলে

খুব সহজে বহুসংখ্যক রাগভিত্তিক নজরুল-গীতির জন্ম হতো। কবি কিন্তু তা করেননি। কবি রাগভিত্তিক গান বেঁধেছেন রাগের ধ্যানমূর্তি মানসপটে প্রতিষ্ঠা করে নিয়ে। লক্ষণগীতির স্বরলিপিতে রাগ কূপের জলের মতো অকিঞ্চিৎকর। রাগের মোহিনীমূর্তি আবির্ভূত হয় উপযুক্ত গুণীর কণ্ঠে অথবা যন্ত্রে। রাগ তখন রঙে রসে বৈভবে কলস্বিনী নদীর মতো অনুভবের জোয়ারে শ্রবণতট রসপ্লাবিত করে। রসের সেই মূর্তি কবি নিয়ত সন্ধান করেছেন উপযুক্ত গুণীজনের কাছে কখনো শিক্ষার্থী হয়ে, কখনো ফরমাস করে কখনো বা উৎকর্ণ শ্রোতার আসনে বসে। পুথির বিধান কবিকে রাগের ব্যাকরণ দিয়েছে, রাগের রসমাধুর্য দিয়েছেন শিল্পীজন।'

অমল কুমার মিত্রের এ আলোচনা থেকে নজরুলের 'সুর ও শ্রুতির' উৎস এবং বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

[আমরা নজরুলের সুর ও শ্রুতি'র পাঠ গ্রহণ করেছি আবদুল আজীজ আল আমান সম্পাদিত অপ্রকাশিত নজরুল গ্রন্থে মুদ্রিত পাণ্ডুলিপি থেকে। সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে জনাব জিয়াদ আলী থেকে প্রাপ্ত নজরুল লিখিত ৪ পৃষ্ঠা। সম্পাদক]

জীবনপঞ্জি

১৮৯৯	১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ২৪শে মে ১৮৯৯ সালে পশ্চিম-বঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্ম। পিতামহ কাজী আমিনুল্লাহ। পিতা কাজী ফকির আহমদ। মাতামহ তোফায়েল আলী। মাতা জাহেদা খাতুন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাজী সাহেবজান। কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাজী আলী হোসেন। ভগ্নী উম্মে কুলসুম। নজরুলের ডাক-নাম ছিল দুখু মিয়া।
১৯০৮	পিতা কাজী ফকির আহমদের মৃত্যু।
১৯০৯	গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাইমারি পাশ, মক্তবে শিক্ষকতা, মাজারের সেবক, লেটো দলের সদস্য ও পালাগান ইত্যাদি রচনা।
১৯১১	মাথরুন গ্রামে নবীনচন্দ্র ইন্সটিটিউটে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র।
১৯১২	স্কুল ত্যাগ, বাসুদেবের কবিদলের সঙ্গে সম্পর্ক, রেলওয়ে গার্ড সাহেবের খানসামা, আসানসোলে এম বখশের চা রুটির দোকানে চাকুরি, আসানসোলে পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর ময়মনসিংহের কাজী রফিজউল্লাহ ও তাঁর পত্নী শামসুন্নেসা খানমের স্নেহ লাভ।
১৯১৪	কাজী রফিজউল্লাহর সহায়তায় ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালের কাজীর-সিমলা, দরিরামপুর গমন এবং দরিরামপুর স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র।
১৯১৫-১৭	রানিগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ স্কুলে অষ্টম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন, শৈলজানন্দের সঙ্গে বন্ধুত্ব। প্রিটেস্ট পরীক্ষার আগে সেনাবাহিনীর ৪৯নম্বর বাঙালি পল্টনে যোগদান।
১৯১৭-১৯	সৈনিক জীবন, প্রধানত করাচিতে গনজা বা আবিসিনিয়া লাইনে অতিবাহিত, ব্যাটালিয়ান কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার পদে উন্নতি, সাহিত্য-চর্চা। কলকাতার মাসিক সওগাতে 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' গল্প এবং ত্রৈমাসিক বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায় 'মুক্তি' কবিতা প্রকাশ।
১৯২০	মার্চ মাসে সেনাবাহিনী থেকে প্রত্যাবর্তন, বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির ৩২নম্বর কলেজ স্ট্রিটস্থ দফতরে মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে অবস্থান, কলকাতায় সাহিত্যিক ও সাংবাদিক জীবন শুরু, 'মোসলেম ভারত', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বিবিধ রচনা প্রকাশ।

	সাংবাদিক জীবন : মে মাসে এ. কে. ফজলুল হকের সান্ধ্য-দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকায় যুগ্ম-সম্পাদক পদে যোগদান, নজরুল ও মুজফ্ফর আহ্মদের ৮-এ টার্নার স্ট্রিটে অবস্থান, সেপ্টেম্বর মাসে 'নবযুগ' পত্রিকার জামানত বাজেয়াপ্ত এবং নজরুল ও মুজফ্ফর আহ্মদের বরিশাল ভ্রমণ, 'নবযুগ'-এর চাকুরি পরিত্যাগ, বায়ু পরিবর্তনের জন্যে দেওঘর গমন।
১৯২১	দেওঘর থেকে প্রত্যাবর্তন, 'মোসলেম ভারতে'র সম্পাদক আফজাল-উল-হকের সঙ্গে ৩২নম্বর কলেজ স্ট্রিটে অবস্থান, পুনরায় 'নবযুগে' যোগদান। এপ্রিল মাসে আলী আকবর খানের সঙ্গে কুমিল্লা যাত্রা, কান্দিরপাড়ে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত ও বিরজাসুন্দরী দেবীর আতিথ্য গ্রহণ, আলী আকবর খানের সঙ্গে দৌলতপুর গমন ও দুই মাস দৌলতপুর অবস্থান, আলী আকবর খানের ভাগিনেয়ী সৈয়দা খাতুন ওরফে নার্গিস আসার খানমের সঙ্গে ১৩২৮ সালের ৩রা আষাঢ় তারিখে বিবাহ। কুমিল্লা থেকে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের পরিবারের সকলের অনুষ্ঠানে যোগদান, বিবাহের রাত্রেই নজরুলের দৌলতপুর ত্যাগ ও পরদিন কুমিল্লা প্রত্যাবর্তন এবং অবস্থান। কলকাতায় বিবাহ-সংক্রান্ত গোলযোগের বার্তা প্রেরণ। জুলাই মাসে মুজফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে কুমিল্লা থেকে চাঁদপুর হয়ে কলকাতা প্রত্যাবর্তন, ৩/৪সি তালতলা লেনের বাড়িতে অবস্থান, অক্টোবর মাসে অধ্যাপক (ডক্টর) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র সঙ্গে শান্তিনিকেতন ভ্রমণ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ। নভেম্বর মাসে পুনরায় কুমিল্লা গমন, অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ। কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। ডিসেম্বরের শেষ দিকে কলকাতায় তালতলা লেনের বাড়িতে বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী' রচনা। 'বিদ্রোহী' সাপ্তাহিক 'বিজলী' ও মাসিক 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় ছাপা হলে প্রবল আলোড়ন।
১৯২২	পুনরায় কুমিল্লায় আগমন, চার মাস কুমিল্লা অবস্থান, আশালতা সেনগুপ্তা ওরফে প্রমীলার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক। মার্চ মাসে প্রথম গ্রন্থ 'ব্যথার দান' প্রকাশ। ২৫শে জুন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু, কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শোক সভায় যোগদান, সত্যেন দত্ত সম্পর্কে রচিত শোক-কবিতা পাঠ। দৈনিক 'সেবকে' যোগদান ও চাকরি পরিত্যাগ। ১২ই আগস্ট অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' প্রকাশ, ধূমকেতুর জন্য রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ধূমকেতুতে 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা প্রকাশ, অক্টোবর মাসে 'অগ্নি-বীণা' কাব্য ও 'যুগবাণী' প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ, 'যুগবাণী' সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ, ধূমকেতুতে প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' বাজেয়াপ্ত, নভেম্বর মাসে নজরুলকে কুমিল্লায় গ্রেপ্তার ও কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে আটক। 'ধূমকেতু' পত্রিকাতেই নজরুল প্রথম ভারতের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেছিলেন ১৩ই অক্টোবর ১৯২২ সংখ্যায়।

১৯২৩ জানুয়ারি মাসে বিচারকালে নজরুলের বিখ্যাত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' আদালতে উপস্থাপন, এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড, আলিপুর জেলে স্থানান্তর, নজরুলকে রবীন্দ্রনাথের 'বসন্ত' গীতিনাটক উৎসর্গ, হুগলি জেলে স্থানান্তর, মে মাসে নজরুলের অনশন ধর্মঘট, শিলং থেকে রবীন্দ্রনাথের টেলিগ্রাম, 'Give up hunger strike, our literature claims you', বিরজাসুন্দরী দেবীর অনুরোধে অনশন ভঙ্গ, জুলাই মাসে বহরমপুর জেলে স্থানান্তর, ডিসেম্বরে মুক্তিলাভ।

১৯২৪ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মেদিনীপুর শাখার একাদশ বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান। মিসেস এম রহমানের উদ্যোগে এপ্রিলে প্রমীলার সঙ্গে বিবাহ, হুগলিতে নজরুলের সংসার স্থাপন, অগাস্টে 'বিষের বাঁশী' ও 'ভাঙার গান' প্রকাশ ও সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত, 'শনিবারের চিঠি'তে নজরুল–বিরোধী প্রচারণা। হুগলিতে নজরুলের প্রথম পুত্র আজাদ কামালের জন্ম ও অকালমৃত্যু।

১৯২৫ মে মাসে কংগ্রেসের ফরিদপুর অধিবেশনে যোগদান। এই অধিবেশনের গুরুত্ব, মহাত্মা গান্ধি এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের যোগদান। জুলাই মাসে বাঁকুড়া সফর, 'কল্লোল' পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক, ডিসেম্বর মাসে নজরুল ইসলাম, হেমন্তকুমার সরকার, কুতুবউদ্দীন আহ্‌মদ ও শামসুদ্দিন হোসায়ন কর্তৃক ভারতীয় কংগ্রেসের অন্তর্গত, 'মজুর স্বরাজ পার্টি' গঠন। ডিসেম্বরে শ্রমিক প্রজা স্বরাজ দলের মুখপত্র 'লাঙল' প্রকাশ, প্রধান পরিচালক কাজী নজরুল ইসলাম। 'লাঙল'–এর জন্যেও রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী। 'লাঙল' বাংলা ভাষায় প্রথম শ্রেণীসচেতন পত্রিকা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু ১৬ই জুন। কবিতাসংকলন 'চিত্তনামা' প্রকাশ।

১৯২৬ জানুয়ারি থেকে কৃষ্ণনগরে বসবাস। মার্চ মাসে মাদারিপুরে নিখিল বঙ্গীয় ও আসাম প্রদেশীয় মৎস্যজীবী সম্মেলনে যোগদান। এপ্রিল মাসে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত। এপ্রিলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও হিন্দু–মুসলমান সমস্যা নিয়ে আলোচনা। রবীন্দ্রনাথকে 'চল চঞ্চল বাণীর দুলাল', 'ধ্বংসপথের যাত্রীদল' এবং 'শিকল–পরা ছল' গান শোনান। মে মাসে কৃষ্ণনগরে কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের উদ্বোধনী সঙ্গীত 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার', কিষাণ সভায় 'কৃষাণের গান' ও 'শ্রমিকের গান' এবং ছাত্র ও যুব সম্মেলনে 'ছাত্রদলের গান' পরিবেশন। জুলাই মাসে চট্টগ্রাম, অক্টোবর মাসে সিলেট এবং যশোর ও খুলনা সফর। সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলের জন্ম। আর্থিক অনটন। 'দারিদ্র্য' কবিতা রচনা। নভেম্বর মাসে পূর্ববঙ্গ থেকে কেন্দ্রীয় আইন সভার উচ্চ পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পরাজয় বরণ। ডিসেম্বর থেকে গজল রচনার সূত্রপাত,

'বাগিচায় বুলবুলি', 'আসে বসন্ত ফুলবনে', 'দুরন্ত বায়ু পুরবইয়াঁ', 'মৃদুল বায়ে বকুল ছায়ে' প্রভৃতি গান ও 'খালেদ' কবিতা রচনা। নজরুলের ক্রমাগত অসুস্থতা।

১৯২৭ ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা সফর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান ও 'খোশ আমদেদ' গানটি পরিবেশন, 'খালেদ' কবিতা আবৃত্তি।

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য নির্বাচিত। কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'গণবাণী' (সম্পাদক মুজফ্ফর আহ্মদ)-র জন্যে এপ্রিল মাসে 'ইন্টারন্যাশনাল', 'রেড ফ্লাগ' ও শেলির ভাব অবলম্বনে যথাক্রমে 'অন্তর ন্যাশনাল সঙ্গীত', 'রক্ত-পতাকার গান' ও 'জাগর তূর্য' রচনা। জুলাই মাসে 'গণবাণী' অফিসে পুলিশের হানা। আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কিত বাদ-প্রতিবাদ। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, নজরুল, সজনীকান্ত দাস, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ সাহিত্যিক এবং 'প্রবাসী', 'শনিবারের চিঠি', 'কল্লোল', 'কালিকলম' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বিতর্ক। ডিসেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজে রবীন্দ্র পরিষদে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ, 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধ এবং নজরুলের 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' প্রবন্ধ, 'রক্ত' অর্থে 'খুন' শব্দের ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক। বিতর্কের অবসানে প্রমথ চৌধুরীর 'বাংলো সাহিত্যে খুনের মামলা' প্রবন্ধ।

'ইসলাম দর্শন', 'মোসলেম দর্পণ' প্রভৃতি রক্ষণশীল মুসলমান পত্রিকায় নজরুল-সমালোচনা। ইব্রাহিম খান, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, আবুল হুসেনের নজরুল-সমর্থন।

১৯২৮ ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান, এই সম্মেলনের উদ্বোধনী সঙ্গীতের জন্যে 'নতুনের গান' রচনা ['চল্ চল্ চল্'] ঢাকায় অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, ফজিলতুন্নেসা, প্রতিভা সোম, উমা মৈত্র প্রমুখের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা।'মে মাসে নজরুলের মাতা জাহেদা খাতুনের এন্তেকাল।

সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে শরৎ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে দিলীপকুমার রায়, সাহানা দেবী ও নলিনীকান্ত সরকারের সঙ্গে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশনা।

অক্টোবর 'সঞ্চিতা' প্রকাশ। 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় নজরুল বিরোধিতা। 'সওগাত' পত্রিকার নজরুল সমর্থন। ডিসেম্বর মাসে নজরুলের রংপুর ও রাজশাহী সফর।

	কলকাতায় নিখিল ভারত কৃষক ও শ্রমিক দলের সম্মেলনে যোগদান। নেহেরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কলকাতায় নিখিল ভারত সোশিয়ালিস্ট যুবক কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান, কবি গোলাম মোস্তফার নজরুল-বিরোধিতা।
	ডিসেম্বরের শেষে কৃষ্ণনগর থেকে নজরুলের কলকাতা প্রত্যাবর্তন, 'সওগাতে' যোগদান। প্রথমে ১১নং ওয়েলেস্‌লি স্ট্রিটে 'সওগাত' অফিস সংলগ্ন ভাড়া বাড়িতে ও পরে ৮/১ পান বাগান লেনে ভাড়া বাড়িতে বসবাস। নজরুলের সঙ্গে গ্রামোফোন কোম্পানির যোগাযোগ।
১৯২৯	১৫ই ডিসেম্বর এলবার্ট হলে নজরুলকে জাতীয় সংবর্ধনা প্রদান, উদ্যোক্তা 'সওগাত' সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, হবীবুল্লাহ্ বাহার প্রমুখ। সংবর্ধনা সভায় সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রধান অতিথি সুভাষচন্দ্র বসু।
১৯৩০	'প্রলয়-শিখা' প্রকাশ, কবির বিরুদ্ধে মামলা ও ছয় মাসের কারাদণ্ড। কিন্তু গান্ধি-আরউইন চুক্তির ফলে ও সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার দরুণ কারাবাস থেকে রেহাই। কবির দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলের মৃত্যু।
১৯৩১	সিনেমা ও মঞ্চ-জগতের সঙ্গে যোগাযোগ।
	'আলেয়া' গীতিনাট্য রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ। নজরুলের অভিনয়ে অংশগ্রহণ। গ্রীষ্মে 'বর্ষবাণী' সম্পাদিকা জাহান আরা চৌধুরীর সঙ্গে দার্জিলিং ভ্রমণ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ।
১৯৩২	নভেম্বরে সিরাজগঞ্জে 'বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনে' সভাপতিত্ব।
	ডিসেম্বরে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের' পঞ্চম অধিবেশনে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন।
১৯৩৪	'ধ্রুব' চিত্রে নারদের ভূমিকায় অভিনয়, সঙ্গীত পরিচালনা।
	গ্রামোফোন রেকর্ডের দোকান 'কলগীতি' প্রতিষ্ঠা।
১৯৩৬	ফরিদপুর 'মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশনের কনফারেন্সে' সভাপতিত্ব।
১৯৩৮	এপ্রিলে, কলকাতায় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে' কাব্য শাখার অধিবেশনে সভাপতিত্ব।
	ছায়াচিত্র 'বিদ্যাপতি'র কাহিনী রচনা।
১৯৩৯	ছায়াচিত্র 'সাপুড়ে'র কাহিনী রচনা।
১৯৪০	কলকাতা বেতারে 'হারামণি', 'নবরাগ মালিকা' প্রভৃতি নিয়মিত সঙ্গীত অনুষ্ঠান প্রচার। লুপ্ত রাগ-রাগিণীর উদ্ধার ও নবসৃষ্ট রাগিণীর প্রচার অনুষ্ঠান দুটির বৈশিষ্ট্য।
	অক্টোবর মাসে, নব পর্যায়ে প্রকাশিত 'নবযুগে'র প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত।
	ডিসেম্বরে কলকাতা মুসলিম ছাত্র সম্মেলনে ভাষণ।
	প্রমীলা নজরুল পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত।
১৯৪১	মার্চ, বনগাঁ সাহিত্য-সভার চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব।

৫ই ও ৬ই এপ্রিল নজরুলের সভাপতিত্বে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র রজত জুবিলি উৎসবে সভাপতিরূপে জীবনের শেষ গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান, 'যদি আর বাঁশি না বাজে'।

১৯৪২ ১০ই জুলাই দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। ১৯শে জুলাই, কবি জুলফিকার হায়দারের চেষ্টায়, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আর্থিক সহায়তায় নজরুলের বায়ু পরিবর্তনের জন্য ডাঃ সরকারের সঙ্গে মধুপুর গমন। মধুপুরে অবস্থার অবনতি। ২১শে সেপ্টেম্বর মধুপুর থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। অক্টোবর মাসের শেষের দিকে ডা. গিরীন্দ্রশেখর বসুর 'লুম্বিনি পার্কে' চিকিৎসার জন্য ভর্তি। অবস্থার উন্নতি না ঘটায় তিন মাস পর বাড়িতে প্রত্যাবর্তন। কলকাতায় নজরুল সাহায্য কমিটি গঠন।

সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ— ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
যুগ্ম সম্পাদক— সজনীকান্ত দাস
জুলফিকার হায়দার
কার্যনির্বাহী কমিটির সভ্য— এ. এফ. রহমান
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
বিমলানন্দ তর্কতীর্থ
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
তুষারকান্তি ঘোষ
চপলাকান্ত ভট্টাচার্য
সৈয়দ বদরুদ্দোজা
গোপাল হালদার।

এই সাহায্য কমিটি কর্তৃক পাঁচ মাস কবিকে মাসিক দুইশত টাকা করে সাহায্য প্রদান।

১৯৪৪ বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকার 'নজরুল-সংখ্যা' (কার্তিক-পৌষ ১৩৫১) প্রকাশ।

১৯৪৫ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নজরুলকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান।

১৯৪৬ নজরুল পরিবারের অভিভাবিকা নজরুলের শাশুড়ি গিরিবালা দেবী নিরুদ্দেশ। নজরুলের সৃষ্টিকর্ম মূল্যায়নে প্রথম গ্রন্থ কাজী আবদুল ওদুদ কৃত 'নজরুল-প্রতিভা' প্রকাশ। গ্রন্থের পরিশিষ্টে কবি আবদুল কাদির প্রণীত নজরুল-জীবনীর সংক্ষিপ্ত রূপরেখা সংযোজিত।

১৯৫২ 'নজরুল নিরাময় সমিতি' গঠন। সম্পাদক কাজী আবদুল ওদুদ। জুলাই মাসে নজরুল ও তাঁর পত্নীকে রাঁচি মানসিক হাসপাতালে প্রেরণ। চার মাস চিকিৎসা, সুফলের অভাবে কলকাতা আনয়ন।

১৯৫৩ মে মাসে নজরুল ও তাঁর পত্নী প্রমীলাকে চিকিৎসার জন্য লণ্ডন প্রেরণ করা হয়। 'জল আজাদ' নামক জাহাজে লণ্ডন যাত্রার আগে কবি ও কবি-পত্নী বোম্বাইয়ের (বর্তমানে মুম্বাই) মেরিন ড্রাইভের 'সী গ্রীন হোটেল'-এ

অবস্থান করেন। ঐ হোটেলের সভাকক্ষে নজরুলের সম্মানে এক বিরাট সংবর্ধনা–সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন উপমহাদেশের বহু খ্যাতনামা চলচ্চিত্র–শিল্পী, কবি–সাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞ। অশোককুমার, প্রদীপকুমার, কে. এস. ইউসুফ, কামাল আমরোহী, কে. এ. আব্বাস, মুকেশ, নৌশাদ আলী ছাড়াও, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যোশ মালিহাবাদী, কাইফি আজমী, খৈয়াম, সাহীর লুধিয়ানভী, মাজাজ লাখনভী, কাতিল সিপাহী, ফিরাক গোরকপুরী, ফয়েজ আহমদ ফয়েজ। নজরুল–বন্দনায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন কাইফী আজমী ও শাতীর লুধিয়ানভী। নজরুলের 'ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি' গানটি পরিবেশন করেন হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে কবির চিকিৎসার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ৫০ হাজার টাকা তুলে একটি থলিতে কবির হাতে প্রদান করা হয়। এই সংবর্ধনা–অনুষ্ঠান নজরুল–জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। [তথ্যসূত্র : 'নজরুল স্মৃতি', ডঃ অশোক বাগচী, নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা, জুন, ১৯৯৫]। লন্ডনে মানসিক চিকিৎসক উইলিয়ম স্যারগন্ট, ই. এ. বেটন, ম্যাকসিক ও রাসেল ব্রেনের মধ্যে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যাপারে মতভেদ, ডিসেম্বর মাসে নজরুলকে ভিয়েনাতে প্রেরণ। ভিয়েনায় বিখ্যাত স্নায়ুচিকিৎসক ডা. হ্যান্স হফ্ কর্তৃক সেরিব্রাল এনজিওগ্রাম পরীক্ষার ফল, নজরুল 'পিকস ডিজিজ' নামে মস্তিষ্ক রোগে আক্রান্ত এবং তা চিকিৎসার বাইরে। ডিসেম্বর মাসে নজরুল ও তাঁর পত্নীকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়।

১৯৬০ ভারত সরকার কর্তৃক নজরুলকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি দান।

১৯৬২ ৩০শে জুন নজরুল–পত্নী প্রমীলা নজরুলের দীর্ঘ রোগ ভোগের পর পরলোক গমন। প্রমীলা নজরুলকে চুরুলিয়ায় দাফন। নজরুলের দুই পুত্র কাজী সব্যসাচী ইসলাম ও কাজী অনিরুদ্ধ ইসলামের জন্ম ও মৃত্যু যথাক্রমে ১৯২৯ ও ১৯৭৪ এবং ১৯৩১ ও ১৯৭৯ সালে।

১৯৬৬ কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় ঢাকার 'কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড' কর্তৃক 'নজরুল–রচনাবলী' প্রথম খণ্ড প্রকাশ।

১৯৬৯ সম্বিতহারা কবির সত্তর বৎসর পূর্ণ এবং সর্বত্র কবি কাজী নজরুল ইসলামের সপ্ততিতম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন। কলকাতার রবীন্দ্র–ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি প্রদান।

১৯৭১ ২৫শে মে নজরুল জন্মবার্ষিকীর দিন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরিচালক প্রবাসী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নব পর্যায়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার শুরু।

১৯৭২ স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম নজরুল–জন্মবার্ষিকীর প্রাক্কালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে নজরুলকে সপরিবার ঢাকায় আনয়ন, ধানমণ্ডিতে কবিভবনে অবস্থান এবং সেখানে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উড্ডীন। স্বাধীন বাংলাদেশে কবির প্রথম জন্মবার্ষিকী কবিকে নিয়ে

উদ্‌যাপন। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ও প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক কবিভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।

১৯৭৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি প্রদান।

১৯৭৫ ২২শে জুলাই কবিকে পি. জি. হাসপাতালে স্থানান্তর, ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট মোট এক বছর এক মাস আট দিন পিজি হাসপাতালের ১৯৭নং কেবিনে নিঃসঙ্গ জীবন।

১৯৭৬ ২১শে ফেব্রুয়ারি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'একুশে পদক' প্রচলন ও নজরুলকে পদক প্রদান।

ঐ বছরেই আগস্ট মাসে কবির স্বাস্থ্যের অবনতি। ২৭শে আগস্ট শুক্রবার বিকেল থেকে কবির শরীরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তিনি ব্রঙ্কো-নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। ২৯শে আগস্ট রবিবার সকালে কবির দেহের তাপমাত্রা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়ে ১০৫ ডিগ্রি অতিক্রম করে যায়। কবিকে অক্সিজেন দেওয়া হয় এবং সাকশান-এর সাহায্যে কবির ফুসফুস থেকে কফ ও কাশি বের করার চেষ্টা চলে। কিন্তু চিকিৎসকদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও কবির অবস্থার উন্নতি হয় না—সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১২ই ভাদ্র ১৩৮৩ সাল মোতাবেক ২৯শে আগস্ট ১৯৭৬ সকাল ১০টা ১০ মিনিটে কবি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। বেতার এবং টেলিভিশনে কবির মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হলে পিজি হাসপাতালে শোকাহত মানুষের ঢল। কবির মরদেহ প্রথমে পিজি হাসপাতালের গাড়ি বারান্দার ওপরে, পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি-র সামনে রাখা হয়। অবিরাম জনস্রোত এবং কবির মরদেহে পুষ্প দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

কবির নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় বাদ আসর সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে। স্মরণকালের সর্ববৃহৎ জানাজায় লক্ষ লক্ষ মানুষ শামিল হন। নামাজে জানাজা শেষে শোভাযাত্রা সহযোগে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা শোভিত কবির মরদেহ বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে নিয়ে যাওয়া হয়। কবির মরদেহ বহন করেন তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল এম. এইচ. খান, বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ. জি. মাহমুদ, বি.ডি.আর. প্রধান মেজর জেনারেল দস্তগীর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন। পরবর্তী কালে কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদা প্রদান করা হয় ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৯৮-২০০০ সালে বিশ্বব্যাপী মহাসমারোহে নজরুল-জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন।

গ্রন্থপঞ্জি

ব্যথার দান	গল্প। ফাল্গুন ১৩২৮, ১লা মার্চ ১৯২২। উৎসর্গ—'মানসী আমার! মাথার কাঁটা নিয়েছিলুম বলে ক্ষমা করোনি, তাই বুকের কাঁটা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলুম'।
অগ্নি-বীণা	কবিতা। কার্তিক ১৩২৯, ২৫শে অক্টোবর ১৯২২। উৎসর্গ—'ভাঙা-বাংলার রাঙা-যুগের আদি পুরোহিত, সাগ্নিক বীর শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু'।
যুগ-বাণী	প্রবন্ধ। কার্তিক ১৩২৯, ২৬শে অক্টোবর ১৯২২। বাজেয়াপ্ত ২৩শে নভেম্বর ১৯২২, দ্বিতীয় মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬।
রাজবন্দীর জবানবন্দী	ভাষণ। ১৩২৯ সাল, ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ। পুস্তিকাকারে প্রকাশিত।
দোলন-চাঁপা	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩০, অক্টোবর ১৯২৩।
বিষের বাঁশী	কবিতা ও গান। শ্রাবণ ১৩৩১, ১০ই আগস্ট ১৯২৪। উৎসর্গ—'বাংলার অগ্নি-নাগিনী মেয়ে মুসলিম-মহিলা-কূল-গৌরব আমার জগজ্জননী-স্বরূপা মা মিসেস এম. রহমান সাহেবার পবিত্র চরণারবিন্দে।' বাজেয়াপ্ত ২২শে অক্টোবর ১৯২৪, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ২৯শে এপ্রিল ১৯৪৫।
ভাঙার গান	কবিতা ও গান। শ্রাবণ ১৩৩১, আগস্ট ১৯২৪। উৎসর্গ—'মেদিনীপুরবাসীর উদ্দেশে'। বাজেয়াপ্ত ১১ই নভেম্বর ১৯২৪, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪৯।
রিক্তের বেদন	গল্প। পৌষ ১৩৩১, ১২ই জানুয়ারি ১৯২৫।
চিত্তনামা	কবিতা ও গান। শ্রাবণ ১৩৩২, আগস্ট ১৯২৫, উৎসর্গ—'মাতা বাসন্তী দেবীর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দে'।
ছায়ানট	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩২, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯২৫। উৎসর্গ—'আমার শ্রেয়তম রাজলাঞ্ছিত বন্ধু মুজফ্ফর আহ্মদ ও কুতুবউদ্দীন আহ্মদ করকমলে'।
সাম্যবাদী	কবিতা। পৌষ ১৩৩২, ২০শে ডিসেম্বর ১৯২৫।
পূবের হাওয়া	কবিতা ও গান। মাঘ ১৩৩২, ৩০শে জানুয়ারি ১৯২৬।

ঝিঙে ফুল	ছোটদের কবিতা। চৈত্র ১৩৩২, ১৪ই এপ্রিল ১৯২৬।
দুর্দিনের যাত্রী	প্রবন্ধ। আশ্বিন ১৩৩৩, অক্টোবর ১৯২৬।
সর্বহারা	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩৩, ২৫শে অক্টোবর ১৯২৬। উৎসর্গ—'মা (বিরজাসুন্দরী দেবী)–র শ্রীচরণারবিন্দে'।
রুদ্রমঙ্গল	প্রবন্ধ। ১৯২৭।
ফণি-মনসা	কবিতা ও গান। শ্রাবণ ১৩৩৪, ২৯শে জুলাই ১৯২৭।
বাঁধনহারা	উপন্যাস। শ্রাবণ ১৩৩৪, আগস্ট ১৯২৭। উৎসর্গ—'সুর-সুন্দর শ্রীনলিনীকান্ত সরকার করকমলেষু'।
সিন্ধু-হিন্দোল	কবিতা। উৎসর্গ—বাহার ও নাহারকে, ১৩৩৪/১৯২৮।
সঞ্চিতা	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩৫, ২রা অক্টোবর ১৯২৮।
সঞ্চিতা	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩৫, ১৪ই অক্টোবর ১৯২৮। উৎসর্গ— 'বিশ্বকবিসম্রাট শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু'।
বুলবুল	গান। কার্তিক ১৩৩৫, ১৫ই নভেম্বর, ১৯২৮। উৎসর্গ—'সুর-শিল্পী, বন্ধু দিলীপকুমার রায় করকমলেষু'।
জিঞ্জীর	কবিতা ও গান। কার্তিক ১৩৩৫, ১৫ই নভেম্বর ১৯২৮।
চক্রবাক	কবিতা। ভাদ্র ১৩৩৬, ১২ই আগস্ট ১৯২৯। উৎসর্গ— 'বিরাট-প্রাণ, কবি, দরদী প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র শ্রীচরণারবিন্দেষু'।
সন্ধ্যা	কবিতা ও গান। ভাদ্র ১৩৩৬, ১২ই আগস্ট ১৯২৯। উৎসর্গ—'মাদারিপুর 'শান্তি-সেনা'-র কর-শতদলে ও বীর সেনানায়কের শ্রীচরণাম্বুজে'।
চোখের চাতক	গান। পৌষ ১৩৩৬, ২১শে ডিসেম্বর ১৯২৯। উৎসর্গ— 'কল্যাণীয়া বীণা-কণ্ঠী শ্রীমতী প্রতিভা সোম জয়যুক্তাসু'।
মৃত্যু-ক্ষুধা	উপন্যাস। মাঘ ১৩৩৬, জানুয়ারি ১৯৩০।
রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ	অনুবাদ কবিতা। আষাঢ় ১৩৩৭, ১৪ই জুলাই ১৯৩০। উৎসর্গ—'বাবা বুলবুল ! ...'
নজরুল-গীতিকা	গান। ভাদ্র ১৩৩৭, ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৩০। উৎসর্গ— 'আমার গানের বুলবুলিরা ! ....'
ঝিলিমিলি	নাটিকা। অগ্রহায়ণ ১৩৩৭, ১৫ই নভেম্বর ১৯৩০।
প্রলয়-শিখা	কবিতা ও গান। ১৩৩৭, আগস্ট ১৯৩০। গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০। কবির বিরুদ্ধে ১১ই ডিসেম্বর মামলা এবং ছয় মাসের কারাদণ্ড, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৩০

	কবির জামিন লাভ, আপিল। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা মার্চে অনুষ্ঠিত গান্ধি-আরউইন চুক্তির ফলে সরকার পক্ষের অনুপস্থিতিতে ৩০শে মার্চ ১৯৩১ কলিকাতা হাইকোর্টের রায়ে কবির মামলা থেকে অব্যাহতি, কিন্তু 'প্রলয়-শিখা'র নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮।
কুহেলিকা	উপন্যাস। শ্রাবণ ১৩৩৮, ২১শে জুলাই ১৯৩১।
নজরুল-স্বরলিপি	স্বরলিপি। ভাদ্র ১৩৩৮, আগস্ট ১৯৩১।
চন্দ্রবিন্দু	গান। ১৩৩৮, সেপ্টেম্বর ১৯৩১। উৎসর্গ—'পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমদ্দাঠাকুর—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের শ্রীচরণকমলেষু'। বাজেয়াপ্ত ১৪ই অক্টোবর ১৯৩১। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ৩০শে নভেম্বর ১৯৪৫।
শিউলিমালা	গল্প। কার্তিক ১৩৩৮, ১৬ই অক্টোবর ১৯৩১।
আলেয়া	গীতিনাট্য। ১৩৩৮, ১৯৩১। উৎসর্গ—'নটরাজের চির নৃত্যসাথী সকল নট-নটীর নামে 'আলেয়া' উৎসর্গ করিলাম'।
সুরসাকী	গান। আষাঢ় ১৩৩৯, ৭ই জুলাই ১৯৩২।
বন-গীতি	গান। আশ্বিন ১৩৩৯, ১৩ই অক্টোবর ১৯৩২। উৎসর্গ—'ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকলাবিদ আমার গানের ওস্তাদ জমিরউদ্দিন খান সাহেবের দস্ত মোবারকে'।
জুলফিকার	গান। আশ্বিন ১৩৩৯, ১৩ই অক্টোবর।
পুতুলের বিয়ে	ছোটদের নাটিকা ও কবিতা। সম্ভবত চৈত্র ১৩৪০, এপ্রিল ১৯৩৩।
গুল-বাগিচা	গান। আষাঢ় ১৩৪০, ২৭শে জুন ১৯৩৩। উৎসর্গ—'স্বদেশী মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানির স্বত্বাধিকারী আমার অন্তরতম বন্ধু শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঘোষ অভিন্নহৃদয়েষু—'
কাব্য-আমপারা	অনুবাদ। অগ্রহায়ণ ১৩৪০, ২৭শে নভেম্বর ১৯৩৩। উৎসর্গ—'বাংলার নায়েবে-নবী মৌলবি সাহেবানদের দস্ত মোবারকে'।
গীতি-শতদল	গান। বৈশাখ ১৩৪১, এপ্রিল ১৯৩৪।
সুরলিপি	স্বরলিপি। ভাদ্র ১৩৪১, ১৬ই আগস্ট ১৯৩৪।
সুরমুকুর	স্বরলিপি। আশ্বিন ১৩৪১, ৪ঠা অক্টোবর ১৯৩৪।
গানের মালা	গান। কার্তিক ১৩৪১, ২৩শে অক্টোবর ১৯৩৪। উৎসর্গ—'পরম স্নেহভাজন শ্রীমান অনিলকুমার দাস কল্যাণীয়েষু—'।

মক্তব সাহিত্য	পাঠ্যপুস্তক। শ্রাবণ ১৩৪২, ৩১শে জুলাই ১৯৩৫।
নির্ঝর	কবিতা ও গান। মাঘ ১৩৪৫, ২৩শে জানুয়ারি ১৯৩৯।
নতুন চাঁদ	কবিতা। চৈত্র ১৩৫১, মার্চ ১৯৪৫।
মরু–ভাস্কর	কাব্য। ১৩৫৭, ১৯৫১।
বুলবুল (দ্বিতীয় খণ্ড)	গান। ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯।
সঞ্চয়ন	কবিতা ও গান। ১৩৬২, ১৯৫৫।
শেষ সওগাত	কবিতা ও গান। বৈশাখ, ১৩৬৫, ১৯৫৯।
রুবাইয়াৎ–ই–ওমর খৈয়াম	অনুবাদ। অগ্রহায়ণ ১৩৬৫, ডিসেম্বর ১৯৫৯।
মধুমালা	গীতিনাট্য। মাঘ ১৩৬৫, জানুয়ারি ১৯৬০।
ঝড়	কবিতা ও গান। মাঘ ১৩৬৭, জানুয়ারি ১৯৬১।
ধূমকেতু	প্রবন্ধ। মাঘ ১৩৬৭, জানুয়ারি ১৯৬১।
পিলে পটকা পুতুলের বিয়ে	ছোটদের কবিতা ও নাটিকা। ১৩৭০, ১৯৬৪।
রাঙাজবা	শ্যামাসঙ্গীত। বৈশাখ ১৩৭৩, এপ্রিল ১৯৬৬।
নজরুল–রচনা–সম্ভার	আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮, মে ১৯৬৫।
নজরুল–রচনাবলী	প্রথম খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩, ডিসেম্বর ১৯৬৬। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
নজরুল–রচনাবলী	দ্বিতীয় খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। পৌষ ১৩৭৩, ডিসেম্বর ১৯৬৭। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
নজরুল–রচনাবলী	তৃতীয় খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। ফাল্গুন ১৩৭৬, ফেব্রুয়ারি ১৯৭০। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
সন্ধ্যামালতী	গান। মিত্র ও ঘোষ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রাবণ ১৩৭৭, আগস্ট–সেপ্টেম্বর ১৯৭১।
নজরুল–রচনাবলী	চতুর্থ খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪, মে ১৯৭৭। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
নজরুল–রচনাবলী	পঞ্চম খণ্ড, প্রথমার্ধ। আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১, মে ১৯৮৪। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
নজরুল–রচনাবলী	পঞ্চম খণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ। পৌষ ১৩৯১, ডিসেম্বর ১৯৮৪। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
নজরুল–গীতি অখণ্ড	আবদুল আজিজ আল্–আমান সম্পাদিত। সেপ্টেম্বর ১৯৭৮। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।
অপ্রকাশিত নজরুল	আবদুল আজিজ আল্–আমান সম্পাদিত। অগ্রহায়ণ ১৩৯৬, নভেম্বর ১৯৮৯। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।
লেখার রেখায় রইল আড়াল	কবিতা ও গান। আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত। ভাদ্র ১৪০৫, আগস্ট ১৯৯৮। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

জাগো সুন্দর চির কিশোর — সংগ্রহ ও সম্পাদনা : আসাদুল হক। ২৮শে আগস্ট ১৯৯১। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

নজরুলের 'ধূমকেতু' — নজরুল সম্পাদিত পত্রিকার একত্রিত পুনর্মুদ্রণ। সংগ্রহ ও সম্পাদনা সেলিনা বাহার জামান, ফাল্গুন ১৪০৭, ফেব্রুয়ারি ২০০১।

নজরুলের 'লাঙল' — নজরুল সম্পাদিত পত্রিকার একত্রিত পুনর্মুদ্রণ। মুহম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮, মে ২০০১।

কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র — প্রথম খণ্ড। কলকাতা বইমেলা ২০০১।
দ্বিতীয় খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮, জুন ২০০১।
তৃতীয় খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯, জুন ২০০২।
চতুর্থ খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪১০, জুন ২০০৩।
পঞ্চম খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪১১, জুন ২০০৪।
ষষ্ঠ খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪১২, জুন ২০০৫।
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।

নজরুলের হারানো গানের খাতা — সম্পাদনা : মুহম্মদ নূরুল হুদা, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, আষাঢ় ১৪০৪, জুন ১৯৯৭।

নজরুল-গীতি অখণ্ড — প্রথম সংস্করণ : সম্পাদক, আবদুল আজিজ আল-আমান। তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ : সম্পাদক, ব্রহ্মমোহন ঠাকুর। জানুয়ারি ২০০৪। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।

নজরুল সঙ্গীত সমগ্র — সম্পাদনা : রশিদুন্নবী, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, কার্তিক ১৪১৩/অক্টোবর ২০০৬।

অগ্রন্থিত গান এবং বাণীর পাঠান্তর প্রসঙ্গে

এটা সুবিদিত যে, নজরুল তাঁর অসংখ্য গানে ও বহু কবিতায় বাণীর সংস্কার, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করেছেন। মূল পাণ্ডুলিপিতে তো বটেই, গ্রামোফোন রেকর্ডে শিল্পী-কণ্ঠে গান ধারণ করার আগেও অনেক গানের বাণীতে সংস্কার, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। এ-কারণেই, নজরুলের গানের বইয়ে অন্তর্ভুক্ত অনেক গানের বাণীর সঙ্গে গ্রামোফোন রেকর্ডে ধারণকৃত একই গানের বাণীর অনেক পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। উল্লেখ্য, 'নজরুল রচনাবলী'র জন্মশতবর্ষ সংস্করণে (২০০৮) প্রতিটি খণ্ডেই যথাসম্ভব গানের বাণীর পার্থক্য ও পাঠান্তর পরিশিষ্টে তুলে ধরা হয়েছে। এই কাজটি করা হয়েছে গ্রামোফোন রেকর্ডে ধারণকৃত গানের বাণীর সঙ্গে মিলিয়ে। বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিম বঙ্গের প্রখ্যাত নজরুল-সঙ্গীত গবেষক এবং নজরুল-সঙ্গীত বিশেষজ্ঞদের রচিত নজরুল-সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থাদি ও সঙ্গীত সংকলন এবং অন্যান্য তথ্য-সূত্রের আলোকে।

সবিনয়ে উল্লেখ করছি যে, 'নজরুল-রচনাবলী'র বর্তমান খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত নজরুলের বিপুল সংখ্যক 'অগ্রন্থিত গান'-এর বাণীর পার্থক্য ও পাঠান্তর গ্রন্থের অভ্যন্তরে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি গানের মধ্যেই করা হয়েছে গ্রামোফোন রেকর্ডে ধারণকৃত বাণীর আলোকে, পশ্চিম বঙ্গের নজরুল-সঙ্গীত গবেষক, নজরুল-সঙ্গীত সংগ্রাহক ও সঙ্গীতজ্ঞ ডক্টর ব্রহ্মমোহন ঠাকুর সম্পাদিত এবং কলকাতার হরফ প্রকাশনী প্রকাশিত 'নজরুল-গীতি-অখণ্ড' (২০০৪) গ্রন্থে মূল (সম্পাদক নজরুল-গবেষক আবদুল আজীজ আল আমান) অন্তর্ভুক্ত নজরুল-সঙ্গীতের বাণীর সঙ্গে মিলিয়ে। ব্রহ্মমোহন ঠাকুরের সংগৃহীত ও সম্পাদিত নজরুল-সঙ্গীতের বাণী বিশেষভাবে নির্ভরযোগ্য এবং যথার্থ বলে বিবেচিত হয়েছে এ-কারণে যে, 'নজরুল-গীতি' অখণ্ড গ্রন্থে গানের বাণীর নীচে গ্রামোফোন রেকর্ডের নাম্বার উল্লেখিত না থাকলেও তিনি গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন যে, নজরুলের গানের বইয়ে অন্তর্ভুক্ত বাণীর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করে বাণী সংগ্রহ করেছেন নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ড থেকে। গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানী প্রকাশিত গানের পুস্তিকা থেকে, এবং অন্যান্য নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে (মুখবন্ধটি ২০০২ সালে রচিত)। পরলোকগত ডক্টর ব্রহ্মমোহন ঠাকুর ছিলেন নজরুল-সঙ্গীত এবং নজরুল-সঙ্গীতের গ্রামোফোন রেকর্ডের ভাণ্ডারী। তিনি তাঁর জীবদ্দশায়ই ঢাকার নজরুল ইন্সটিটিউটকে নজরুল-সঙ্গীতের প্রায় দেড় হাজার গ্রামোফোন রেকর্ডের ক্যাসেট উপহার দিয়ে গেছেন। উল্লেখ্য, পরলোকগত ডক্টর ব্রহ্মমোহন ঠাকুরের 'নজরুল-সঙ্গীত নির্দেশিকা' শীর্ষক একটি বৃহৎ-কলেবর গ্রন্থ ঢাকার নজরুল ইন্সটিটিউট থেকে ২৫শে মে, ২০০৯ সালে প্রকাশিত হয়েছে। এই অসাধারণ গবেষণাধর্মী গ্রন্থে ২৬৯৮টি নজরুল-সঙ্গীত সম্পর্কে বহু দুর্লভ তথ্য ও তথ্য-সূত্র এবং গ্রামোফোন কোম্পানীর নাম ও রেকর্ড নম্বর এবং শিল্পীর নাম রয়েছে। নজরুলের অগ্রন্থিত গানের বাণীর পাঠান্তর তৈরিতে এই গ্রন্থটি এবং ব্রহ্মমোহন ঠাকুর সম্পাদিত, 'নজরুল-গীতি' অখণ্ড (তৃতীয় সংস্করণ ২০০৪) এবং নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত এবং রশিদ-উন নবী সম্পাদিত 'নজরুল-সঙ্গীত সমগ্র' (২০০৬) বিশেষ সহায়ক হয়েছে। যে-সব গানের বাণীতে পার্থক্য বেশি রয়েছে সে-গুলোর কয়েকটির পাঠান্তর এখানে দেওয়া হলো।

উল্লেখযোগ্য যে, 'নজরুল-রচনাবলী'র অষ্টম খণ্ডে (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ব্রহ্মমোহন ঠাকুর সংগৃহীত ও সম্পাদিত এবং নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত 'অগ্রন্থিত নজরুল রচনা সম্ভার' (জানুয়ারী ২০০১) গ্রন্থের ১২৭টি অগ্রন্থিত নজরুল-সঙ্গীত। পরিশেষে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত 'নজরুল রচনাবলী'র তৃতীয় খণ্ডে বহু 'অগ্রন্থিত কবিতা ও গান' একসঙ্গে ছিল। 'নজরুল-রচনাবলী'র জন্মশতবর্ষ সংস্করণে (২০০৯) অগ্রন্থিত কবিতাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে নবম খণ্ডে এবং অগ্রন্থিত গানসমূহের বিরাট অংশ বর্তমান খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এখানে প্রদত্ত গ্রামোফোন রেকর্ডের নম্বর ও অন্যান্য তথ্য নেওয়া হয়েছে ব্রহ্মমোহন ঠাকুর সম্পাদিত 'নজরুল-সঙ্গীত' নির্দেশিকা গ্রন্থ থেকে।

অগ্রন্থিত গানের বাণীর পাঠান্তর

গানের প্রথম পংক্তি	নজরুল-রচনাবলী-৩য় খণ্ড ১৯৯৩ গানের প্রথম পংক্তি	'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) ২০০৪ গানের প্রথম পংক্তি
১	২	৩
১. দূর-বনান্তের পথভূলি	'দূর-বনান্তের পথ ভূলি' গানের একটি পংক্তি 'নজরুল-রচনাবলী' ৩য় খণ্ডে (১৯৯৩) নিম্নরূপ : 'কোথায় ঠাই দিই তোরে ভীরু পাখি'। নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' (২০০৬) গ্রন্থে পংক্তিটি : 'কোথা দিই ঠাই তোরে ওরে ভীরু পাখি,	'দূর বনান্তের পথ ভুলি' গানটির রেকর্ড নং এইচ.এম. ভিপি ১১৭৭৯ শিল্পী : ইন্দুবালা
২. আমিনা দুলাল এস মদিনায়	'আমিনা দুলাল এস মদিনায়' 'নজরুল-রচনাবলী' ৩য় খণ্ডে (১৯৯৩) নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো নেই : 'শোকে বেদনার পাপের জ্বালায় হের প্রায় আজি বিশ্ব-নিখিল খোদার হাবিব এসে বাঁচাও বাঁচাও, বাঁচাও বসাও খুশীর হাট তাজা কর দীল।	'নজরুল-গীতি (অখণ্ড) গ্রন্থে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো আছে : 'শোকে বেদনার পাপের জ্বালায় হের মৃত প্রায় আজি বিশ্ব-নিখিল খোদার হাবিব এসে বাঁচাও বাঁচাও বসাও খুশীর খাট তাজা কর দীল। রেকর্ড নং এফ.টি ১২৩০৫ টুইন শিল্পী : আবদুল লতিফ
৩. এল আবার ঈদ ফিরে এল আবার ঈদ	'এল আবার ঈদ ফিরে এল অবার ঈদ' 'নজরুল রচনাবলী'তে (১৯৯৩) ৩য় খণ্ডে নিমোক্ত পংক্তিটি নেই : 'আজের মতো জীবন পথে চলব দলে দলে' 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' গ্রন্থে পংক্তিটি আছে।	'এল আবার ঈদ ফিরে এল আবার ঈদ' 'নজরুল গীতি' (অখণ্ড) পংক্তিটি : 'আজের মত জীবন-পথে চলব দলে দলে' রেকর্ড নং এন ৭৪৪৮ এইচ.এম.ভি শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ

১	২	৩
৪. ওরে ও দরিয়ার মাঝি	'ওরে ও দরিয়ার মাঝি' 'নজরুল রচনাবলী'তে (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩) একটি পংক্তি : 'তাঁহারি পরশ বিনা' 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' গ্রন্থে (২০০৬) পংক্তিটি : 'আমার হজরতের দরশ বিনা'	'ওরে ও দরিয়ার মাঝি' 'নজরুল-গীতি (অখণ্ড) গ্রন্থে (২০০৪) গ্রন্থে পংক্তিটি : 'আমার হজরতের পরশ বিনা' রেকর্ড নং এফ.টি ৪২১৬ টুইন শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন
৫. নিখিল ঘুমে অচেতন	'নিখিল ঘুমে অচেতন' 'নজরুল-রচনালবী'তে (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩) একটি স্তবক নিম্নরূপ 'চন্দ্র সূর্য তারকা সবে ঝুঁকে পরে কুর্ণিশ করে নীরবে হেরে আমিনার কোলে খোদার সাথী দোলে-দোলে রে।	নিখিল ঘুমে অচেতন' 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থে (২০০৪) নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো নেই : 'চন্দ্র সূর্য তারকা সবে ঝুঁকে পড়ে কুর্ণিশ করে নীরবে হেরে আমিনার কোলে খোদার সাথী দোলে দোলে রে' রেকর্ড নং এফ.টি ৪৪০০ টুইন শিল্পী : আবদুল লফিত
৬. প্রিয় মুহরে নবুয়তধারী হে হজরত	'প্রিয় মুহরে নবুয়তধারী হে হজরত' 'নজরুল রচনাবলী-তে (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩) নিম্নোক্ত স্তবকটি আছে : 'দিলে দিল-এ দিলাশা, বিপদে ভরসা এক সে খোদার যত পাপী-তাপীরে ধরি পুণ্য বুকে করিলে বেড়া পার।' 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' (২০০৬) গ্রন্থে উপরোক্ত পংক্তিগুলো নেই।	'প্রিয় মুহরে নবুয়তধারী হে হজরত' 'নজরুল-গীতি'-অখণ্ড (২০০৪) গ্রন্থে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো নেই : 'দিলে দিল-এ দিলাশা বিপদে ভরসা এক সে খোদার যত পাপী-তাপীরে ধরি পুণ্য বুকে করিলে বেড়া পার।' রেকর্ড নং এন ৯৭৪৫ এইচ.এম.ভি শিল্পী : সাকিনা বেগম আশ্চর্যময়ী

১	২	৩
৭. সই পলাশ বনে রঙ ছড়ালো কে?	'সই পলাশ বনে রঙ ছড়ালো কে? 'নজরুল রচনাবলী'-তে (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩) নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো আছে, 'সেই বনে বনে মনিস-তীরে পাখি ডেকে গেলো।' 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' গ্রন্থে (২০০৬) পংক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'সেই রঙে রঙীন মানুষটিরে কাছে ডেকে দেলো' 'নজরুল রচনাবলী'তে (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩) একটি পংক্তি : 'হাওয়া এলোমেলোয়'। উক্ত পংক্তিটি 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' গ্রন্থে (২০০৬) নিম্নরূপ : 'রঙ ছুঁড়ে চোখে॥'	'সই পলাশ বনে রঙ ছড়ালো কে?' রেকর্ড নং এন ১৭৪৬৯ এইচ.এম. ভি শিল্পী : পারুল সেন
৮. আমি প্রভাতী তারা পূর্বাচলে	'আমি প্রভাতী তারা পূর্বাচলে' 'নজরুল-রচনাবলী-তে (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩) গানের শেষ স্তবক নিম্নরূপ : 'আমি অলস-শয়না নব বধূর ভাঙি ঘুম', আমি পাণ্ডুর চাঁদের চুম উষসীর রাঙা কপোলে।'	'আমি প্রভাতী তারা পূর্বাচলে' 'নজরুল-গীতি'-অখণ্ড গ্রন্থে (২০০৪) গানের শেষ স্তবক নিম্নরূপ : 'আমি কনক-কদম তিমির নীপ-শাখায় আমি মধ্যমনি মালিকায় শ্যাম গগন-গলে।' 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' গ্রন্থে পংক্তিগুলো একইরূপ। রেকর্ড নং এন ৯৭৩৯ এইচ.এম. ভি শিল্পী : যূথিকা রায়
৯. ফাগুন ফুরাবে যবে	'ফাগুন ফুরাবে যবে, 'নজরুল রচনাবলী'র তৃতীয় খণ্ডে (১৯৯৩) নিম্নোক্ত দুটি পংক্তি নেই : ১. 'সুখ-শশী অস্ত যাবে' ২. 'গৃহহীন করিয়াছ যাহারে ভবে' উপরোক্ত পংক্তি দু'টি 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' (২০০৬) গ্রন্থে আছে।	'ফাগুন ফুরাবে যবে' 'নজরুল-গীতি' অখণ্ড (২০০৪) গ্রন্থে নিম্নোক্ত দু'টি পংক্তি আছে : ১. 'সুখ-শশী অস্ত যাবে' ২. 'গৃহহীন করিয়াছ যাহারে ভবে' রেকর্ড নং-জে.এন. জি ৫৪৯৭ মেগাফোন শিল্পী : ভবানী দাস

১	২	৩
১০. সই পলাশ বনে রঙ ছড়ালো কে?	'সই পলাশ বনে রঙ ছড়ালো কে?' 'নজরুল-রচনাবলী'তে (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩) নিম্নোক্ত পংক্তি দুটি নেই : ১. 'রঙে রঙীন মানুষটিরে কাছে ডেকে দে লো, ২. 'রঙ ছুঁড়ে চোখে' 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র (২০০৬) গ্রন্থে পংক্তি দুটি আছে।	'সই পলাশ বনে রঙ ছড়ালো কে?' 'নজরুল-গীতি-অখণ্ড' গ্রন্থে (২০০৪) নিম্নোক্ত পংক্তি দুটি আছে : ১. 'রঙে রঙীন মানুষটিরে কাছে ডেকে দে লো' ২. রঙ ছুঁড়ে চোখে' রেকর্ড নং এন ১৭৪৬৯ এইচ. এম. ভি. শিল্পী : পারুল সেন
১১. বঁধূ আমি ছিনু বুঝি বৃন্দাবনের	'বঁধূ আমি ছিনু বুঝি বৃন্দাবনের' 'নজরুল-রচনাবলী'তে (৩য় খণ্ড (১৯৯৩) নিম্নোক্ত পংক্তিটি নেই : 'বুঝি মিলন আমার নহে' 'নজরুল-সঙ্গীত সমগ্র' গ্রন্থে (২০০৬) পংক্তিটি আছে।	'বঁধু আমি ছিনু বুঝি বৃন্দাবনের' 'নজরুল-গীতি-অখণ্ড' গ্রন্থে (২০০৪) নিম্নোক্ত পংক্তিটি আছে : 'বুঝি মিলন আমার নহে' রেকর্ড নং এন ২৭৪৮১ এইচ.এম.ভি শিল্পী : যুথিকা রায়
১২. কালো জল ঢালিতে সই	'কালো জল ঢালিতে সই' 'নজরুল-রচনাবলী'-তে (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩) নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো নেই : ১. কালারি কারণে লো কালারি কারণে, ২. 'এলো কালো মেঘের বেশে' 'নজরুল-সঙ্গীত সমগ্র' গ্রন্থে পংক্তি দুটি আছে।	'কালো জল ঢালিতে সই' 'নজরুল-গীতি' অখণ্ড গ্রন্থে (২০০৪) নিম্নোক্ত পংক্তি দু'টি আছে : ১. 'কালারি কারণে লো কালারি কারণে' ২. 'এলো কালো মেঘের বেশে' রেকর্ড নং ১৭১৬৩ এইচ.এম.ভি শিল্পী : সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়

১	২	৩
১৩. তোমার কালো রূপ যাকনা ডুবে	'তোমার কালো রূপ যাকনা ডুবে' 'নজরুল-রচনাবলী'-তে (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩) নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো নেই ; ১. 'ঐ কালো রূপে যাকনা ডুবে সকল কালো মম' ২. 'হে কৃষ্ণ প্রিয়তম।' 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' গ্রন্থে (২০০৬) পংক্তিগুলো আছে।	'তোমার কালো রূপ যাকনা ডুবে' 'নজরুল-গীতি-অখণ্ড গ্রন্থে (২০০৪) নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো আছে : ১. 'ঐ কালো রূপে যাকনা ডুবে সকল কালো মম' ২. 'হে কৃষ্ণ প্রিয়তম।' রেকর্ড নং এন ৯৭৮৮ এইচ.এম. ভি শিল্পী : যুথিকা রায়
১৪. ব্রজগোপী খেলে হোরি	'ব্রজগোপী খেলে হোরি' 'নজরুল-রচনাবলী'-তে (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩) নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো নেই : ১. রাঙা অধরে ঝরে হাসির কুমকুম অনুরাগ আবীর নয়ন-পাতে' 'নজরুল সঙ্গীতে সমগ্র' গ্রন্থে (২০০৬) পংক্তিগুলো আছে।	'ব্রজগোপী খেলে হোরি' 'নজরুল-গীতি-অখণ্ড গ্রন্থে (২০০৪) নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো আছে : ১. রাঙা অধরে ঝরে হাসির কুমকুম অনুরাগ আবীর নয়ন-পাতে।' রেকর্ড নং এন, কিউ ১৪৭ পাইওনীয়ার শিল্পী : বেচু দত্ত
১৫. তাইত—সখি সেইত পুষ্প শোভিতা হলো	'তাইত সখি সেইত পুষ্প শোভিতা হলো' 'নজরুল-রচনাবলী'-তে (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩) নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো নেই : 'প্রাণবল্লভ আমার কইগো কইগো সখি আমায় বলে দে গো' 'নজরুল-সঙ্গীত সমগ্র' গ্রন্থে (২০০৬) পংক্তিগুলো আছে।	'তাইত সখি সেইত পুষ্প-শোভিতা হলো' 'নজরুল-গীতি' অখণ্ড গ্রন্থে (২০০৪) নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো আছে : 'প্রাণবল্লভ আমার কইগো কইগো সখি আমায় বলে দে গো।' রেকর্ড নং এন ১৭২৮৪ এইচ.এম. ভি শিল্পী : বীণা পানি দেবী

১	২	৩
১৬. বঁধু সেদিন নাহি ক আর	'বঁধু সেদিন নাহি ক আর' 'নজরুল-রচনাবলী'তে (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩) নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো নেই : 'আজ গেছ ভুলে সেসব কথা গেছ ভুলে অনেকের আছে অনেক যে নাথ জানে এই সংসার তোমা বিনে তো কেহ নাই সখা অভাগিনী রাধিকার॥	'বঁধু সেদিন নাহি ক আর' 'নজরুল-গীতি অখণ্ড (২০০৪) গ্রন্থে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো আছে : 'আজ গেছ ভুলে সে-সব কথা গেছ ভুলে অনেকের আছে অনেক যে নাথ জানে এই সংসার তোমা বিনে কেহ নাই সখা রাধিকার।' রেকর্ড নং একটি ৪১০৩, টুইন শিল্পী : নারায়ণ দাস বসু
১৭. নৃত্যময়ী নৃত্যকালী	'নৃত্যময়ী নৃত্যকালী' 'নজরুল-রচনাবলী'-তে (৩য় খণ্ড, ১৯৯৩) দুটি পংক্তি নিম্নরূপ : ১. 'কবে দেখব আমরা সে নাচ সবে' ২. 'অগ্নিশিখায় চিতার ফুলে' 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' গ্রন্থে (২০০৬) পংক্তিগুলো নিম্নরূপ : ১. 'কবে দেখব সে নাচ অগ্নি-শিখায়, ২. 'আমরা সবাই চিতার কূলে।'	'নৃত্যময়ী নৃত্যকালী' 'নজরুল-গীতি'-অখণ্ড গ্রন্থে (২০০৪) দুটি পংক্তি নিম্নরূপ : ২. 'কবে দেখব সে নাচ অগ্নি-শিখায়' ২. 'আমরা সবাই চিতার কূলে।' রেকর্ড নং এইচ.এম. ভি শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ [রেকর্ডটি বাতিল হয়। দ্রষ্টব্য 'নজরুল-সঙ্গীত নির্দেশিকা' ব্রহ্মমোহন ঠাকুর। প্রকাশনায় নজরুল ইন্সটিটিউট, ২০০৯]

১	২	৩
১৮. সখি আর অভিমান জানাবো না	‘সখি আর অভিমান জানাবো না’ ‘নজরুল-রচনাবলী’র ৩য় খণ্ডে (নতুন সংস্করণ ১৯৯৩) আছে : ‘তাই সে অশ্রুর সায়রে ভাসে সারা জীবন কাঁদিতে হবে’	‘সখি আর অভিমান জানাবোনা’ কলকাতার ‘হরফ’ প্রকাশনী প্রকাশিত ‘নজরুল-গীতি’ (অখণ্ড) গ্রন্থে (২০০৪) পংক্তিগুলো নিম্নরূপ : ‘তাই চিরদিন অশ্রুর সায়রে ভাসে চিরজীবন জানি কাঁদিতে হবে’ রেকর্ড নং এন ১৭৩১৬, এইচ. এম. ভি. শিল্পী : ইন্দুবালা
১৯. প্রিয়তম হে বিদায়	‘প্রিয়তম হে বিদায়’ ‘নজরুল-রচনাবলী’র ৩য় খণ্ডে (নতুন সংস্করণ ১৯৯৩) কয়েকটি পংক্তি নিম্নরূপ : ‘আর রহিতে নারি, আশা-দীপ নিভে যায়’ ‘রহিল ছড়ানো মোর প্রাণের উদাস পবণে’ ‘জড়ানো রহিল মোর প্রীতি ধূসর গগণে’ ‘নিশি ভোরে ঝরা ফুল দলে যাও পায় বিদায় বিদায়।’	কলকাতার ‘হরফ’ প্রকাশিত ‘নজরুল-গীতি’ (৩য় খণ্ড) গ্রন্থে (২০০৪) পংক্তিগুলো নিম্নরূপ : ‘আর রাখিতে নারি, আশ-দীপ নিভে যায়’ ‘রহিল ছড়ানো মোর প্রাণের তিয়াস হুতাশ পবণে’ ‘জড়ানো রহিল করুণ স্মৃতি ধূসর গগনে’ ‘নিশিভোরে ঝরাফুল দলে যায় পায়।’ রেকর্ড নং এন ২৭১২৩২ এইচ. এম. ভি. শিল্পী : বীণা চৌধুরী
২০. তব গানের ভাষায় সুরে	‘তব গানের ভাষায় সুরে’ ‘নজরুল-রচনাবলী’ ৩য় খণ্ডে (১৯৯৩) কয়েকটি পংক্তি নিম্নরূপ : ‘তব গানের ভাষায় সুরে বুঝেছি বুঝেছি বুঝেছি’ ‘বন্ধু বলে যারে বুঝেছি’ ‘নিশীথে গোপনে সেধেছি’	‘তব গানের ভাষায় সুরে’ কলকাতার ‘হরফ’ প্রকাশনী প্রকাশিত ‘নজরুল-গীতি’ (অখণ্ড) গ্রন্থে (২০০৪) পংক্তিগুলো নিম্নরূপ : ‘তব গানের ভাষায় সুরে বুঝেছি’ ‘দেবতা বলে যারে পূজেছি’ ‘নিশীথে গোপনে কেঁদেছি।’ রেকর্ড নং এন. ২৭৩২৫ এইচ. এম. ভি. শিল্পী : অনিমা দাশ গুপ্ত

১	২	৩
২১. কেন মনোবনে মালতী-বল্লরী দোলে	'কেন মনোবনে মালতী-বল্লরী দোলে' 'নজরুল-রচনাবলী' ৩য় খণ্ডে (১৯৯৩) কয়েকটি পংক্তি নিম্নরূপ : 'চৈতালী চাঁপা কয়-মালতী বোন' 'মধুমালতী বলে, 'জানিনা'।	'কেন মনোবনে মালতী-বল্লরী দোলে' কলকাতার 'হরফ' প্রকাশনী প্রকাশিত 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড গ্রন্থে (২০০৪) পংক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'চৈতালী চাঁপা কয়-মালতী শোন' 'মধুমালতী বলে 'জানিনা, জানিনা, জানিনা' রেকর্ড নং এন. ২৭৩১১ এইচ. এম. ভি. শিল্পী : ইলা ঘোষ
২২. আমার ঘরের মলিন দীপালোকে	'আমার ঘরের মলিন দীপালোকে' 'নজরুল-রচনাবলী'র ৩য় খণ্ডে (১৯৯৩) একটি স্তবক নিম্নরূপ : 'শীতের হাওয়ায় কাঁদন হেন ধূলি-ঝড়ে ঢাকলে যেন ফুলেল বসন্তকে'	'আমার ঘরের মলিন দীপালোকে' কলকাতার 'হরফ' প্রকাশনী প্রকাশিত 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থে স্তবকটি নিম্নরূপ : 'পূবের হাওয়ায় কাঁপন হেন ধূলি-ঝড়ে ঢাকলে যেন ফুলেল বসন্তকে।' রেকর্ড নং এফ. টি. ৪৩২৪ টুইন শিল্পী : শিউলি সরকার
২৩. প্রেমের হাওয়া বইল যখন মুকুল গেল ঝরে	'প্রেমের হাওয়া বইল যখন মুকুল গেল ঝরে' 'নজরুল-রচনাবলী'র ৩য় খণ্ডে (১৯৯৩) একটি পংক্তি নিম্নরূপ : 'আজ সমাধির পাশে কিগো এলে স্বয়ম্বরে॥'	'প্রেমের হাওয়া বইল যখন মুকুল গেল ঝরে' কলকাতার 'হরফ' প্রকাশনী প্রকাশিত 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থে (২০০৪) পংক্তিটি নিম্নরূপ : 'আজি কি বেলা-শেষে তুমি এলে স্বয়ম্বরে॥'
২৪. মোরে ভালোবাসায় ভুলিয়োনা	'মোরে ভালোবাসায় ভুলিয়োনা' 'নজরুল-রচনাবলী' ৩য় খণ্ডে (১৯৯৩) একটি পংক্তি নিম্নরূপ : 'তবু প্রাণ যে চাহে পুড়াতে সুখ'	'মোরে ভালোবাসায় ভুলিয়োনা' 'কলকাতার 'হরফ' প্রকাশনী প্রকাশিত 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থে (২০০৪) পংক্তিটি নিম্নরূপ : 'প্রভু, শান্তি চাহে জুড়াতে সব' রেকর্ড নং ১৭৪৪৭, এইচ. এম. ভি. শিল্পী : শৈলেস দত্ত গুপ্ত

১	২	৩
২৫. স্বপন-বিলাসে চাঁদ যবে হাসে	'স্বপন-বিলাসে চাঁদ যবে হাসে' 'নজরুল-রচনাবলী', ৩য় খণ্ডে (১৯৯৩) কয়েকটি পংক্তি নিম্নরূপ : 'সেই আধোরাতে নয়ন পানে' 'আমার অন্তর মাঝে' 'মম দেহ-বীণার ঝঙ্কার শুনিও গভীর নিবিড় রাতে' 'যখন এ হার-মুকুলে'	'স্বপন-বিলা'সে চাঁদ যবে হাসে' কলকাতার 'হরফ' প্রকাশনী প্রকাশিত 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থে (২০০৪) পংক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'সেই আধো রাতে নয়ন পাতে 'আমার তন্দ্রার মাঝে' 'মম দেহ-বীণায় ঝঙ্কার তুলিও' 'যখন হেনার মুকুলে' রেকর্ড নং এইচ. এম. ভি. শিল্পী : অণিমা মুখোপাধ্যায় রেকর্ডটি পরে বাতিল হয়
২৬. মোরা ফুটিয়াছি বধূ হের তোমারি আশায়	'মোরা ফুটিয়াছি বধূ হের তোমারি আশায়' 'নজরুল-রচনাবলী' ৩য় খণ্ডে (১৯৯৩) গানটি সংলাপধর্মী নয়। [আলেয়া, নাটকের গান]	'মোরা ফুটিয়াছি বধূ হের তোমারি আশায়' কলকাতার 'হরফ' প্রকাশনী প্রকাশিত 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থে (২০০৪) গানটি সংলাপধর্মী। ['আলেয়া' নাটকের গান]
২৭. মহুয়া বনে লো মধু খেতে সই	'মহুয়া বনে লো মধু খেতে সই' 'নজরুল-রচনাবলী' ৩য় খণ্ডে (১৯৯৩) কয়েকটি পংক্তি নিম্নরূপ : 'কারে না পাই ওলো নাচতে একা' 'বুঝি সই বঁধু মোর কেন লাজে মরে' 'সে যে জানতো না, সজনী, কভু আমা বৈ'	'মহুয়া বনে লো মধু খেতে সই' কলকাতার 'হরফ' প্রকাশনী প্রকাশিত 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থে (২০০৪) পংক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'সরেনা পা ওলো নাচতে একা' 'বুঝি ঐ বঁধু মোর যেন লাগে মনে' 'সে যে জানতো না, সজনী, কভু আমি বৈ॥' মহেন্দ্রগুপ্ত রচিত 'দেবী দুর্গা' নাটকে নজরুলের গান। মহেন্দ্র গুপ্ত রচিত 'দেবী দুর্গা' নাটকে নজরুলের গান। রেকর্ড নং এন. ৯৭৩২ এইচ. এম. ভি. শিল্পী : মিত্র প্রমোদা

	১	২	৩
২৮.	বিধুর তব অধর–কোণে মধুর হাসির রেখা	'বিধুর তব অধর–কোণ মধুর হাসির রেখা' 'নজরুল–রচনাবলী' ৩য় খণ্ডে (১৯৯৩) কয়েকটি পংক্তি নিম্নরূপ : 'সিন্ধু জানে, জোয়ার জানে' 'দেখতে আসি, আসি নাকো'	'বিধুর তব অধর–কোণে মধুর হাসির রেখা' কলকাতার 'হরফ' প্রকাশনী প্রকাশিত 'নজরুল–গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থে (২০০৪) পংক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'সিন্ধু জলের জোয়ার জানে' 'দেখতে আমি আসি নাকো' মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য রচিত 'চক্রগুহ' নাটকের নজরুলের গান রেকর্ড নং এফ. টি. ৪৭১২, টুইন শিল্পী : কার্তিক চন্দ্র দাস
২৯.	বেদনা–বিহ্বল পাগল পূবালী পবনে	'বেদনা–বিহ্বল পাগল–পূবালী পবনে' 'নজরুল–রচনাবলী' ৩য় খণ্ডে (১৯৯৩) একটি পংক্তি নিম্নরূপ : 'হিয়া দুরু দুরু মন উতল' গানটি দ্বৈত সঙ্গীত এবং পুরুষ ও স্ত্রীর সংলাপধর্মী। কিন্তু 'নজরুল–রচনাবলী'র ৩য় খণ্ডে (১৯৯৩) প্রকাশিত গানটি সংলাপধর্ম নয়, 'দ্বৈত–সঙ্গীত' কথাটিও উল্লেখিত নেই।	'বেদনা–বিহ্বল পাগল–পূবালী পবনে' কলকাতার 'হরফ' প্রকাশনী প্রকাশিত 'নজরুল–গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থে (২০০৪) একটি পংক্তি নিম্নরূপ : 'হিয়া দুরু দুরু মনতল' গানটি 'দ্বৈত সঙ্গীত'রূপে এবং পুরুষ ও স্ত্রী'র সংলাপ আকারে মুদ্রিত। রেকর্ড নং এন. ৯৭৪৪ এইচ. এম. ভি. শিল্পী : ধীরেন দাস এবং ইন্দুবালা
৩০.	বিদেশিনী—চিনি চিনি	'বিদেশিনী—চিনি চিনি' 'নজরুল–রচনাবলী' ৩য় খণ্ডে (১৯৩৩) কয়েকটি পংক্তি নিম্নরূপ : 'দীপ জ্বলে ওঠে পাথর–তলে' 'মলয়ে শুনেছি তোমার গলার সুরের রিণিঝিণি' তোমার আঁখির বর্ণে' 'তোমার তনুর বর্ণে, 'সাগর নাচে রিনিঝিনি'	'বিদেশিনী—চিনি চিনি' কলকাতার 'হরফ' প্রকাশনী প্রকাশিত 'নজরুল–গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থে (২০০৪) পংক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'দীপ জ্বলে ওঠে পাথার জলে' 'মলয়ে শুনেছি তোমার বলয় চুড়ির রিনিঝিনি' 'তোমার তনুর বর্ণে' 'তোমার হাসির স্বর্ণে' 'খেলো সাগর–নটিনী' রেকর্ড নং এন. ৭৪৭৯ এইচ. এম. ভি. শিল্পী : হরিমতী

১	২	৩
৩১. মোর নিশীথের চাঁদ ঘন মেঘে ডাকিয়াছে	'মোর নিশীথের চাঁদ ঘন মেঘে ডাকিয়াছে' 'নজরুল-রচনাবলী' ৩য় খণ্ডে (১৯৯৩) কয়েকটি পংক্তি নেই—যেমন : 'হের ঘোর ঘনঘটা সব লাজ দিল ঢেকে বিজলি তোমারে হেরি চমকায় থেকে থেকে' 'আজ দূরে থাকিওনা এস এস আরো কাছে'	'মোর নিশীথের চাঁদ ঘন মেঘে ডাকিয়াছে' কলকাতার 'হরফ' প্রকাশনী প্রকাশিত 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থে (২০০৪) নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো আছে : 'হের ঘোর ঘনঘটা সব লাজ দিল ঢেকে বিজলি তোমারে হেরি চমকায় থেকে থেকে' 'আজ দূরে থাকিওনা এস এস আরো কাছে' [গানটির রেকর্ড পাওয়া যায়নি। রেকর্ড হয়েছিল কিনা সে তথ্যও মেলেনি।]
৩২. এস প্রিয়তম এস প্রাণে	'এস প্রিয়তম এস প্রাণে' 'নজরুল-রচনাবলী' ৩য় খণ্ডে (১৯৯৩) নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো নেই : 'সুখ-স্বপন হয়ে এস ঘুমে এস হৃদয়েশ। মালার কুসুমে এস তপনের রূপে আঁখি চুমে ঘুম ভাঙায়ো নিশি-অবসানে এস মাধবী-কাঁকন হয়ে হাতে এস কাজল হয়ে আঁখি-পাতে এস পূর্ণিমা চাঁদ হয়ে রাতে এস ফুল-চোর মাধবী-বিতানে'	'এস প্রিয়তম এস প্রাণে' উক্ত গানের (বাম পাশের বক্সে উদ্ধৃত) ৮টি পংক্তিই কলকাতার 'হরফ' প্রকাশনি প্রকাশিত 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থে (২০০৪) আছে। [দেবেন্দ্রনাথ রাহা রচিত 'অর্জুন বিজয়' নাটকে নজরুলের গান] রেকর্ড নং এইচ. এম. ভি. শিল্পী : হরিমতী [রেকর্ডটি প্রকাশিত হয়নি। দ্রষ্টব্য : 'নজরুল সংগীত নির্দেশিকা' ব্রহ্মমোহন ঠাকুর। প্রকাশনা : নজরুল ইন্সটিটিউট ২০০৯]

বিঃ দ্রঃ : যে সব গানের বাণীতে বড় রকম পার্থক্য তথা পাঠান্তর রয়েছে সেগুলো কয়েকটির যথাসম্ভব এখানে তুলে ধরা হলো। স্থান সংকোচনের কারণে স্তবক-বিন্যাসে কিছুটা হেরফের ঘটেছে। মুদ্রণ-বিভ্রাটও ঘটে থাকতে পারে। এ জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। উল্লেখযোগ্য যে 'নজরুল-গীতি'-অখণ্ড এবং 'নজরুল-সঙ্গীত সমগ্র' গ্রন্থে গানের বাণীর নীচে গ্রামোফোন রেকর্ড নম্বর নেই। রেকর্ড নম্বর গ্রামোফোন কোম্পানী ও শিল্পীর নাম নেওয়া হয়েছে 'নজরুল-সঙ্গীত নির্দেশিকা' গ্রন্থ থেকে। এ ব্যাপারে ১৯৯৩ সালে নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত এবং নজরুল সঙ্গীত গবেষক, সংগ্রাহক ও সঙ্গীতজ্ঞ জনাব আবদুস্ সাত্তার প্রণীত 'নজরুল-সঙ্গীত অভিধান' বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

সৌজন্যে আসাদুল হক-

সৌজন্যে আসাদুল হক-

বর্ণানুক্রমিক সূচি

ব

য

র

ল

শ

স